সতীশচন্দ্র দে

নিঃসঙ্গ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২

মূল্য— তিন টাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী—শ্রীনবেন্দ্র নাথ দত্ত

নিঃসঙ্গ

উৎসর্গ

দেশে ও বিদেশে স্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁরা জীবন দান করেছেন, এই বইখানি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী।

৩০শে জানুয়ারী সন ১৯৫৬ সাল।

—গ্রন্থকার

ভূমিকা

"পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই
অস্তাচলের ধারে আসি
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই
তার লাগি আজ বাজাই বাঁশী"

রবীন্দ্রনাথ

১৯৩০ সালের পর আমার "নিঃসঙ্গ" কারাবাসের কথা লিখেছিলাম। তখন ছিল বৃটীশ আমল, তাই সকল ঘটনা নিরাবরণ ভাবে লিখতে পারিনি, পাছে আইনের কবলে পড়ি বা বই বাজেয়াপ্ত হয়। এখন মনে হল, আর বিলম্ব করা উচিত হবেনা। আজ স্বাধীন ভারতে সে গোপনীয়তার প্রয়োজন নাই, তাই পুনর্বার বইটী লিখছি। অনেক কথা, অনেক ঘটনা ভুলে গেছি, তবু যতটুকু মনে আছে, লিপিবদ্ধ করে যেতে চাই।

এই বইটীতে ঘটনার বিবরণ আছে কম, অধিকাংশ হচ্ছে অনুভূতির কথা, কারাগারে ও অন্তরীণে থাকার প্রতিক্রিয়ায় মনের যা অবস্থা হয়েছিল। ব্যক্তিগত ভাবে এমন একজন ছিলাম না যার ঐতিহাসিক মূল্য নগন্য নয়। তবে, কর্ম্ম-সহচর বা অনুগামী রূপে এমন অনেকের সংস্পর্শে এসে-ছিলাম যাঁরা ভারতের মুক্তি-ইতিহাসের সেই বিপ্লব-অধ্যায়ের ছিলেন স্রষ্টা। তাঁদের কথা কবির ভাষায় বলতে হয়,

"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস
সাধক ওগো প্রেমিক ওগো
পাগল তুমি ধরায় আস।"

জীবনে পেয়ে ছিলাম বিপিনদা'কে। বিপ্লবের বন্ধুর পথে, মাঝে মাঝে চারিদিক যখন স্তিমিত হয়ে আসত, মন যখন হতাশায় অবসন্ন হ'ত, ছুটে যেতাম তাঁর কাছে, তাঁর প্রদীপ্ত মুখ দেখে, কথা শুনে, হতাশার কুয়াসা মিলিয়ে যেত, অন্তরে আশার আলো উঠত জ্বলে। এমনি কত নিঃস্বার্থ দেশ প্রেমিকের আবির্ভাব হয়ে ছিল তখন বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। তাদের অনেককে চোখে দেখেছি, কথা কয়েছি, ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছি, এক সাথে কাজ করেছি, কারাগারে নির্য্যাতনের ভাগী হয়েছি, এটা জীবনের কম সৌভাগ্য নয়। আত্মার মুক্তি, পরলোকে স্বর্গবাস বা নিজেদের জন্য ইহকালের কোনও পার্থিব সম্পদ কিছুই তাঁরা চান নি। শুধু ইংরেজ কি করে বিতাড়িত হবে, দেশ কি করে স্বাধীন হবে, সেই ছিল তাদের একমাত্র কাম্য। অনেকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলে গেছেন এই দেশে জন্ম নিয়ে, স্বাধীনতার জন্য আবার প্রাণ দোবো যতদিন না ভারত স্বাধীন হয়।

স্মৃতির কুয়াসার মধ্য দিয়ে অতীত ঘটনার কঠোরতায় কোমল স্পর্শ লাগে। সেকালের কথা, তখন যেমন মনে হ'ত, এখন ঠিক তেমন মনে হয় না। বোমা পিস্তল দ্বারা ইংরেজ

রাজ্য অচল করবার সেই দুঃসাধ্য অথচ অদম্য প্রয়াস, সে ছাত্রাবস্থায় দিনের পব দিন, পরে, বন্দী অবস্থায় বিন্দুর পর বিন্দু পাতনের মত নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তগুলির অতীতে বিলীন হওয়া, সে স্বাধীনতার স্বপ্ন, মনে হয় সে যেন আর কারুর জীবনের, সে যেন অন্য এক আমি। সে দিনগুলি নিছক দুঃখের ছিল না আজকার দিন যেমন শুধু সুখের নয়। তখনকার কারা প্রাচীরের মধ্যেও অন্তর আলোকিত থাকত স্বাধীনতার স্বপনে।

লোকে বলে ভারত ধর্ম্মের দেশ। সত্য ধর্ম্ম লোপ পেয়েছিল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মে দেশ আচ্ছন্ন মনে হ'ত। "বহু রূপে সম্মুখে তোমার কোথা তুমি খুঁজিছ ঈশ্বর" স্বামী বিবেকানন্দের এই সত্য বাণী লোকে বিস্মৃত হয়েছে। কৃত্রিম আধ্যাত্মিকতার বিলাসে দেশের জন সাধারণের অবস্থা তখন কি ছিল? মনে হত একটি বিরাট ঐতিহ্যের নামে জড়ত্ব পঙ্গুত্ব অবস্থা। ইহ জীবনে পরাধীনতার আনুসঙ্গিক দুঃখ, দৈন্য, মলিনতা, কদর্য্যতা সবই দৈব বলে মেনে নিয়েছিল. বেদান্ত-গীতার দেশে পুরুষকার ছিল বিলুপ্ত। সবই যেন বিধাতার বিধান্। কোন্ পূর্ব্বজন্মে কি না কি পাপ কর্ম্ম করেছিল, যার ফলে ইহ জীবনের দুর্ভোগ। নিজ দৈহিক ও আন্তরিক শক্তির উপর নাই আত্ম-বিশ্বাস, নাই আস্থা। ভগবানে অন্তরের ভক্তি প্রেম নিবেদনের পরিবর্ত্তে জাতি-ভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতার পঙ্কে নিমজ্জিত মানবতার অপমান। জীবের বা মানবের

কল্যাণে নিস্বার্থ সেবা বা কর্ম্ম অপেক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিক পূজা আচার ছিল ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির সহজ উপায়। দুঃখী দেশবাসীর দারিদ্র্য মোচনে নিশ্চেষ্ট। পরকালের কল্পিত স্বর্গ লাভ ছিল অধিকতর বা একমাত্র কাম্য। ছিল না জাতিত্ব বোধ, ছিল না স্বাধীনতার মর্য্যাদা বা মূল্য-বোধ, ছিল না পরাধীনতার গ্লানি বা জ্বালা। মহাদেশের মত দেশ, বহু কোটি অধিবাসী, পর পর পাঠান মোগল ও ইংরেজের পরাধীনতা মেনে বিদেশীর পদানত হ'ল। যে যখন মাথায় পা তুললে তাকেই প্রভু বলে পদসেবা করল। সিপাহী যুদ্ধে স্বাধীনতার যে চেষ্টা হয়েছিল, উৎকোচ ও এই দেশবাসী দিয়েই তা' দমন হল, এই দেশ পদানত হল। দেশের জন সাধারণ ছিল অবজ্ঞাত দুঃখ ও দীনতা ও গভীরতম দারিদ্র্যে অবচেতন। তারই মধ্যে মধ্যে কোথাও কোথাও কয়েকটি মহাপ্রাণ মানবের আবির্ভাব হয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে, বিংশ শতকের প্রথমাংশে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ আদি কবি, রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র আদি সাহিত্যিকগণ কবিতা এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আলো জ্বালতে, জড়ের মধ্যে দেশাত্ম চেতনা জাগাতে চেষ্টা করে গেলেন।

দেশ পেল বন্দেমাতরম্ মন্ত্র, দেশ মাতার বন্দনা। ওদিকে ইংরাজদের শত অনিচ্ছা ও সতর্কতা সত্ত্বেও বিদেশ হতে বিদেশী কবিতা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে জাতীয়তা বোধের

ও স্বাধীনতার ভাব-তরঙ্গ আঘাত করতে লাগল শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কয়েক জনের এই নব জাগ্রত চেতনা কর্ম্মের ভিতর রূপায়িত করতে পথ খুঁজতে লাগল, কেমন করে বৃটিশের কবল হ'তে দেশের মুক্তি আনয়ন করা যায়। বাসনা ছিল, বৃটিশ শাসন-মুক্তকরে দেশকে জগত সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অন্য উপায় জানা ছিল না বলে দেশ-প্রেমিকগণ বোমা পিস্তলের হিংস্র বিপ্লবের পথ বেছে নিল। কত বোমা, কত পিস্তল বন্দুকের প্রয়োজন হবে, তার হিসাব বা ধারণা স্পষ্ট ছিল না, তবে আশা ছিল দেশী সিপাহীরা বিদ্রোহ করে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে ও ইংরেজের যারা শত্রু, সেই সব বিদেশীদের নিকট যথেষ্ট অস্ত্র শস্ত্রের জোগান পাওয়া অসম্ভব নয়। যা জোটে তাই দিয়েই কাজে এগুতে হবে, অভাব পুরে যাবে অক্লান্ত কর্ম-নিষ্ঠা ও চরম আত্মত্যাগ দিয়ে। দেশের শত্রু যত পারি নিধন করব এবং প্রয়োজন হলে করব আত্মদানে মৃত্যু-বরণ। এই ছিল সংকল্পের রূপ। দেশ স্বাধীন না করতে পারি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ ত' দিতে পারব।

১৯২০ সালের পর, অহিংস অসহযোগের আন্দোলনে, কংগ্রেস স্বাধীনতার আকাঙ্খা দেশের জনগণের মনে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তবু এরই পাশে পাশে অনেকে হিংস্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারেননি।

আমাদেরই মধ্য কলিকাতার সন্তোষ মিত্র আদি কংগ্রেস কর্ম্মীগণের সহিংস বিপ্লব পুনবায়োজনের চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন, বিপ্লবী সূর্যসেনের চট্টগ্রাম আস্ত্রাগার লুণ্ঠন আদি ঘটনা ঘটেছিল। বিনয় বাদল দীনেশ গোপীনাথ প্রভৃতি বীরগণের শত্রু হত্যা ও মৃত্যু বরণ, আমাদের প্রিয় নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ ও ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ তার প্রমান, দেশে হিংসায় বিশ্বাসী মহাপ্রাণ নেতার অভাব হয়নি। আজ যিনি যত বড় নেতা, ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধিব সুযোগও তাঁর তত বেশী, তখনকার দিনে ছিল এরই বিপরীত। নেতৃত্বে বড় হওয়ার অর্থ ছিল ফাঁসির রজ্জুতে বা পুলিশেব গুলিতে জীবন অবসানের অধিক সম্ভাবনা। নির্য্যাতন, কারাগার অথবা ততোধিক কষ্টকর গুপ্ত জীবন ছিল অবশ্যম্ভাবী।

এ সকল ১৯২০ সালের পবে পরে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ঘটে ছিল। ১৯৪২ সালের বিপ্লবেও সকল দল অহিংসা মেনে নেয়নি যদিও মহাত্মাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পতাকার তলে অধিকাংশ কর্ম্মীদল অহিংসার সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ ও কারা বরন করে ছিল। কিন্তু ১৯২০ সনের পূর্ব্বে হিংস্র সংগ্রামের বিপ্লবীর অধিকাংশ ছিল শিক্ষিত বাঙ্গালী যারা সংখ্যায় বহু না হলেও কর্ম্মে, নিষ্ঠায় ও ত্যাগে ছিলেন অতুলনীয়। লোকে আজ মনে করতে পারে, এটা ছিল যেন ডনকুইকসোটী পাগলের প্রয়াস। কিন্তু তবু, এই পাগলামীর রূপ ছিল বিরাট মহান। আর কিছু না হোক তাঁরা জাতিত্ব মর্যাদা বোধ ও স্বাধীনতার প্রথম আগুন দেশবাসীর

চিত্তে জ্বালিয়ে গেছেন। নিষ্প্রাণ মধ্যে জাগিয়েছেন প্রথম দেশাত্ম-বোধের প্রাণের সাড়া। এই জাগরণের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়, আজ স্বাধীন ভারতে যে সাম্য ও অর্থনৈতিক অহিংস বিপ্লব রূপায়িত হতে দেখছি—, এও হয়ত সেই পুরাতন হিংস্র বিপ্লবের নূতন যুগের পরিণত নব রূপ।

সেকালে, পরাধীন ভারতে বিদেশী শোষণে জনসাধারণ চলেছিল মরণের পথে। ইংরেজ এ দেশের শিল্প ধ্বংস করে দিয়ে নিজের বাজারে পরিণত করেছিল। রাষ্ট্রে যা কিছু ব্যবস্থা সৃষ্টি করত, তা হ'ত বিদেশী স্বার্থে এদেশের জনস্বার্থের প্রতিকূলে। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন না হলে দেশ বাঁচবেনা, স্বাধীনতা নইলে দেশের আত্মসম্মান থাকে না, তাই না বিপ্লবী প্রাণে তীব্র বেদনা জেগেছিল। কি হবে বেঁচে থেকে যদি স্বাধীন না হ'লাম? চাইনা সুখ, চাইনা ঐশ্বর্য্য, যদি স্বাধীন না হই। তাই কত বিপ্লবী দেশের শত্রু ধ্বংস করতে পেরেছিল, মরণ আলিঙ্গন করেছিল। এই জাতিত্ব-বোধ, এর উৎস ছিল প্রেম, দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য দরদ। যে দেশের লোককে আপন মনে না করে, ভাল না বাসে, দেশের দরিদ্রের দুঃখে যার চোখে অশ্রু না ঝরে যার অন্তরে বেদনা বোধ না জাগে, সে কি বিপ্লবী হতে পারে? তাই বিশ্বাস করি, অহিংসা বিপ্লবের মত সহিংস বিপ্লবের উৎসও সেই মানব প্রেম।

রবীন্দ্র যুগে মানুষ হয়েছি, জীবনে তাঁর প্রভাব পড়েছে। কলেজে ছাত্রাবস্থায় আমার সহপাঠী বন্ধু তিন চার বার

তাঁর জোড়া সাঁকোর বাটীতে নিয়ে গিয়েছিল ও কবির মুখে নূতন লেখার আবৃত্তি ও গান শুনবার সুবিধা হয়েছিল। সে কি কম সৌভাগ্য! তাঁর সেই বাউল গান,

"আমার মনের মানুষ কে রে
আমি কোথায় পাব তারে"—

এখনও মানস কর্ণে যেন শুনতে পাই।

বাংলার দরদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে একদিন বিপিনদা নিয়ে গেছলেন। রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবের কত কথা হল, বেশীর ভাগ বিপিনদার সঙ্গে। জীবনে সেই একদিনের সান্নিধ্যও আমার জীবনে কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

আর হয়েছিল, ১৯২০ সালে জেলের বাইরে আসার পর, বীরবল অর্থাৎ শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর স্নেহ লাভের সৌভাগ্য। আপন-ভোলাদের তিনি ও তাঁর সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী কত স্নেহ করতেন। চিঁড়া ভাজা ও ছানার জিলাপী সহ চা পান এখনও ভুলিনি। একদিন আমার লেখার পাণ্ডুলিপি শুনাচ্ছি একজন বৈষয়িক কর্ম্মে দেখা করতে এলেন। প্রমথ বাবু তাকে বললেন, কাজে ব্যস্ত, অন্য সময় আসতে। সাহস সঞ্চয় করে বললাম, আপনি ত আমার সহিত গল্প করছেন, কাজ সেরে নিলেন না কেন? মৃদু হেসে তিনি বললেন, সতীশ, ভুলে যাচ্ছ কেন, গল্পই যে আমার কাজ!

কবির ছন্দে ছন্দে স্মৃতির পট ভরে আছে। তাই বহু স্থানে তাঁর কবিতার অংশগুলি কলমের ডগায় এসে গেছে। এইটাই

স্বাভাবিক। কত বড় বড় ঘটনা ভুলে গেছি, কত তুচ্ছ কথা স্মৃতির পটে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, এমন হয় কেন, জানি না। হয়ত ক্ষুদ্র একটু ঘটনা বা একটু চিন্তা, জীবনে তার মূল্য থাকে, যাকে বড় ঘটনা বলি, তাব চেয়েও বেশী। তাই কবির কথাতেই ভূমিকা শেষ করছি।

"হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে মনি দুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ পরশ তাদের পরে।"

——: 0 :——

নিঃসঙ্গ

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী
রাজ দণ্ড রূপে"
রবীন্দ্রনাথ

বহুযুগ ধরে আমাদের দেশে রাজা দেবতার অংশ বলে রাজ-ভক্তিতে ধর্ম্মভাব জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার উপরে বৃটিশরাজের গুণ-গান শিশুদের চক্ষু কর্ণের মধ্য দিয়ে অন্তরে ছেপে দেবার চেষ্টার বিরাম ছিল না। শিশু যখন বড় হ'ত, তাকে ইংরাজী ভাষা শেখান হ'ত, জাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব বোধের পরিবর্ত্তে বিজাতীয় বৃটিশের গোলাম প্রস্তুত করার জন্য।

কলিকাতার মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের সন্তান, সকলের অজ্ঞাতে বড় হচ্ছিলাম। তখন বিংশ শতাব্দির সুরু, দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলিত। শুনতাম অনেক কিছু, বৃটিশের নিকট আমরা অশান্তি থেকে শান্তি পেয়েছি, ঠগ দস্যু আদির অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, রেলপথে কত সহজে ও নিরাপদে দেশের দূর দূরান্তে যাতায়াত করতে পারি। মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়া, বহুদূর ইংলণ্ড হতে, আমাদের রাজ্য সুশাসন করে অশেষ কল্যাণ সাধন করছেন। রাজারাণী দেবদেবীর তুল্য! কত গৃহস্থের, বিশেষ অবস্থাপন্ন গৃহে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া বা সপ্তম

এডওয়ার্ডের ছবি, কালী দুর্গার ছবির পাশাপাশি বিরাজ করত। রাজ-ভক্তি প্রচারের কোনও সুযোগ ছাড়া হ'ত না। একটী ছোট উদাহরণ দিই, ইঞ্চি বোঝাতে পাঠ সুরু হ'ল, "বৎসগণ, এই পয়সায় দেখিতেছ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি, যাঁর অশেষ দয়ায় আমরা নির্বিঘ্নে, পরম সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছি, এই পয়সায় ব্যাস এক ইঞ্চি" ইত্যাদি। গ্রন্থ এরূপ প্রণয়ন হলেই স্কুল-পাঠ্য বিবেচিত হবার সমধিক সম্ভাবনা, তা যত অপাঠ্যই হোক। এমনি নানা ভাবে আমাদের শিশু-অন্তর রাজ-ভক্তির জাবকরসে নিমজ্জিত রাখা হ'ত। রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকান্দ, ভগ্নী নিবেদিতা আদির দেশাত্ম বোধের কথা কচিৎ কানে আসত। বাংলার মনোজগতে স্বাধীনতার বাণী ছিল ক্ষীণ ও অস্পষ্ট।

১৯০৩ সালে ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন এ দেশবাসী প্রজাদের দর্শন দিতে এলেন, শিক্ষক মহাশয় আমাদের মত শিশু ছাত্রদের ময়দানে মার্চ করিয়ে নিয়ে গেলেন। রৌদ্র দগ্ধ হয়ে একটী করে কমলা নেবু খেতে পেলাম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাতে। তারস্বরে শুষ্ক গলায় চেঁচাতে হ'ল "লঙ্ লিভ আওয়ার গ্রেসিয়াস্ প্রিন্স"। রাতে পুনরায় মার্চ করিয়ে নিয়ে গেল ময়দানে বাজী পোড়ান দেখতে। কাউকে বলতে শুনিনি, এ দেশ পরাধীন কেন? ইংরেজ কেন বা কেমন করে এ দেশ শাসণ করে?

তবু মনে হয়, দেশবাসীর মনের অগোচরে স্বাধীনতার বীজ

সুপ্ত ছিল যা মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছিল সিপাহী যুদ্ধে, নীল বিদ্রোহে, সাহিত্যে, কবিতায় ও সঙ্গীতে। পরাধীনতা ও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মনে কখনও কখনও বিদ্রোহভাব জেগে উঠত, এমন মানুষও দেখা গেছে, কিন্তু তার সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম

ইংরেজের ও ফিরিঙ্গির (এংলো ইণ্ডিয়ান) মধ্যে ভাল লোক একেবারে ছিল না, একথা বলি না, কিন্তু অধিকাংশের ব্যবহারের মধ্যে থাকত অসহ্য ঔদ্ধত্য। পথিক পথে নিশ্চিন্তে চলেছে, হঠাৎ ধাক্কা খেল বা গায়ে ছড়ির আঘাত পড়ল, দেখা গেল গোরা সৈন্য বা ফিরিঙ্গী দেশী পথচারীর অপমানে আত্মপ্রসাদ লাভ করে চলে যাচ্ছে।

সমাজ ও ধর্ম্মের নামে অপমানকর প্রথার বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ কম জাগত না। মানুষে মানুষে অধিকার ভেদে মন ক্ষুব্ধ হত। তখন বিদ্রোহের বাণী কেউ শোনায়নি, তবু শিশু মনে সুপ্ত আত্মসম্মানবোধ প্রতিবাদে জেগে উঠত। একটী ছোট্ট ঘটনায় তার কিছু হয়ত প্রকাশ হবে। প্রাইমারী স্কুলে অন্নপূর্ণা পূজায় একটী পর্দার আড়ালে দেবীর ভোগ হচ্ছে। শিশু সুলভ ঔৎসুক্যে সে দিকে যাচ্ছিলাম, পণ্ডিত মশায় নিষেধ করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলাম. শূদ্রের ভোগ দেখা নিষেধ। সোজা প্রশ্ন করলাম, ছেলের দৃষ্টিতে মায়েব ভোগ অশুদ্ধ হয়, এ কেমন কথা! সে দাগ কত গভীর ভাবে লেগেছিল, তার প্রমান শিশুকালের এই তুচ্ছ কথাটী আজও ভুলতে পারিনি। এই শাস্ত্রীয় আচারের প্রভাব,

তীব্রতায় কিছু হ্রাস পেলেও আজও দেশে লুপ্ত হয়নি। এই সকল অকল্যাণের কৃত্রিম ভেদ দেশ থেকে কবে লোপ পাবে জানি না। তবে এ কাজে নিম্ন বর্ণের বিদ্রোহ ভাবের অপেক্ষা হয়ত উচ্চ বর্ণের উদারতার বেশী প্রয়োজন। চৈতন্যের জন্ম ত উচ্চ বর্ণে, কিন্তু তাঁর মত সমাজ বিপ্লবী কজন এসেছেন। সে দিনও যে শরৎ বাবু সাহিত্যের মধ্যদিয়ে সমাজের মুখোস খুলে দিয়ে গেলেন, তাঁরও জন্ম উচ্চ বর্ণে। আজ যে জাতিভেদ এক জাতি গঠণে অন্তরায়, তার সার্থকতা কোথায়, বুঝিনা। ভারতে অনেক কিছু আছে যা মহান, কিন্তু যা মন্দ ও দুর্বলতার কারণ, তা এড়িয়ে গেলে চলবে কেন? নহিলে আমরা এতকাল পরাধীন ছিলাম কেন? দ্বিজ-শিশু পৈতা পরে জন্মায় না, যেমন ধনীর শিশু সোনার ফুলে ভূমিষ্ট হয় না, সবাই আসে মানব-শিশু রূপে।

আরও একটী ক্ষুদ্র ঘটনার কথা না বলে পারি না। স্কুলে নিয়ম ছিল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে সাজা হবে। ক্লাসের সকল ছেলেই একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না, শুধু আমার উত্তর সঠিক হ'ল। হুকুম হ'ল, সকল ছাত্র দাঁড়িয়ে থাকবে ও আমি একধার থেকে তাদের কান মুলে দোব। তারা ত আমার সহ পাঠী, ভাই! শুধু বুদ্ধি কম বেশী বলে সাজা হবে কেন! এ অন্যায় আমার দ্বারা হবে না। এই কথা বলায় অবাধ্যতার অপরাধে দুহাতে থান ইট নিয়ে 'চেয়ার বসার' সাজা পেতে হল। শরীর ছিল দুর্বল, একটু পরেই কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলাম। জ্ঞান হয়ে দেখি শিক্ষক হাওয়া

করছেন, ছেলেরা উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ে আছে। ভাবি, শিক্ষক মহাশয় কত ভালবাসতেন, তবু ওই অন্যায় সাজা দিয়ে ছিলেন কেন ? উত্তর খুঁজে পাই না। মেধাবী ছাত্র দিয়ে অমেধাবীদের অবমাননা করা হবে, যেমন উচ্চ জাতি বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকারী থাকবে, ধনীর সন্তান গরীব ছেলেদের ভাই বলে ভাববে না। এ সব অন্যায় কি করে সহ্য হয় ?

জীবনের এমনি ছোট ছোট ঘটনা না লিখে পারি না। নিজের পরিচয় দিতে নয়, লিখি শুধু একটী সাধারণ বাঙালী ছেলের কথা। বাঙ্গলার মনের আকাশে অতি ক্ষীণ যে আলোক দেখা দিতেছিল, ক্রমে, বিরুদ্ধ শক্তির চাপে স্তিমিত না হয়ে কেমন করে বাঙ্গলার ও ক্রমে ভারতের কত মনে সে আলো জ্বালিয়ে দিলে।

রুশ জাপানে যুদ্ধ হ,ল, অতিকায় রুশিয়া পরাজিত হল ও জাপানীরা পোর্ট আর্থার দখল করল। বেঁটে এসিয়াবাসী বৌদ্ধ জাপানী, আমাদের মত মাছ ভাত মূলা খায়, তার কাছে দৈত্যাকার শ্বেতকায় রুশিয়ানদের হার হতে ভাবলাম, আমরাও একদিন ইংরেজদের হারাতে ও তাড়াতে পারব। ছিলাম এমন আশাবাদী। ১৯০৪ সালে বৃটিশরাজ বাংলা দ্বিখণ্ডিত করল। তারই প্রতিবাদে জেগে উঠল বিদেশী বয়কট্, স্বদেশী আন্দোলন ও বন্দেমাতরম্ মন্ত্র। নেতৃত্ব নিলেন সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি, বিপিন পাল। কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা করতেন লিয়াকৎ হোসেন আদি সেকালের স্মরণীয় দেশ ভক্তগণ।

যে ইংলণ্ড বাংলার চরখা ও তাঁত ধ্বংস করে এই দেশটাকে ল্যাঙ্কাসায়ারে প্রস্তুত কাপড়ের বাজারে পরিণত করেছিল, সেই ইংলণ্ড তার বাজার হারাতে স্নুরু করল। দেশে স্বদেশী মিল চলল। জাতীয় ব্যাংক, জাতীয় শিক্ষাপরিষদ আদি প্রতিষ্ঠিত হল।

——: 0 ;——

আত্মোন্নতি সমিতি

"পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গ ভূমি"

রবীন্দ্রনাথ

তখন আমার যাব বৎসর বয়স। নন্দদা আমায় নিয়ে গেলেন বহুবাজার ভরদ্বাজের মাঠে খেলাৎ চন্দ্র শাখা স্কুলের প্রাঙ্গনে "আত্মোন্নতি" সমিতিতে। এর ইতিহাসের কিছু বিপিনদার কাছে শুনেছিলাম। বাকী কথা বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু সে বলা আর হয়নি। তাই যেটুকু শুনেছি, এখানে বললে, আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আত্মোন্নতি সমিতি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল, মধ্য কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোনে, যেখানে খেলাৎ চন্দ্র ইনস্‌টিট্যুসন ছিল, সেই বাড়ীতে। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, ম্যাজিনি গ্যারিবল্ডি চরিত ইত্যাদি ধর্মাত্মক ও দেশাত্মক পুস্তক পাঠ ও তার আলোচনার মাধ্যমে মানসিক অনুশীলন। তখন পথে ফিরিঙ্গিরা অত্যাচার, অপমান করত, আত্মমর্য্যাদা রক্ষণ বা প্রতিবিধান শুধু মানসিক উন্নতিতে

অসম্ভব বলে সভ্যদের মনে হল, অন্তর ও মনের সঙ্গে শরীর চর্চারও প্রয়োজন কম নয়। লর্ড নামে এক ফরাসীকে পাওয়া গেল বক্সিং শিক্ষক রূপে। ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের উপর ছিল তার জাতক্রোধ, তাই সে বাঙ্গালীদের আপন ছাত্র করে নিলে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে মনে পড়ে সতীশ মুখার্জী, হরিশ শিকদার, ভুবনেশ্বর সেন রাধারমন দাস নিবারণ ভট্টাচার্য্য ও রাধাকুমুদ বাবুর নাম। কিছু শিক্ষার পর ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মারামারি হলে, তাদেরই মার খেয়ে পালাতে হ'ত ও বাঙ্গালীর জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষা পেত। পরে বিপিন দা, প্রভাস দা, ইন্দ্র দা আদি অনেকে যোগদান করে সমিতিব নূতন প্রাণ সঞ্চার করেন। আমি যখন সমিতির সভ্য হই, তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে সমিতি খেলাৎ চন্দ্রের শাখা স্কুলে বৌবাজারে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রথম বৈকালে যখন সেখানে উপস্থিত হলাম, দেখি কয়েকজন বালক ও যুবক, তাদের অনেকে বাঁশেব বড় লাঠি ঘোরাচ্ছে বা পরস্পর মারের খেলা খেলছে। কেউ কেউ হাতে গ্লাভ্‌স পরে পরস্পব বক্সিং লড়ছে, কেউ ছোরা খেলছে, ডন বৈঠক দিচ্ছে, কেউ বা কুস্তি লড়ছে। পূর্ব্বে এক মহরমে মুসলমান ছেলেদের লাঠি ঘোরান দেখতাম, ভাবতাম, কি বীরত্ব! বাঙালী হিন্দুর ছেলেরা লাঠি ঘোরায় এটা যেন অবিশ্বাস্য ছিল। আমিও প্রতিদিন সমিতিতে গিয়ে সকল রকল ব্যায়াম ও ক্রীড়া কৌশল আয়ত্ব করতে লাগলাম, ভবিষ্যতে অনাগত যুদ্ধের সৈনিক হবার প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্য।

বিপিন দা বলেন, বাঙালীর নামে ভীরুতার অপবাদ ছিল। ব্লকম্যানের ভূগোলে লেখা আছে বাঙালী ডোসাইল জাতি আর অভিধানে ডোসাইল মানে লেখা, নীরহ, যেমন গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি। তাঁর মনে সেই যে দাগ লেগেছিল, সে দাগ জীবনে মুছল না। সে দিন তরুণ মনে প্রতিজ্ঞা জাগল, বাঙালীকে বলিষ্ঠ হতে হবে, সাহসী হতে হবে, কবি দ্বিজেন্দ্র লাল যেমন বলে গেছেন, "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি ত মেষ।" বিপিন দা আজীবন নিজে সেই মানুষ ছিলেন আর তাঁর সব চেয়ে বড় দান, অগণিত সেই দেশপ্রেমী মানুষ যাদের গঠন করে দিয়ে গেছেন, যারা সারা ভারতে বাঙালা দেশের জন্য সম্মানের আসন সৃজন করেছে। আজও বাঙালী অনেক পশ্চিমাদের মত অর্থ সম্পদে ধনী হতে পারেনি, সত্য, শুধু অর্থসঞ্চয়ের পারদর্শিতা একটা জাতের আদর্শ থাকবে কিনা, গভীর সন্দেহের বিষয়। কিন্তু যে জাতের ত্যাগ আছে, সাহস আছে, দেশের জন্য কৃচ্ছ সাধন বরণ করতে যে জাতে মানুষের অভাব হয় না, সে জাতের আসন কারুর নীচে নয়।

আশুদা ছিলেন লাঠির ওস্তাদ। প্রভাস দা শেখাতেন ছোরা খেলা ও জুজুৎসু, রাজমোহনদা বিপিনদা ছিলেন বক্সিংএর ও অশেষদা ছিলেন সাঁতারের শিক্ষক। প্রতি রবিবার সকলে বাবু ঘাটে সাঁতার শিখতাম। খেলার মধ্যে ঢাপসা ও কপাটী ছিল প্রিয়। ওতে পয়সা খরচ ছিল না, খালি গায়ে মালকোচা বেঁধে নেমে গেলেই হ'ল।

পয়সা তখন কোথায় পাব! আমরা অধিকাংশ ছিলাম গরীব বাঙ্গালী ছেলে। কিন্তু আনন্দ বা দেহ গঠনের পক্ষে এই বিনা পয়সার খেলাগুলি কিছু কম উপযোগী ছিল না। আজকাল ত খেলার আনন্দ আয়োজন অর্থব্যয় সাপেক্ষ। এটা দরিদ্র দেশের পক্ষে ভাল কি? এসব ব্যয় বহুল খেলার কতটা সাধারণের আয়ত্বের মধ্যে আর কতটা ধনী বিদেশীয়দের অনুকরণে গ্রহণ করা হয়েছে, এটা ভাববার বিষয়। জাতীয় খেলা ত শুধু ধনীদের জন্য হতে পারে না। আজ দেশ রক্ষণের আয়োজনে সাধারণ লোকের মধ্যে যে দেহচর্চ্চার প্রয়োজন, যা সৈনিক হলে কাজে লাগতে পারে, তা দেখতে পাই না। লক্ষ লক্ষ লোক বহু অর্থব্যয়ে খেলা দেখে আনন্দ উপভোগ করতে যায়। দুঃখ নাই। কিন্তু নিজেদের দৈহিক অনুশীলন কোথায়? কাল যদি দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, শুধু মাহিনা করা সৈনিকদের দিয়ে দেশ রক্ষা সম্পূর্ণ সম্ভব হতে পারে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

রোগা শরীর, সমিতির কল্যাণে, পেশীবহুল হয়ে উঠল, স্বাস্থ্যের হল যথেষ্ট উন্নতি। বার্ণহাডি নামে একজন জার্মাণ মনস্বী বলেছিলেন, বলিষ্ঠ জাতি গঠন করে ড্রিল মাষ্টার ও স্কুল মাষ্টার, একজন গড়ে শারীরিক শক্তি অপরে গড়ে মানসিক। সকল উন্নতির ভিত্তি হল এ দুটি। দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার উপর নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়। ইতিহাসে দেখি

মুষ্টিমেয় বিদেশী এসে আমাদের দেশ জয় করল, প্রতিরোধের জন্য লোকের না ছিল শক্তি, না ছিল চেষ্টা। কিন্তু নেপোলিয়ন যখন মস্কোর অবরোধ করেছিল, ফরাসী ইম্পিরিয়ল আর্মি ধ্বংস করতে বাঁধা মাহিনার সৈন্যদের অপেক্ষা সাধারণ রুশদের গেরিলা বাহিনীর কম কৃতিত্ব ছিল না। সেদিনও হিটলারেরও অজেয় বাহিনীর পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল অধিকাংশ গেরিলা রুশদের আক্রমণে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শুধু নেতাজীর জাতীয় বাহিনী নয়, শুধু সংঘবদ্ধ অহিংস কংগ্রেসী শক্তি নয়, জন সাধারণের সাহস ও শক্তি গেরিলা বাহিনীর মত সাম্রাজ্য ধ্বংসে কম কাজ করেনি। তাই মনে হয়, অনুশীলন, যুগান্তর আত্মোন্নতি আদি সমিতির মত আজ স্বাধীন ভারতেও যদি সর্বত্র দেহ ও মন গঠনের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে ছেয়ে যায় তবে দেশ তাতে অনেক এগিয়ে যাবে। কিছু না হলেও, ভবিষ্যতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা যদি নাও আসে, তবু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেহের অনেক উন্নতি হবে। দুচারটা লোকের পেশী দেখে কত উন্নতির মাপকাঠি পাওয়া যায়, জানি না, যদি জনগণের সাধারণ ভাবে উন্নতি না হয়। অল্প জনের অতি উন্নতির চেয়ে বহু লোকের স্বল্পোন্নতি বাঞ্ছনীয়।

সমিতির প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতাম, এমনকি পরীক্ষাদিনেও ব্যায়ামের জন্য উপস্থিতির ব্যতিক্রম হত না। মধ্যে মধ্যে বাধা পেতাম বাবার কাছে, যখন লাঠির আঘাতে

মাথার ফোলা জায়গাটা দেখে ফেলতেন। বলতেন, কোন্‌দিন মাথা ফাটাবে, লাঠি না খেলে শুধু ব্যায়াম কর। শুধু ব্যায়ামে শরীরে পেশীগঠন হতে পারে, সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সৈনিকের আত্মরক্ষা ও আক্রমণাত্মক সকল রকম অনুশীলন না করলে চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কেমন করে! বন্দুক ধরে হোক, লাঠি ঘুরিয়ে হোক, ইংরেজ তাড়িয়ে দেশের স্বাধীনতা ত আনতে হবে! দেশ অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। তখন মায়ের শরণাপন্ন হয়ে বলতাম, মাথা বাঁচিয়ে সাবধানে চলব, বাবাকে বল, যেতে দিতে। শেষ সাবধানতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, চোখের জল, মুখে হাসি নিয়ে ছুটে যেতাম সমিতিতে। অবশ্য সেদিন থেকে দেহ যে অক্ষত থাকত, সে কথা বলতে পারব না।

হেমচন্দ্রের কবিতায় পড়তাম,

"বাজরে সিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।"

তখন সারা দেহ মনে যেন বৈদ্যুতিক শিহরণ জাগত আবার যখন পড়তাম,

এই কথা বলি মুখে সিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলি
নয়ন জ্যোতিতে হানিল বিজলী
বদনে ভাতিল অতুল আভা!"

তখন মানস পটে কল্পনায় উদ্ভাসিত হত স্বামী বিবেকানন্দের শান্ত সমাহিত সৌম্য বীরের রূপ। মনে উদয় হত শিবজী-গুরু রামানন্দের মূর্ত্তি। মনে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বই গুলি, তাঁর রাজসিংহ, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ। বালক মনে স্বপন দেখতাম, অশ্বারূঢ়া শান্তি, ভবানন্দ, জীবানন্দ, সত্যানন্দ ঠাকুরের পাশে তলোয়ার ঘুরিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, আর মুখে বলছি "হরে মুরারে, বন্দেমাতরম্"। স্বপন দেখতাম, ইংরেজদের আরাবল্লী গিরি সঙ্কটে অবরোধ করেছি, তারা শুধু একখানি জাহাজ ভিক্ষা চাইছে এদেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার জন্য। "তোমরা তোমাদের দেশ শাসন কর, আমরা আমাদের দেশ শাসন করি, এই হ'ল ভগবানের ইচ্ছা, আর কখনও আমাদের দেশ শাসন করতে এসো না" এই কথা বলে তাদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করছি।

টডের রাজস্থানের রাজপুত বীরত্ব কাহিনী পড়তে বিশেষ ভাল লাগত। মেবারের বীরত্ব গাথা পড়তাম। কবি দ্বিজেন্দ্র লালের গান গাহিতাম,

"মেবার পাহাড় শিখরে তাহার
রক্ত নিশান ওড়ে না আর॥"

রাণা প্রতাপের সে কঠোর দুঃখ বরণ, সেই বনে জঙ্গলে পর্ব্বতে কন্দরে ভ্রাম্যমান জীবন, সে ঘাসের বীজের রুটী খাওয়া, তাঁর সেই প্রিয় অশ্ব চৈতকের মৃত্যু, সে সকল অপূর্ব্ব

কাহিনীতে মন দুলে উঠত। দুঃখও হ'ত, এই বীরত্বের সঙ্গে যদি তাদের থাকত একতা, এক জাতিত্ব, ভারতের ইতিহাস হ'ত অন্যরূপ। একত্ব, জাতিত্ববিহীন বীরত্ব কোনও কাজে লাগেনি।

তারপর সেই মহারাষ্ট্রবীর রাজর্ষি ছত্রপতি শিবজীর নেতৃত্বে গৈরিকপতাকা তলে তীক্ষ্ণধী দুর্জয় সাহসী সে মহারাষ্ট্রজাতির উত্থান কথা পড়তাম। রমেশ দত্তের মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, জীবন সন্ধ্যা পড়তে পড়তে চোখে জল ভরে আসত, বুক ফুলে ফুলে উঠত। ভাবতাম, কোথায় গেল সেই সর্বভারতীয় মহারাষ্ট্রের কল্পনা। বড় বড় রাজা, মহারাজার উত্থান হ'ল, পতন হ'ল, কঠোর সাধনা থেকে বিলাসিতা ও ভোগের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হ'ল। এক জনের যখন সর্ব্বনাশ হচ্ছে, অপর জন শক্রকেই হয়ত সহায়তা করছে বা নির্লিপ্ত ভাবে জাতি ভায়ের পরাজয় দেখছে, দেশ চলে যাচ্ছে বিদেশীর কবলে। শিখ জাতি জেগে উঠল, এল রণজিত সিং, গুরু গোবিন্দ, আবার তারা ঘুমিয়ে গেল। পর্ত্তুগীজ এল, ফরাসী এল, ইংরেজ এল, এলনা ভারতের এক জাতিত্ব। ক্রমে সারা দেশ হয়ে গেল বিভক্ত আত্ম বিস্মৃত অচেতন ইংরেজের দাস।

পড়ানোর জন্য আমাদের কোনও গৃহ শিক্ষক ছিল না। স্কুলের পড়া নিজেই তৈরী করতাম, তবে বাবা, সারাদিনের কর্ম ক্লান্তির পরেও, পড়াতেন। তিনি মহাভারত ও রামায়ণ পড়াতে ভাল বাসতেন। তাঁকে "আপনি" বলতাম না, "তুমি"

বলতাম ও সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মত। যখনই জীবনে কোনও দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হ'তাম, তিনি গীতার মর্মবাণী বুঝিয়ে দিতেন, তোমার কর্ম তুমি করে যাবে, কে কি বলল, কি ফল ফলল সেটা বড় কথা নয়। তাঁকে মনে হত,

"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহাঃ
বীতরাগ ভয়ঃ ক্রোধঃ

মাথা নত না করে অন্যায়ের প্রতিরোধ করার প্রেরণা পেয়েছিলাম, প্রথম তাঁর কাছে। মা যখন মারা গেলেন, তখন আমার বয়স তের, পরে বাবা, মা ও বাবা দুয়েরই স্থান নিয়েছিলেন।

বাড়ী ছিল মেসের মত। পুরাতন এক ঝি ছিল, ছোট থেকে তার হাতে মানুষ হয়েছিলাম, তাই আমাদের 'তুই' বলত, প্রচুর স্নেহ করত। পরিচ্ছদে ছিলাম অত্যন্ত সরল। বাড়ীতে প্রায়ই জুতা ব্যবহার হ'ত না ও জামা গায়ে উঠত না। শীত বোধ হলে কাপড়ের খুঁট বা কোঁচার অংশ গায়ে জড়িয়ে নিতাম। শয্যার জন্য একটা শতরঞ্চিই হ'ত যথেষ্ট, বয়স ও স্বাস্থ্যের গুণে হাতে মাথা রেখেই গভীর ঘুমে সারা রাত কেটে যেত। ভোগ বিলাস পছন্দ করতাম না, তার জন্য সঙ্গতিও ছিল কম।

ভগবান ও দেবদেবীতে বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল গভীর। সকলের অপেক্ষা অধিক ভাল লাগত মহাদেবকে। অন্যান্য দেবদেবীকে স্পর্শ করতে পেতাম না কিন্তু মহাদেবকে স্পর্শে বাধা নাই, যেন নিতান্ত আপন।

দাদারা মাছ মাংস খেত না, ধর্ম সংস্কারে নয়, অহিংসার

জন্য। একদিন মেজদা কাটা কই মাছের কষ্ট দেখে কেঁদে মাকে বলে, মা আমি মাছ খাব না। ওদের কষ্ট হয় না? মেজদার বয়স তখন সাত বৎসরের অধিক নয়। সেই থেকে মেজদা আজীবন আর মাছ মাংস খায় নি। আমি ও দেখাদেখি নিরামিশাষী হয়েছিলাম। বাইশ বৎসর বয়সে যখন জেলে যাই, প্রায় ততদিন পর্য্যন্ত। জীবের কষ্ট আমিও সহ্য করতে পারতাম না। এটা জীবে প্রেম বা দুর্বলতা, বুঝি না। কতদিন ভেবেছি, হিংস্র বিপ্লবে শুধু মরা নয়, মানুষ মারার প্রয়োজন আছে। এ পথ আমাকে কেমন করে আকর্ষণ করল! কতিপয় দেশের শত্রু নিধন করে দেশের কোটী কোটী লোকের মৃতবৎ দুর্বহ জীবন থেকে উদ্ধার ও পূর্ণতর করে তোলার মধ্যে যে হত্যার প্রয়োজন, তাতে নিষ্ঠুরতা ম্লান হয়ে যায়। কয়েক জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বহু জীবনের পথ খুলে যায়। মন গেয়ে উঠত, "সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" আশা হ'ত, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মনের দুর্বলতা, কোমলতা হ্রাস পেয়ে ক্রমশ সবল নির্মম হয়ে উঠতে পারব।

সমিতির কয়েকজন সভ্য নিয়ে আমরা একটী সেবাদল গঠন করে ছিলাম। কারুর অসুখ করলে, পালা করে রাত্রি-জাগরণ ও সেবারভার নিতাম। পল্লীতে যদি কেউ ভিখারী ভোজন করাত, সেচ্ছাসেবক রূপে দলবদ্ধ ভাবে সে কাজে সহায়তা করতাম।

প্রতি শনিবার সমিতিতে আলোচনা সভা বসত। প্রথম যেদিন যোগ দিই, রামায়ণ সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। তখন আমি তের বৎসরের বালক, সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে যখন উঠলাম, আমার পাদুটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেল। কোনওরূপে বলে ফেললাম, রাবণ মৃত্যু সময় বলেছিল, সৎকর্ম করতে বিলম্ব করোনা ও অসৎকর্ম স্থগিত রেখো। ত'র বাসনা ছিল, স্বর্গের সিঁড়ি গড়ে দেবে, কিন্তু সেটা আর হ'ল না। কিন্তু সীতা হরণরূপ অপকর্ম্ম করতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব বা দ্বিধা করলে না। তাতে নিজে মরল, স্বর্ণ লঙ্কাও ধ্বংস হ'ল। বলা শেষ করে বসতে সভাপতি সতীশ মুখার্জী মহাশয়ের প্রশংসায় মনে সে কী আনন্দ!

সেখানে শুনতাম বিলাতে ভারতের শত্রু কর্জন উইলীকে হত্যা করে ধিংড়ার আত্মদান কথা, বীর সভারকরের কাহিনী। পড়তাম সুইজারল্যাণ্ড হতে প্রকাশিত ম্যাডাম কামার 'ইনডিপেণ্ডেন্স' পত্রিকার দেশ প্রেমের দৃপ্তবাণী। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পড়তাম, মায়ের মুক্তির জন্য সরল ভাষায় সে কী উত্তেজনা সৃষ্টি করত!

সমিতির দাদাদের কাছে স্নেহ পেতাম খুব, কিন্তু সে স্নেহে কোমলতায় বিশেষ সিক্ত ছিল না, বরং ছিল নির্ম'মতায় কঠোর। বক্সিং শেখাতে বিপিনদা মুখে মারলেন ঘুষি, ঠোঁট কাট্‌ল, রক্ত পরল। বুকের উপর টেনে নিয়ে আদর করে বল-লেন, 'দেখ্‌, একটু মার না খেলে শক্ত হবি কি করে?' ময়দানে

বিপিনদার সঙ্গে চলেছি, সমুখে কাদাজলভরা নালা, একটু ঘুরে গেলে শুষ্কস্থান দিয়ে যেতে পারি, বিপিনদা বলে উঠলেন, নালাটা লাফিয়ে পেরিয়ে যা, না হয় কাদায় পড়বি, নহিলে চিরজীবন সাহসের সঙ্গে বিপদের সর্ম্মুখীন না হয়ে পাশ কাটাবার বদ্ অভ্যাস হয়ে যাবে, ভীরু হয়ে যাবি। লোকে বলে, ওটা সুবুদ্ধির পরিচয় নয়, সময় সময় এর জন্য বিপদেও পড়িনি তাও নয়, তবু তাঁর সেই বহুকাল পূর্বের শিক্ষার প্রভাব জীবনে কম পড়ে নি। বহুবাজার দুর্গাপিথুরী লেনের বাড়ীর দেওয়ালের বালী খসা ছোট্ট ঘরটীতে বসে তাঁর কাছে দেশাত্ম বোধের কত কথা শুনতাম। বীর পিংলে বিদেশী অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট র‍্যাণ্ডকে পুনায় গুলি করে ফাঁসিকাঠে মৃত্যু বরণ করল। পড়তাম সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথা, ম্যাজিনি, গারিবল্ডি কাভুর সন ইয়েৎসেন ইত্যাদির জীবনী, অশ্বিনী বাবুর ভক্তিযোগ। বিপিনদার মধ্যে যোগ যাগ অনুষ্ঠানিক ধর্মপালন, বা যাকে আমরা সাধারণতঃ আধ্যাত্মিকতা বলি, তার বিশেষ কিছু দেখতাম না। অনেকে ভাবতেন, 'আধ্যাত্মিক' জীবনের সঙ্গে যুক্ত নহিলে দেশাত্ম জীবন অসম্ভব। কিন্তু তাঁর জীবনে দেখতাম, দেশের শত্রু নাশ কি করে হবে, দেশের বন্ধন কি করে ঘুচবে, দেশের পরাধীনতার কালিমা কিভাবে মুছবে, তাকে জড় বাদ বলা যাক, আধ্যাত্মিকতা বলা যাক—সারা জীবনের অনুক্ষণ, তাঁর সকল দেহ সকল মন এই সাধনায় দিয়ে গেছেন। আমাদের অনেক কিছু ছিল, কিন্তু বিপিনদার দেশ ছাড়া কিছুই

ছিলনা। আত্মা আছে কিনা, স্বর্গ, মুক্তি, আছে কিনা, জানিনা। কিন্তু এটা জানি দেশের তরে তাঁর সমগ্র জীবন দান আদর্শ, তাঁকে যারা দেখেছে তাদের মর্মে মর্মে বিরাজ করছে ও যারা তাঁর সংস্পর্শে আসেনি বা এ দেশের ভবিষ্যতে যে মানুষ আসছে, তাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের বিপিনদা বিরাজ করবে। দেশের মঙ্গলের এ নিষ্ঠার আলো নিভে যাবে না।

ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য এই রকম কয়েকটী মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁদের কেহ কেহ হয়ত ইতিহাসের পাতায় অজ্ঞাত থেকে যাবেন, কিন্তু দেশের জীবন ধারায় তাঁদের আদর্শ, আত্মার মত বিরাজ করবে ও প্রবাহিত হবে ভবিষ্যতের পানে। তাই শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, বাংলাদেশে বিপিন গাঙ্গুলীকে যে চেনে না সে যেন নিজেকে বাঙ্গালী বলে আত্মপরিচয় না দেয়।

দেখেছি প্রভাসদা (১) কে। যেমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রশস্ত কপাল তেমনি উদার হৃদয়। প্রফেসারি করে, যা উপার্জন করতেন, তার অধিকাংশ দিতেন সমিতির কাজে। মলঙ্গার আত্মোন্নতির যে শাখা সমিতি ছিল, তাতে চালক ছিলেন, অনুকুলদা, গিরিনদা, কালী দাস বোস, নরেন ব্যান্যার্জি ইত্যাদি। দেশপ্রেমের এক একটী জ্বলন্ত প্রতীক। ছিলেন অনুকুলদা, (২) সদা হাস্যমুখ দুর্জয় সাহসী, ছিলেন গিরিনদা (৩) অগাধ পাণ্ডিত্যের সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, যেন এযুগের চাণক্য। ইন্দ্রদাকে (৪) বড় ভাল লাগত। তাঁকে দেখে মনে হত আনন্দমঠের সন্তানদের

মত যারা কোনও গভীর বনে বন্দুক কামান বোমা আদি যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করছে তিনি তাদের একজন, ইন্দ্রদা আমাকে সেথায় নিয়েগিয়ে দেশমাতার সেবার সুযোগ দেবেন কি!

তিরিশে আশ্বিন, রাখিবন্ধন, সকালে গঙ্গাস্নান করে হাতে রাখি বেঁধে প্রোসেসনে গান গাইলাম, "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"। গাইলাম,

"আমরা সাতকোটী ভাই, সাতকোটী বোন,
আমরা ত নয় কম,
বল ভাই বন্দেমাতরম্॥

দুপুরে অরন্ধন বলে দুধ চিড়া খেলাম। বৈকালে ফের প্রোসেসনে বেরুলাম, গাহিলাম।

"যায় যাবে জীবন চলে
মায়ের কাজে জগত মাঝে
বন্দেমাতরম্ বলে।"

(১) রিপন কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীপ্রভাদ চন্দ্র দে, থাকতেন মধ্য কলিকাতায় গোবিন্দ সরকার লেনে।

(২) শ্রীঅনুকুল মুখার্জির বাস ছিল মলঙ্গা বহুবাজার

(৩) শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাস ছিল মলঙ্গায় পরে বৌবাজার স্কুলের ছিলেন প্রধান শিক্ষক।

(৪) শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী কর্ণেল নন্দীর পুত্র, বাস ছিল মধ্য কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে।

(৫) শ্রীকালীদাস বোস, বাস ছিল মলঙ্গায়, এখন কাশীতে থাকেন। দুই চক্ষু অন্ধ।

(৬) ৺শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাস ছিল মলঙ্গায়, পরে দেশ সেবক রূপে ছিলেন বীরভূমে।

বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়ীতে সভা হল। জাতীয় ফেডারেসানের চাঁদা উঠল। আমাদের পকেট ভর্ত্তি পাথর কুচিতে, সারকুলার রোডের রেললাইনের ধার হতে সংগ্রহ করা। পুলিস যদি গুলি চালায়, বেয়নেট চার্জ করে, আমরা সেই পাথর ছুড়ে লড়ব। সারা দিনের ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহে আবার চিড়া খেয়ে শুয়ে পড়লাম, তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে তখনও মৃদু স্বরে গাইছি।

"স্বার্থক জনম আমার
জন্মেছি মা এই দেশে।"

ঘুমিয়ে স্বপন দেখছি, বৃটিশের খড়্গে দ্বিখণ্ডিতা রুধীরাপ্লুতা মা, বঙ্গজননী, রাজ রাজেশ্বরী সুন্দরী মাতা নয়, এ আমার দুঃখিনী বাংলা মা, স্নিগ্ধ শ্যামল মুখ, দুই চোখে অশ্রুধারা।

অশেষদা ও রাজমোহনদা সাঁতার শেখাতেন। কিন্তু প্রতি রবিবারে গামছায় প্রচুর ভিজে ছোলা ও কিছু নুন আদা বেঁধে হেঁটে বাবু ঘাট যেতাম। দুই তিন ঘণ্টা সাঁতার কেটে ইডন উদ্যানে গাছতলায় বসে যে পরিমান ছোলা খেতাম, একটা ছোট ঘোড়ার পক্ষেও তা নেহাৎ কম হ'ত না। সাঁতার সেখানর পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। প্রথম রাজমোহনদা পেটের নিচে হাত দিয়ে ডুবজলে নিয়ে ছেড়ে দিলেন। যত হাত পা ছুড়ি, জল খেয়ে ফেলি, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, রাজমোহনদা কিছুতেই ধরেন না। কিন্তু এইরূপে তিন দিনে সাঁতার শিখিয়ে দিলেন। রাজমোহন দা বললেন এরকম না হলে শিখতে অনেক দিন লাগত।

নৌকা বাওয়া শেখবার জন্য বড়বাজার ঘাটে নৌকা ভাড়া নেওয়া হ'ল। একজন মাঝি ছাড়া কেউ রহিল না, সে বসে রহিল, আমরাই দাঁড় বেয়ে হাল ধরে খড়দায় গেলাম। সেখানে নোঙর বেঁধে একটা বাগানে খিচুরী পাক করে সকলে খাওয়া গেল। সে অমৃতের আস্বাদ কিসের জন্য, বলতে পারি না। তবে নুন ঝাল ঠিক পরিমিত থাকত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। কিন্তু তার মধ্যেও মধ্যে, মধ্যে, মনে আঘাত আসত সনাতনীদের দিক থেকে। আমাদেরই টিকি ও পৈতাধারী একজন আলাদা পাক করে খেলেন, একজাত হয়ে একত্রে খেতে কিছুতেই রাজি হলেন না। বুঝি না ভারতে এ কি অভিশাপ! একই দেশমাতার সন্তান, একসঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারি, একত্রে মরতে পারি, আহত হলে দেহের একই লাল রক্তের স্রোত একধারায় মিলতে পারে, কিন্তু হাঁড়ি ও ছোঁয়া ছুয়ির সংস্কারের প্রাচীর আমাদের এক জাতি হতে দেবে না। এই নিজেকে এক বিভিন্ন উচ্চ স্তরের মানুষ ও অপরকে অধম ভাবার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ছদ্মাবরণে ও মিথ্যা কুসংস্কারে কেউ দম্ভপূর্ণ নয়, কে বলতে পারে! অবশ্য অধিকাংশ বন্ধুর মন এই পার্থক্য ভাব বা জাত্যাভিমান থেকে যে মুক্ত ছিল, এইটাই ভবিষ্যতের আশা, হয়ত ভারত এক দিন এই জাতিভেদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে। শুনেছি, আলাউদ্দিন খিলিজি সেদিন যুদ্ধে জয় লাভ করতে না পেরে সন্ধ্যায় রাজপুত ছাউনির দিকে হতাশ ভাবে তাকিয়ে সহচরকে

জিজ্ঞাসা করলে, ওদিকে অতগুলি ধূয়ার কুণ্ডলি উঠছে কেন। বিভিন্ন জাতির অন্ন বিভিন্ন চুলায় পাক হচ্ছে শুনে বলে উঠল, তবে আমার নিরাশ হবার কারণ নাই।

এরা একত্রে লড়তে, মরতে এসেছে কিন্তু এত ভেদ! এই কুসংস্কারে সারা ভারতে জাতীর দেহে যে ফাটল ধরে আছে, তার মধ্যে যে দুর্বলতার সম্ভাবনা, সেদিকে আমাদের অনেকেই দেখেও দেখতে চান না। কোনকালে এর কি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল জানি না, কিন্তু আজকের দিনে এর কোনও অর্থ আছে কি! এক ভারতীয় মুসলমান সেদিন আমায় জিজ্ঞাসা করল, ভাই আমি যদি হিন্দু হই, আমার কি জাত হবে, আমার ছেলে মেয়ের বিয়ে হবে কার মেয়ে ছেলের সঙ্গে? মনে ভাবলাম, হয়ত আরও যে সকল মুসলমান হিন্দু হবে, তাদের সঙ্গে, কিন্তু একথা মুখে বলতে পারলাম না। সামাজিক সংস্কার দ্রুত সাধন করা কঠিন, এ কথা মানি, কিন্তু আমাদের গতি এতই মন্থর, এই দুর্বলতার ফাঁকে সর্বনাশ যদি আবার আসে, প্রায়শ্চিত্ত থেকে রেহাই পাব না। এই সনাতনী কুসংস্কার আমাদের "এক জাতি এক প্রাণ" হয়ে ভারতের গান গাইতে দেবে না। বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধী আরও কত জন ভারতের চেতনায় নাড়া দিয়ে গেছেন, তবু উচিত মত পরিবর্ত্তন আজও আসেনি, ভারত খণ্ডনের মহা প্রায়শ্চিত্তের পরেও।

জন সেবা ছিল আমাদের কর্মসূচি ও শিক্ষার অঙ্গ। গ্রহণে

বা যোগে ষ্টেশনে ও নদীর ঘাটে যাত্রীদের ভীড় হত, আমরা স্বেচ্ছাসেবকরূপে জনতার সেবা করতাম। এ জন্য স্বদেশী ছেলেরা জনগণের স্নেহের ও প্রশংসার পাত্র ছিল। সে বহুদিন পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে, বড়দা, মেজদা ও আমি, তিন ভায়ে রাত্রে সিয়ালদহ ষ্টেসনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করছি। তখন আমার বয়স চৌদ্দ হবে। মাল পত্র বহে যাত্রীদের গাড়ীতে তুলে দিচ্ছি। এক স্ত্রীলোক, তার ছেলেকে পাচ্ছিল না, ভীড়ে হারিয়ে গেছে, আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সে কি কান্না, পুত্রহারা মায়ের বুকের সে স্পর্শ বড় মিষ্টি লাগলেও তাঁকে বলতে হল, আমি তাঁর ছেলে নয়। ভুল ভাঙ্গতে আরও কান্না। তার ছেলেকে খুঁজে বার করে দেওয়া হ'ল। রাত্রি প্রায় তিনটায় বাড়ী ফিরিনি বলে বাবা চিন্তিত হয়ে ষ্টেশনে মিত্র মহাশয় নামক স্বেচ্ছাসেবকদের যিনি নায়ক ছিলেন তাঁকে আমাদের তিন ভায়ের বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বলতে পারেন তারা কোথা? নায়ক উদার হাস্যে বাবাকে বললেন, আপনার তিন ছেলে ভলান্টিয়ার! আপনি ত সৌভাগ্যবান পিতা, ভাবছেন কেন, নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী যান। তাঁর উন্নত বলিষ্ঠ দেহের রূপ এখনও মনে আছে যদিও পুরা নামটি ভুলে গেছি।

দেশ বলতে দেশের জনসাধারণ, চাষী বা যারা কায়িক পরিশ্রম করে খায়, তাদের ততটা মনে হ'ত না, গরীব মুসলমানদের দেশের লোক বলে ভাবতেই পারতাম না, দেশের

লোক বলতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেদের কথা মনে জেগে উঠত। আনন্দ মঠে যেমন আছে এক মাতৃমূর্তির কল্পনা। বাস্তবের দৃষ্টিতে ভক্তির রঙ থাকত। দেশমাতা শুধু অন্ন বস্ত্র মাটিছাড়া আরও কিছু কল্পনা। এক মুসলমান রাজমিস্ত্রি পল্লীর কোনও এক বাড়ীওলার কাজ করে টাকা পায়নি, খুব তাগাদা করছিল। 'ভদ্রলোককে ছোটলোকে অপমান করে ভেবে সেই রাজমিস্ত্রির দাড়ীটা বাঁ-হাতে ধরে মোচড় দিয়ে তাকে ফেলে দিলাম। সে গরীব বৃদ্ধমুখের ভীত চাহনি, সে দুঃখের দাগ, মন থেকে আজও মোছেনি। কেন অমন করে ছিলাম! সে কাজ করে পারিশ্রমিক চেয়েছে, হয়ত গরীব বলেই ভদ্রলোকের কাছে টাকা পাচ্ছে না, আমার ত উচিত ছিল তার পরিশ্রমের মূল্য আদায় করে দেওয়া! এই আমাদের দৈহিক শক্তির সদ্ ব্যবহার! আজ ও কত রিক্সাওয়ালা, ঠেলা গাড়ীর কুলী বা ঝাঁকা মুটেদের পথে ঘাটে অপমানিত হতে দেখি, শুনি তারা 'ভদ্রলোকের' সম্মান জানে না, আমার সেই পুরাতন অপ-বীরত্বের কথা মনে পড়ে যায়।

পূজায় অষ্টমীর দিনে প্রাতে দেবী প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করে দীক্ষায় বসলাম। একজন তীক্ষ্ণ ছোরা দিয়ে বুকের মাঝখানে অল্প চিরে দিতে একটু রক্ত বেরুল। বেলপাতায় সেটুকু মাখিয়ে দেবীর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বললাম, মা! আমার দেহ প্রাণ তোমার সেবায় উৎসর্গ হল। ওই দেবীই যেন দেশ মাতা।

সন্ধ্যায় সমিতির প্রাঙ্গনে বীরাষ্টমী উৎসব। সভানেত্রী এলেন শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, শুভ্র সিল্কের সাড়ী পরিহিতা দেবী রাণীর মত। হুংকার সমেত কত বড় লাঠির খেলা, কত বীরত্ব ব্যঞ্জক তীক্ষ্ণ ধার তলোয়ার ঘোরান. বাক্সিং ফেন্সিং কুচকাওয়াজ দেখান হল, মনে হল, দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি আর অসম্পূর্ণ নাই, ঝাঁপ দিয়ে পড়লেই হয়। আমাদের অহিনদা (১)যখন সত্যানন্দ ঠাকুরের রূপে, মা যা ছিলেন সেই পূর্বের রাজরাজেশ্বরীরূপ বর্ণনা করে বলতে লাগলেন, 'দশভূজা দশ প্রহরণধারিণীং, আবার যখন মা যা হয়েছেন 'কালী' ! বলে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, তখন অন্তরে অন্তরে আমাদের সে কি শিহরণের দোলা লাগল, আজও ভুলিনি।

রাজা সুবোধ মল্লিকের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাস ভবনে শিবজি উৎসব হল। মার্থাজার সোর্ড খেলা, শিশির ঘোষ ও আশুদার বড় লাঠির মারের খেলা, লাঠির সারবন্দী ড্রিল, যেন দুই দল পরস্পর যুদ্ধ করছে। রাত্রি পর্যন্ত কত কি ক্রীড়া কৌশলের প্রদর্শন হল। সভাপতি জমিদার পালচৌধুরী মহাশয় তাঁর বাহুর পেশী দেখালেন, এসব দেখে বালক মনে ভাবতাম, ইংরাজের সাধ্য নাই এ দেশ পরাধীন রাখতে পারে। সভাশেষে আমাদের মলঙ্গা পল্লীর দুর্গাদা গাইলেন।

"আমায় দে মা অসি।

সন্তানে অক্ষম ভেবে বল মা আর কত সবে

আধো বদনে শুধু নীরবে বসি।

যুগে যুগে মাগো তুমি, রণ সাজে সাজায়ে
সমরে সন্তানে কত দিয়েছ মা পাঠায়ে
আজ দেখে হৃদি বিদরে, বল মাগো কি করে
অধোবদনে শুধু নীরবে বসি।”

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে আর একখানি গান গাওয়া হ'ল, তার কয় ছত্র মনে পড়ে।

“যদিও জননী শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না
তবুও গো মা পারি তা ঢালিতে
এক বিন্দু তব কলঙ্ক খালিতে
মিটাতে তোমার যাতনা
আমায় বলোনা গাহিতে বলোনা।
একি নয়নের জল হতাশের শ্বাস
মিছে কথা শুধু ছলনা।”

পল্লীর এক গৃহস্থের মা ছিলেন কাশীতে, তাঁকে আনবার লোক নাই, শেষে আমাকে যেতে হ'ল। দুটি কম্বল, দুই খানি ধুতি ও কামিজ নিয়ে কাশী পৌঁছে পাণ্ডার বাড়ী খুঁজে বার করলাম। কিন্তু পাণ্ডা মহাশয় স্থানাভাবের অজুহাতে থাকতে দিলেন না। তখন আমার বয়স ষোল। দশাশ্বমেধ ঘাটে পুটুলী রেখে স্নান করলাম, দোকানে কিছু খেয়ে একটি ছেলেকে পথ প্রদর্শকরূপে সঙ্গে নিয়ে এলাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে। বড়দা বরাবর চাঁদা তুলে সেথায় পাঠিয়ে দিত। অধ্যক্ষ ডাক্তার চারু

বাবু আমাকে তাই সাদরে স্থান দিলেন। আর্ত রোগীদের সেবা পরিচর্য্যা করব। পনেরটি দিন অভিনব অভিজ্ঞতায় কাটল। একটি বাঙ্গালী মেয়ে ছিল, তার কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত বিকলাঙ্গ, শুধু বসে ও শুয়ে দিন রাত্রি কাটাতে হ'ত। গভীর অনুকম্পায় মন ভরে যেত। গম্ভীর মুখে বলতাম, পরমাত্মার চিন্তায় সময় কাটাতে। সে ম্লান হাসত, হয়ত আমার উপদেশের মিথ্যা গাম্ভীর্য্যে। আর একটি রোগীর মৃত্যু দেখলায়। সেই প্রথম দেখা, কেমন করে প্রলাপের মধ্য দিয়ে জীবন প্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে এল। হাসপাতালে ধীরেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি জুটেছিল, সে তার বিধবা মা, ছোট বোনদের নিরাশ্রয় ফেলে রেখে ঠাকুরের কৃপা ও মুক্তি সন্ধানে চলেছে। কাশীতে কয়েকদিন থেকে সে যাবে হরিদ্বারে, কর্মযোগ ছেড়ে জ্ঞান যোগের আকর্ষণে। তাকে বললাম, মানুষের সেবা করনা কেন, চাও ত ভগবান মিলবে, সে বলল, ভগবানের কৃপা প্রথম লাভ হলে তবে মানুষের সেবার অধিকারী হওয়া যায়। তার কথা সেদিন বুঝিনি, আজও এমন কথা শুনি, বুঝি বলে মনে হয় না। পনের দিন পর বুড়ীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম।

মধ্য কলিকাতার ছেলে ইটের পাঁজার মধ্যে বড় হলেও, প্রকৃতির শোভায় কম অনুভূতি জাগত না। মনে ভাবি, হয়ত অভাবের জন্যই আকর্ষণ বেশী। ছুটির দিনে নিস্তব্ধ দুপুরে বাড়ীর ছাদে প্রাচীরের ছায়ায়, শুয়ে আকাশের নীলিমার পানে

তাকিয়ে থাকতাম। দেখতাম চিলগুলির সাবলীল ভেসে যাওয়া, নিকটস্থ আম গাছে কত বুলবুলি আসত, মধ্যে মধ্যে তাদের ডাক কানে আসত। ময়দানে কোমল ঘাসের উপর শুয়ে গড়াতাম, বুকে যেন তাদের আলিঙ্গনের স্পর্শ পেতাম, কানে যেন শুনতাম তাদের অস্পষ্ট ভাষা। দিদির অসুখে শিমুল-তলায় যেতে হয়েছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবকাশে বহুদিন থেকে ছিলাম। 'আমিই হলাম সেথায় অভিভাবক। সঙ্গে ছিল চয়নিকা। অবসর থাকত প্রচুর আর মন থাকত প্রাকৃতিক ও কবিতার আবেষ্টনে ডুবে। জানালার পটীতে বসে বই হাতে তাকিয়ে দেখতাম বাহিরের পানে, হাল্কা মেঘের টুকরাগুলার সাবলীল গতিতে ভেসে যাওয়া, প্রান্তসীমার ধূসর স্তব্ধ পাহাড়গুলি, অসমতল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে আকাশে পাতা মেলে দাঁড়িয়ে থাকা মহীরুহ, হরিতাভ ফসল ক্ষেত, তারই মাঝে মাঝে লাল খোলার খাপরা ছাওয়া চাষীদের মেটে কুটীর, রাখাল ছেলে গাছতলায় বসে বাঁশের বাঁশি বাজাচ্চে, সে বাঁশির সুরের লহরী অনন্তের স্তব্ধতার গভীরে মিশে যাচ্ছে, অদূরে, শান্ত গাভীর মন্থর গতি, দেখতাম, বই পড়তাম, কণ্ঠে গুন গুনিয়ে গান জেগে উঠত,

"সুদূর, বিপুল সুদূর,
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাসরি ॥

হৃদয়ের অন্তরতম গভীরতায় প্রকৃতির যে নিবিড় আকর্ষণ, সূক্ষ্ম সুরের মত, বোঝা যায় না, ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। বেদনায় ও আনন্দে এ অনুভূতি জেগে উঠত ছাত্র জীবনের ও দেশ সেবকের দৈনন্দিন কর্ম ব্যস্ততার মাঝে, মায়ের বুকে শিশুর ফিরে আসার মত।

স্কুলে ছাত্র হিসাবে মন্দ ছিলাম না বলে শিক্ষকদের স্নেহ পেতাম যথেষ্ট। ১৯১০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার যখন ফলাফল বেরুল, দেখি বৃত্তি লাভ করেছি। এ ছিল আমার স্বপ্নেরও অগোচর। ভর্তি হলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে, দশ টাকা কলেজের মাসিক ফি দিয়ে উদ্‌বৃত্ত পাঁচ টাকা বাবার হাতে দিতাম। এ কটা টাকা তুচ্ছ, তবু দরিদ্র সংসারে আমার দ্বারাও সাহায্য হচ্ছে, ভাবতে মন আনন্দে ভরে যেত। মেজদার, বি এস্ সি পাসের পর শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার ঠিক হ'ল। কিন্তু কলেজ ও হোষ্টেল ফি দেবার অর্থ ছিল না। তাই বড়দা এম্ এ ক্লাসে ভর্তি না হয়ে, মেডিক্যাল কলেজে কেমিষ্ট্রির ডিমনস্ট্রেটরী চাকুরী নিলে, যাতে মেজদার পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া সম্ভব হয়। পরে প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় ও হোষ্টেলের মনিটর হওয়ায়, মেজদা বৃত্তিলাভ করল ও হোষ্টেলের থাকার চার্জ লাগল না। বড়দা পরে তখন আবার রসায়ণের এম্ এ ক্লাসে ভর্তি হ'ল। বড়দার এই ভ্রাতৃস্নেহ ভোলবার নয়। এমন অনেক সংসার দেখা যায়, সকলের কল্যাণে ভাই বা বোনের এমনই আত্মত্যাগ, যার জন্য

কত প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়েছে। ভাই বোনের ভালবাসা কত মহৎ, মাধুর্য্যে কত অপরূপ!

স্বদেশী আন্দোলন চলতে লাগল। বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিল। প্রতিজ্ঞা করল

"পরের ঘরের কিনব না আর
ভূষণ-বলে গলার ফাঁসি॥"

সারা বাংলার সহরে ও গ্রামে বিলাতী বস্ত্রের কত বহ্নুৎসব হ'ল। শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বদেশী গ্রহণ করল। কিন্তু যে চরখা ও কুটীরের তাঁত শিল্প ইংরেজ বিলাতী বস্ত্রের বাজার সৃষ্টি করতে ধ্বংস করেছিল, সে চরখার পুনর্চলন হল না। পরিবর্তে দেশে, বিশেষতঃ বম্বে ও আমেদাবাদে, ল্যাঙ্কাশায়ারের অনুকরণে সূতা ও কাপড় কল বসল, গ্রাম ছেড়ে চাষীর ছেলে মেয়ে, কলে গিয়ে বস্তীবাসী মজুর হ'ল। বিদেশী শুভ্র চিনির পরিবর্ত্তে লাল চিনি, ও গুড় সাদরে গৃহীত হ'ল। 'লবণাম্বু রাশি বেষ্টিত যে স্থল, জন্মে লিভারপুলে লবণ তাহার, সেই বিলাতী লবণের স্থানে দেশী সৈন্ধব ও কর্কচ নুন খাওয়া সুরু হল, একটু মলিন হলেও। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই স্বদেশী ভাব স্রোত রোধ করতে সকল রকমের অপচেষ্টা করল। সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে মুসলমানদের হিন্দুদের থেকে পৃথক করবার প্ররোচনা দিল।

তবু শেষে ভাঙ্গা বাংলা জোড়া দিতে হ'ল। বাংলা স্বাদেশিকতার চেতনা উপলব্ধি করে জাতীয়তা ও শিল্পোন্নতির পথ ত্যাগ করল না। বঙ্গলক্ষ্মী মিল, বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ন্যাশ্যান্যাল ব্যাঙ্ক্, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইত্যাদির সৃষ্টি হ'ল, যাতে পরণের জন্য স্বদেশী কাপড় পাই, রোগের জন্য স্বদেশী ঔষধ পাই, স্বদেশী শিল্পের মূলধনের অভাব না হয়, সরকারী স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়িত স্বদেশী ছেলেরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। স্বনামধন্য রাসবিহারী ঘোষ, মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, রাজা সুবোধ মল্লিক আদি কত মহাপ্রাণ মুক্তহস্তে দান করলেন, স্মরণীয় হীরেন্দ্র দত্ত, সত্যানন্দ বোস আদি নিঃস্বার্থ কর্মীদল স্বদেশী সংস্থা গড়ে তুললেন, অরবিন্দ বরোদা রাজ্যের উচ্চ বেতন ও গৌরবের পদ ত্যাগ করে সামান্য আয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগদান ও দেশের সেবার আত্ম নিয়োগ করলেন।

সাম্রাজ্যবাদী লোভী ইংরেজ সারা ভারতকে বাঁধল পরাধীনতার নাগপাশে, শাসণ ও শোষণ করতে। কিন্তু সেই পরাধীনতা বিষের মধ্য থেকে ক্রমে এল সারা ভারতের জাতিত্ব বোধ, একতা। এল পশ্চিম থেকে বিজ্ঞান, নূতন আলোক নিয়ে। এল নব জাগরণ। শত্রুর রূপে বিদেশী ইংরেজ, অজ্ঞাতে অনিচ্ছায় আমাদের মিত্রের কাজ করল বললে হয়ত খুব মিথ্যা বলা হয় না।

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গল ময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়
লোক ভয়, রাজ ভয় মৃত্যু ভয় আর",

রবীন্দ্রনাথ

কলেজে ভর্তি হবার পূর্বে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়ে ছিল। দাদাদের সঙ্গে গিয়ে প্রথম তাঁকে দেখি, আপার সার্কুলার রোডে একটী বাড়ীর দোতালার ক্ষুদ্র ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে স্কটের মারমিয়ন পড়ছেন। সে বাড়ীর নিচের তলায় ছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের একটা গুদাম। দেউড়ী নাই, দ্বারবান নাই, আসবাবের কিছু মাত্র বাহুল্য নাই, পরিচ্ছদ অতি সামান্য, একটা মোটা খাটো ধুতি ও বাগের হাট ছিটের কোট, দেখলাম অত বড় লোকটী, যাঁর দেশ জুড়ে কত খ্যাতি, কত উপার্জন, অতি সরল সাধারণ মানুষের মত। আশ্চর্য্য মানুষ! কাছে পেতেই, আমার বাহুর পেশী দুটা টিপে দেখলেন ও বুকের উপর গোটা চারেক ঘুষি মেরে বললেন, দেখ্, কেল্লায় যখন ঘোড়া বা বলদ কেনে, এক সপ্তাহ না খেতে দিয়ে চড়তে দিয়ে পরে দেখে নেয়। যে গুলা তখনও সতেজ আছে, অক্ষম হয়নি, শুধু সে গুলাই বেছে নেয়, বাকীগুলা বাতিল করে। আমার কাছে কেউ এলে তাকে প্রথমেই বাজিয়ে দেখি, টিকবে কি না। মাষ্টার মশায় আপনি নিজে ত-রোগা, বলায় হেসে বললেন, রোগা বটে, কিন্তু

দেখছিস্, হাড়গুলা কত মোটা ও শক্ত। তাঁর কাছে প্রণাম বা পদধূলির বালাই ছিল না, ও সব পছন্দ করতেন না। পা টিপে দিতে লাগলাম। ছেলে বেলায় রোজ বাবার পা টেপার অভ্যাস ছিল। তাঁর একমাত্র সহায়ক বা ভৃত্য বৃন্দাবনের রান্না, কাঁচা লঙ্কা কুচি দেওয়া মুগের ডাল দিয়ে ভাত খাওয়া হ'ল। জীবন ভরে কত ডাল ভাত খেয়েছি, কিন্তু আচার্য্য রায়ের গৃহে সেই প্রথম দিনের খাওয়ার স্বাদ আজও ত ভুলতে পারি নি। জীবনের পথে চলতে চলতে কোটী কোটী ঘটনা অতীতের বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত হয়ে যায়, তারই ফাঁকে ফাঁকে, ভেসে ওঠে তুচ্ছ ক্ষুদ্র কয়েকটি অনুভূতি।

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক কত আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের প্রতিভার তালিকায় আচার্য্য রায়ের স্থান কোথায় জানি না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতে ভারতে তাঁর দান অতুলনীয়। আজ স্বাধীন ভারতে যত নাম করা বৈজ্ঞানিক দেখি, বিজ্ঞান ও রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের যাঁরা কিছু উল্লেখযোগ্য সৃজন করেছেন, তাঁদের অধিকাংশ আচার্য্য রায় বা তাঁর শিষ্যদের নিকট ঋণী বললে অত্যুক্তি হয় না।

তিনি একটী কথা প্রায়ই বলতেন। আমেরিকার পেরীতে ঘাস জঙ্গলে এক একটা রাখাল কাউবয় যত গরু চরায়, তার বহু গুণ আমাদের দেশের লোককে চরাচ্ছে, এক একটা বৃটিশ। লজ্জায়, ক্ষোভে মাথা হেট করে বলতাম, তাইত, মাষ্টার মশায়, জীবন পণ করেছি, ইংরেজ তাড়াব, দেশ স্বাধীন করব যেমন করে পারি।

নহিলে যাক না এদেশ ডুবে ভারত মহাসাগরে। আবৃত্তি ক'রে বলতাম "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে!" সত্য কথা বলতে কি, মনের তখন এমন অবস্থা হয়ে ছিল, 'ধর্মের' কথা, আত্মা পরমাত্মার কথা, অন্তরে, এ সকলে কিছুই সাড়া দিত না, ভাল লাগত দেশের কথা শুনতে কি করে ভারত স্বাধীন হবে। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগত, কেমন করে ত্রিশ কোটী লোক, মুষ্টিমেয় ইংরেজের কাছে পরাধীনতা মেনে নিয়ে নিশ্চিন্তে আরামে দিন কাটাচ্ছে আর বড় বড় আধ্যাত্মিকতার কথা বলছে। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় রাজকুমার বাবু নামে একজন শিক্ষক পেয়েছিলাম, তিনি ক্লাসে হেড মাষ্টারের অগোচরে যুগান্তর পত্রিকা পাঠ করে শোনাতেন। রাজকুমার বাবু ছিলেন একটি ক্ষুদ্র স্কুলের অজ্ঞাত সামান্য শিক্ষক, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ভারত বিখ্যাত প্রফেসর, কিন্তু দেশ প্রীতিতে তাঁদের মনের ছিল কত মিল। দেশপ্রেম জাগরণে তাঁদের দান অমূল্য।

আমাদের দেশে এখনও অনেকে দেহ গঠন না করে মন গড়তে চান, আর দেহ ও মনের বিনা অনুশীলনে আত্মার বিকাশ দেখতে চান। তাই জড় বাদ, জড় বাদ, বলে ইউরোপের নিন্দায় আমরা পঞ্চমুখ। কিন্তু আমাদের আত্মিক শক্তি এমন অদ্ভুত ছিল যে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের অধীনে পরাধীন ছিলাম দু'শ বৎসরের অধিক, তাব আগে মোগল ও পাঠানের অধীনে কাটিয়েছি, পাঁচশ বৎসর, আর তার জন্য লজ্জা বোধ করি নাই। নিছক জড় বাদ ভাল না হতে পারে, কিন্তু, দারিদ্র্যের দীনতায় মিথ্যা

আধ্যাত্মিকতা, যার সঙ্গে নৈতিক ধর্ম, অন্তরের সংস্পর্শ নাই, যাতে নাই মানব কল্যান, কি করে তা আমাদের গর্বের কারণ হতে পারে বুঝিনা।

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সরল অনাড়ম্বর জীবনের প্রভাব লাগত আমাদের জীবনে। অত বড় বৈজ্ঞানিক প্রফেসর, উপার্জ্জন কম ছিল না, সর্বস্ব ছাত্রদের দান করতেন, প্রচ্ছন্ন ভাবে, পাছে নিজের নাম জাহির হয়। কখনও বা দেখতাম, নিজ হাতে সাবান দিয়ে জামা কেচে নিচ্ছেন। বম্বে যাচ্ছিলেন, হাওড়া ষ্টেশনে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেণ কামরায় নিজ হাতে বিছানা পাতছেন, এক চাপবাসি তাঁর দাড়ীর পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপকা সাব ক্যা বোম্বাই যাতে? গান্ধীজীর নাম প্রথম তাঁর মুখে শুনি। সংবাদ পত্রের একটা কাটিং পড়তে দিয়ে বললেন, দেখ, কত বড় মানুষটা! তাতে গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের কিছু কথা ছিল। তখন অহিংসার কথা বুঝতাম না। সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া দেশ যে স্বাধীন হতে পারে, এ ছিল ধারনারও বাহিরে। গান্ধীজী কত বড়, এ বিচার করবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। আমার হাতের লেখা মন্দ বলে একদিন আদর করে বললেন, তোর উপর কিছু ভরসা আছে, তোর ত কেরাণীগিরি জুটবে না, ব্যবসায়ী তোকে হতেই হবে। তখন ভাবিনি, তাঁর সে আশীর্ব্বাদ এমন ভাবে ফলবে! কেরাণী গিরি চাকুরীর উপর ছিল ভীষণ বিতৃষ্ণা। ওকালতীর উপর ছিল তাঁর এত অপছন্দ যে একদিন আশুবাবুকে বলেছিলেন, তোমার

ল কলেজটা গঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে দেশের কিছু ভাল হয়। বুকে দু একটা ঘুষি ছিল আমার নিত্য প্রাপ্য। নিজের দেহ শীর্ণ বলে বোধ করি স্বাস্থ্যের উপর ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। নাম ধরে আমায় ডাকতেন না, ডাকতেন সর্দার বলে। যখন ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে এম, এস্, সি পড়ি, তাঁর মারকাপটন্ সম্বন্ধে রিসার্চে সহায়তা করতাম। প্রতিদিন বৈকালের টিফিনের জন্য আধখানা পাউরুটী, ডাল ও কিছু সিরাপ রেখে যেতেন। তাঁর সাহায্যে শিক্ষিত গরীব ছাত্রদের কাউকে যখন দেখি, আজ ধনীর সাড়ম্বর ও স্বার্থ সর্ব্বস্ব জীবন যাপন করছে, তখন সত্যই খুব দুঃখ হয়। সরল জীবনে উচ্চ আদর্শ, জীবনে অনেকে মুছে ফেলেছে। কৃত্রিম সাজ পোষাক ও আদব কায়দায় নিজেদের বড় দেখাবার চেষ্টা চলেছে। দারিদ্র্য নয়, ভোগ বিলাস নয়, সুন্দর সরল বলিষ্ঠ জীবন যাপনের সুযোগ যাতে দেশের সকল লোকের আসে, সেই ছিল তাঁর সাধনা। ভগবান সম্বন্ধে কখনও কোনও কথা তাঁকে বলতে শুনিনি। কিন্তু দেশের লোকের কিসে ভাল হবে, এই ছিল তাঁর নিত্য ভাবনা।

সনাতন কুসংস্কার, ধর্মের গোঁড়ামী, এ সব তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পাঁজি, পুঁথিতে দেশের জন সাধারণের মনগুলিকে কিরূপে নেশাচ্ছন্ন করে রেখেছে একথা তিনি প্রায়ই বলতেন। ধর্মের ব্যবসাদারীর উপর ছিল তাঁর তীব্র কশাঘাত। সপ্তদশ অশ্বারোহী যখন বাংলার রাজধানী আক্রমণ করেছিল, তখন দেশের নৈয়ায়িক ও ধর্ম-ধ্বজীরা, তাল পড়ে ঢিপ করে বা ঢিপ

করে পড়ে, এই গভীর মীমাংসায় ব্যস্ত হয়ে পৈতা দুলাচ্ছিল ও টিকি নাড়ছিল, এ কথা তিনি কতবার বলেছেন।

নিত্য সন্ধ্যা হতে রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি ময়দানে রবার্ট ষ্ট্যাচুর তলে বসতেন। অত কাজের লোক, প্রতি মুহূর্ত্ত তার কত মূল্যবান, কিন্তু তবু প্রতিদিন দুই ঘণ্টার উপর ময়দানে মুক্তবায়ু সেবন করাটা স্বাস্থ্যের জন্য যে কত প্রয়োজন মনে করতেন, আমরা তার কতটুকু বুঝি! প্রিন্সিপ্যাল গিরিশ বসু, সত্যানন্দ বসু আদি অনেকে সেই সান্ধ্য সভায় আলাপ আলোচনা করতেন; ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর কাছে এসেছি, তিনি আদর করে বলতেন, সর্দার নইলে এমন ঘোড়ার মত ছুটবে কে! তিনি ছিলেন, আজীবন ব্রহ্মচারী, আমরা ছিলাম তাঁর কত ছেলে! প্রত্যেকেই ভাবত, তাকে সবচেয়ে বেশী-ভালবাসেন আর সে ভালবাসা উগ্র হয়ে উঠলে, পড়ত বুকে ঘুষি; এমন কি চরণ চাপও বাকী থাকত না। আমার মত কত ছেলে তাঁর স্নেহ ধারায় মানুষ হয়েছে, তাদের কত জন আজ ভারতে গন্যমান্য স্থান লাভ করেছে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে নূতন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের দেখা পাব কি! মানুষ আশায় বেঁচে থাকে! নবীনের মধ্যে প্রাচীন নববিকশিত হয় বলেই মৃত্যুর মধ্যে গোপন থাকে অমৃত।

কলেজ

"স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনও শেখেনি বাঁচিতে।

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুব তারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা”

রবীন্দ্রনাথ

কলেজে এসে অনেক নূতন নূতন সহপাঠিদের পরিচয় পেলাম। পূর্বে ধারণা ছিল, ধনী ঘরের সন্তানেরা ও অত্যন্ত মেধাবী যারা, তাবাই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু দেখলাম, অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ঘরের-সাধারণ ছেলে। অবশ্য স্কলারদের ও গণ্যমান্য ঘরের ছেলেদের সংখ্যা অন্যান্য কলেজের অপেক্ষা কিন্তু বেশী। এতে ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্যলাভের কিছু সুযোগ লাভ হয়। কিন্তু হিন্দু হোষ্টেল হ'ল অপূর্ব। বাংলার সকল অংশের ও কিছু অন্যান্য প্রদেশের, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে, সকল রকমের ছাত্রদের সমাবেশ পাওয়া যেত হিন্দু হোষ্টেলে। কলকাতায় বাড়ী বলে, হোষ্টেলের অধিবাসী না হলেও, এমন একজন হয়ে পড়লাম, যে সকলে মনে করত আমি হিন্দু হোষ্টেলের বোর্ডার। বাড়ীতে বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী পুরুষেরা এক সঙ্গে থাকে, তাই মুক্ত আনন্দ তেমন পাওয়া যায় না, যেমনটি পাওয়া যায় হোষ্টেলে। অধিবাসীদের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ বার্ষিক ছাত্র পর্য্যন্ত, বয়সের তারতম্য সাত আট বৎসরের অধিক হয়। এই বয়সের পার্থক্য বন্ধুত্বে কিছু আসে যায় না। তাই আনন্দের হিল্লোল বহিতে থাকে। বৈকালে হোষ্টেলের তৃণে ঢাকা প্রাঙ্গনে ফুটবল

পড়ল বা হকি নিয়ে নামলাম, খেলা চলল। সকালে, বিশেষতঃ ছুটীর দিনে আকাশে মেঘ এল, তেল মেখে বল খেলা সুরু হল, ঝমাঝম বৃষ্টীর মধ্যে। রাত্রিতেও মাঝে মাঝে ঘাসের উপর বসে গল্প চলল। পড়াতে পরস্পরের সাহায্য থাকত, অকুন্ঠিত, অফুরন্ত। তার মধ্যে মধ্যে বিখ্যাত বনমালীর লুচি ছোলার ডাল সমেত আসত জলখাবার। স্মৃতির পটে সেকালের কথা ভাবতে সত্যই সুন্দর লাগে আর আমার এ কথায় যদি আমার পুবাণ বন্ধুদের পূর্ব কথার স্মৃতি একটু জেগে ওঠে ও এ বয়সে একটু আনন্দের দোলা লাগে, লেখা সার্থক মনে করব। প্রেসিডেন্সি কলেজের জীবনকেন্দ্র ছিল হিন্দু হোষ্টেল, শুধু বোর্ডারদের নয়, আমাদের মত অন্যান্য ছাত্র-দেরও ছিল মিলন-ক্ষেত্র।

ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, পাশ করব, বড় হব, ধনী হব। দেশের কথা ভাবত না, পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করত না। কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে অনেককে খুঁজে পেলাম, যাদের অন্তরে নিজে বড় হওয়া ছাড়া দেশের ও জাতির জন্য চিন্তার স্থান কম ছিল না। অবশ্য তাদের সকলকে জানা সম্ভব ছিল না। এমন অনেক ছাত্র ছিল যারা গোপনে দেশের বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

তাদের প্রকৃত পরিচয় জানতাম না। বিপ্লবীদলের নীতি অনুযায়ী অনুসন্ধিৎসাও নিষিদ্ধ ছিল। তবু আভাসে কিছু কিছু পরিচয় পেয়ে যেতাম। তবে নিজ দলের জন্য নূতন বন্ধুদের

মধ্যে কয়েকজন পেয়ে গেলাম। তারা দেশকে ভালবাসে, নিজের চেয়েও, আর স্বাধীনতার জন্য বিপদের সম্মুখীন হতে যথেষ্ট সাহস রাখে। তাদের এক এক করে বিপিনদার কাছে নিয়ে আসতাম। বিপিনদা ছিলেন যেন স্বাধীনতার জ্বলন্ত শিখা, যাদের অন্তরে প্রদীপ ছিল কিন্তু জ্বলেনি, তারা এসে বিপিনদার কাছে আপন প্রদীপ জ্বালিয়ে নিত। একে একে এল, বঙ্কিম রায়, জ্ঞান সান্যাল, সুধাংশু, পশুপতি এমন কত জনা। আত্মোন্নতি, যুগান্তর, অনুশীলন, প্রধানতঃ এই তিনটি বিপ্লবীদলের ছেলেতে হিন্দু হোষ্টেল ও প্রেসিডেন্সি-কলেজ হয়ে গিয়েছিল একটি মৌচাকের মত। কতদিন, কত অস্ত্রশস্ত্র লুকান থাকত, হোষ্টেল বোর্ডারদের কাছে। মিষ্টার জেমস্ ছিলেন জবরদস্ত্ প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর বিনা হুকুমে হোস্টেলে পুলিসের ঢুকবার উপায় ছিল না। খানাতল্লাসী করতে হলে, তাঁর সম্মুখে করতে হবে। স্বাধীন চেতা উদারমন ইংরেজ, জীবনে যাদের দেখেছি, জেমস্ সাহেব ছিলেন তাঁদের একজন। তাঁর কথা সশ্রদ্ধ ভাবে স্মরণ না করে পারি না, তা ইংরেজের সঙ্গে যত বৈরীভাব হোক। পরে কলেজ জিমনাসিয়মে তাঁর সঙ্গে কত ব্যায়াম করেছি। হাতে গ্লাভস্ এটে তাঁর সঙ্গে বক্সিং করতে ঘুষাঘুসি লড়েছি। এমনি বন্ধুর মত ছিল তাঁর ছাত্রপ্রীতি।

প্রফেসরদের মধ্যে প্রফুল্ল ঘোষ ও সুরেন্দ্র মৈত্রকে বড় ভাল লাগত। কলেজে শুধু পড়ান নয়, ছাত্রদের সঙ্গে ছিল

আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা। তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন পড়াতে। কলেজে স্বদেশী ছেলে বলে একটু খ্যাতি ছিল ও অসাধারণ কিছু ঘটলে অনেক সময় আমার উপর সন্দেহ আসত। বৈকালে বৈঠকখানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছি, ডাকাডাকিতে চোখ খুলে দেখি, আচার্য্য রায়, সঙ্গে একজন মাড়োয়ারী, শুনলাম, সহপাঠী, আমাদের স্বদেশী দলের রাম কুমার খেনকার বাবা। বিয়ে বাড়ী, লাড্ডু প্রস্তুত, সানাই বাজছে, ওদিকে বর রামকুমারের পাত্তা নাই। ভদ্রলোকের ধারণা, আমিই রামকুমারকে লুকিয়ে রেখেছি, কিছু যদি না বলি, স্বয়ং আচার্য্য দেবকে ধরে এনেছেন। সত্যই আমি কিছু জানতাম না। দুদিন পরে টেলিগ্রাম এল জাপান থেকে, রামকুমার আমেরিকা যাত্রী।

পরীক্ষার যেটুকু সাফল্য লাভ হয়েছিল. তার জন্য মাষ্টার মহাশয়দের কাছে কম ঋণী ছিলাম না। ছাত্র হিসাবে মন্দ ছিলাম না ও অশান্ত প্রকৃতির ছিলাম বলে তাঁরা অনেকে আমায় একটু অধিক স্নেহ করতেন। অতীতের সেই স্নেহস্মৃতি আজ জীবনের শেষ প্রান্তের দিকে যেন কৃপণের অতি প্রিয় সঞ্চয়ের মত লাগে।

বিপ্লবী দলের বিশেষ একটা কাজ, গোপনে অস্ত্র সঞ্চয়। চীনা, ইতালীয় ও অন্যান্য নাবিকদের কাছে মধ্যে মধ্যে অস্ত্র পাওয়া যেত। টাকা একটু বেশী লাগত। সেই সব পিস্তল, রিভলভার, কার্টুজ বিপ্লবীদের মধ্যে বিতরণ করা হ'ত। এ

বিষয়ে সকল দলেই পরস্পরের সহযোগিতা ছিল। সকলে বুঝত, আসলে উদ্দেশ্য এক ও সেটা হল, ইংরেজ রাজত্ব অচল করে দেশের স্বাধীনতা আনয়ন করা। অস্ত্রাগার বলে বিশেষ কিছু থাকত না, নানা স্থানে ছড়ান থাকত। যদি কোনও সন্দেহের কারণ পাওয়া যেত যে অমুক স্থানে তল্লাসী হবার সম্ভাবনা, তখনই সেখান থেকে মাল সরিয়ে ফেলা হ'ত। এ কাজে কে কার হাতে দিত, সে জানা যেত না। সন্ধ্যায় অন্ধকারে এ সব কাজ সাধা হ'ত। অনুকূলদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা এই ভাবে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ধারে আমার হাতে পিস্তল ও কার্টুজ দিলেন। তখন তাঁর মুখের নীচটা চাদরে ঢাকা। পরে জেনেছিলাম, এঁর নাম অনুকূলদা, দুর্জয় সাহসী মানুষ।

রসায়ণের ছাত্র বলে বিপিনদা আমাকে বিশেষ কাজ দিলেন বোমা তৈরীর। এর জন্য আমাকে চন্দননগরে শিক্ষা করতে যেতে হয়েছিল। বৈকালে চন্দননগরে স্টেসনে নামলাম, এক অপরিচিত যুবক আমাকে নিয়ে গেলেন একটি পুরাতন বৃহৎ বাড়ীতে। বারান্দা পেরিয়ে যে ঘরটীতে প্রবেশ করলাম, সেখানে বয়ঃজ্যষ্ঠ একজন বসেছিলেন, আমাকে সস্নেহে বসালেন। তাঁর কাছে বোমা প্রস্তুতির সমস্ত পদ্ধতি শিক্ষা করলাম। তাঁর নাম জানি না! তবু আজ আমার সেই অজ্ঞাত বিপ্লবী গুরুকে নমস্কার জানাই। পরে কলকাতার নিজ ঘরে বসে যে বোমা প্রস্তুত করেছিলাম, সেটা নরেন ধাপায় নিয়ে ক্যাপ লাগিয়ে দূরে

নিক্ষেপ করতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে যায়। পরে যে সব বোমা প্রস্তুত করতাম সেগুলি দলের লোকে নিয়ে যেত। ক্যাপগুলি পৃথক রাখা হ'ত, নচেৎ বিস্ফোরণের সম্ভাবনা।

দেশী সৈন্যদের সঙ্গে মেলা মেশা করতে চেষ্টা করতাম। কখনও কখনও ময়দানে সে সুযোগ মিলত। ভাবতাম, যদি যুদ্ধ সুরু হয়, দেশী সৈন্যেরা ইংরেজ পক্ষ ত্যাগ করে আমাদের দলে আসবে কি না! সময় সময় এ কাজে যে বিপদে পড়তাম তা কম ভীষণ নয়। এক সন্ধ্যায় ময়দানে র‍্যামপার্টের ধারে এক রাজপুত সৈন্যের সহিত আলাপ করছিলাম। ভাবতাম, রাজপুত মাত্রেই হয়ত দেশকে ভালবাসে। তারা সবাই বুঝি রাণা প্রতাপ বা রাজসিংহের বংশধর। কিন্তু কিছু কথা কইবার পর দেখলাম, গোরা সৈন্যদের অনুপাতে তারা যে তন্‌খা পায় অত্যন্ত কম, সেইটাই হ'ল তাদের এক মাত্র অসন্তোষের কারণ। এ অসন্তোষ নিছক অর্থ নৈতিক। টাকা কিছু বেশী পেলে গোলামী করতে নারাজ নয়। রাত্রির আঁধারে ঘাসের উপর দুজনে বসে কথা কইছি, এমন সময় সে আমাকে তার অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে কেল্লার মধ্যে নিয়ে যেতে চাইলে। আমি, আজ নয় আর এক দিন যাব, বলে আসতে চাইলাম, হঠাৎ সে আমায় মাটিতে চিৎকরে ফেলে চেপে ধরলে। সে ছিল আমা অপেক্ষা অনেক বড় ও বলবান। কি শক্তিতে জানিনা, নিচ থেকে তার বুকে সজোরে লাথি মেরে তাকে ফেলে দিয়ে দিলাম দৌড়।

আমার গতি তখন ভীষণ দ্রুত। সে চীৎকার করতে করতে আমায় ধরতে পিছু ধাওয়া করল, শেষে পিছিয়ে গেল। তখন সোজা রবার্ট ষ্ট্যাচুর তলে ছুটে এলাম। আচার্য্য রায় সদলে সেথায় বসে ছিলেন, আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, আজ কত মাইল ছুটলি? কথা বলবার তখন আমার অবস্থা ছিল না, হাঁপাচ্ছিলাম, সারা দেহ কাঁপছিল, চুপ করে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম।

আর একবার ফিরিঙ্গীদের কাছে ভীষণ মার খেয়েছিলাম। পল্লীর কয়েকজন মিলে ক্রীক লেন দিয়ে ময়দানের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে এক ফিরিঙ্গী ধাক্কা দিল এক সঙ্গীকে। পাল্টা ধাক্কা দিতে কলহ বেঁধে গেল, বেশী ভাগ আমার সঙ্গে। পাড়াটা ছিল তাদের, বার জন লম্বা লাঠি নিয়ে এসে আমাদের মারতে সুরু করলে। একজন, আমার চেয়ে বয়সে বড়, আমায় চেপে ধরেছিল, তার বুকের তলে ছিল আমার মাথাটা, তাই লাঠি গুলা পিঠে পড়ছিল। আমাদের দলের মধ্যের সকলেই তখন আমায় একা ফেলে পালিয়েছে, এক বড়দা ছাড়া। পিঠে পড়ছে লাঠিবৃষ্টি, আর কিছুক্ষণ এরূপ ভাবে একা বারজনের মার খেলে মারা যাব ভেবে মরিয়া হয়ে তাকে কুস্তির প্যঁচ মারলাম। সে চীৎকার করে পড়ে গেল। আমি তাদের মধ্য দিয়ে দিলাম ছুট। সঙ্গে বড়দা ও ছুটল, আমাকে বাঁচাতে ছেড়ে যেতে পারেনি। তার মাথা ফেটে রক্তের ধারায় মুখ জামা ভেসে সব লাল হয়ে গেছে। পদ্মপুকুর থানা

ছিল নিকটেই, সেখানে ভ্যালেনটাইন নামে অফিসার দাঁড়িয়েছিল আমায় ও বড়দাকে ওই অবস্থায় দেখে তখনই সমুখে ক্যাম্বেবেল হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলে। প্রায় সাত দিন ঔষধে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে রেখেছিল, ব্যথায় পাশ ফেরবার ক্ষমতা ছিল না। অঙ্গের দাগগুলার মিলিয়ে যেতে বহুবৎসর লেগেছিল। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে প্রায়ই সংঘর্ষ হ'ত ও বক্সিংএ শেখা বাঁ-হাতের ঘুষি চালানোর সদ্ব্যবহার করতাম। পরে তারা আমাদের এড়িয়ে চলত।

বাড়ীতে বাবা আমায় নিয়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়তেন। আমি যে অন্যায় পথে চলছি, সে কথা তিনি কখনও মনে করেন নি, একটু গর্ব অনুভব না করতেন, তাও ন,য় তবু পুত্র স্নেহের জন্য মাঝে মাঝে চিন্তিত না হয়ে পারতেন না, ফাঁসিতে, পুলিসের গুলিতে মরব বা কারাগারে জীবন কাটবে, এই সব ভেবে। বাড়ীতে দেশের কথা, বর্তমান রণনীতি, মুক্তি কোন পথে, যুগান্তর ও সন্ধ্যার পুরাতন সংখ্যা ইত্যাদি দেশীয় পত্র পুস্তকাদি ক্রোপাটকিনের রুষ বিপ্লবের কাহিনী, ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, আইরিস্ বিপ্লব আদি বিদেশী পুস্তক, যেখানে যত স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব বা বিদ্রোহ হয়েছে এ সকল সংগ্রহ করে একটী গুপ্ত লাইব্রেরীর মত সৃষ্টি করা হয়েছিল। বন্ধুদের মধ্যে সে গুলি পড়ানর জন্য আদান প্রদান চলত। এ সময় বাড়ীতে পুলিসের তল্লাসী হবে সংবাদ পেয়ে সমস্ত পুস্তক ও পত্রাদি বাবা পুড়িয়ে নষ্ট করে দেন। সন্ধ্যায় বাড়ী এসে যখন

এই কাণ্ড দেখি, সে আমার কি কান্না! যেন বুকের হাড়গুলা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ডিকসন লেনে আমাদের বাড়ীর নিকট এক লাহা মশায় থাকতেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, এক জেলেনীকে গৃহিনী করে নিয়ে নিজ বাড়ীতে বাস করতেন। তাঁর, অর্থ ছিল, মন ছিল উদার। নিজেদের সন্তান না থাকায় আমাকে সন্তানের মত স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে পিঠে, পায়স ইত্যাদি খাওয়াতেন। আমার কাছে অনেকগুলি টোটা ছিল, গোপন রাখবার জন্য সে গুলি কাচের ষ্টপার বোতলে পুরে মোম দিয়ে শিল করে সেই বাড়ীর উঠানে মাটীতে পুতে রেখেছিলাম। কয়েকদিন পরে সে গুলি বাহির করে আনি। এই দুটী মানুষের কথা অপ্রাসঙ্গিত হলেও বলি। কিছু কাল পরে লাহা মশায় মারা যেতে তাঁর ধনী আত্মীয় স্বজন, যাঁরা কখনও তাঁকে দেখত না, তারা এসে বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি সবই দখল করে সেই প্রৌঢ়া জেলেনীকে পথে তাড়িয়ে দিলে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন, বহু কাল, যৌবন বয়স থেকে সেবা করেছিলেন, মায়া কাটাতে হয়ত কষ্ট হয়েছিল। এরই কয়েকদিন পরে কলেজে চলেছি, দেখি মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়ে একটি মাছের ঝুড়ী হাতে চলেছেন তিনি। কথা না কয়ে থাকতে পারলাম না। কত স্নেহ যত্ন পেয়েছি, কত দিন কত কি খেয়েছি! বললাম, কেমন আছেন? চোখ মুছে বললেন, আবার মাছ বেচছি বাবা, পেট চলবে কি করে!

আমি ছেলে মানুষ, সামাজিক ন্যায় অন্যায়ের কথা আমি ভাবব কি করে! কলেজে পৌঁছিবার পথে আমার মনটা বিষাদের ছায়ায় ম্লান হয়ে রইল।

কাশীপুরের অস্ত্র প্রস্তুতির কারখানার পরিত্যক্ত একটা প্রেস মেসিন এনে রাখা হয়েছিল, মতবল ছিল কার্ত্তুজের ক্যাপ প্রস্তুত করা যাবে। স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন লেগে যাবে, তখন অস্ত্র যোগানের ব্যবস্থায় শৈথিল্য থাকলে ত চলবে না! আজ মনে ভাবি, এর মধ্যে ছিল কতটা তরুণ মনের স্বপ্ন, কিন্তু কি গভীর ছিল দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশ্বাস! কোন্‌টা বড় সত্য, কল্পনা না বাস্তব জানিনা!

আমাদের ডিকসন্ লেনের বাড়ীতে ছিল বিপ্লবীদের একটা ক্ষুদ্র কেন্দ্র। মা গত হয়েছিলেন প্রায় চার বৎসর পূর্বে। বাড়ীটি ছিল অনেকটা মেসের মত। বিপ্লব কর্মের আলোচনা পরামর্শকালে খাওয়া চলত মুড়ি, বেগুনি। তখন চা বিস্কুটের প্রচলন ছিল না। বড়দা ও মেজদা হিংস্র কাজে লিপ্ত হতে পারতেন না, তথাপি দেশ প্রেমের প্রচার, স্বাধীনতার বাণী, নূতন নূতন যুবক সংগ্রহের চেষ্টায়, অবিরত নিযুক্ত থাকতেন। বড়দা তখন বঙ্গবাসী কলেজে প্রফেসার ছিলেন বলে এ কাজে তাঁর অনেক সুবিধা ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার দুই ক্লাশ সিনিয়ার ছিলেন, যাদু গোপাল দা, অতুল দা। মামা অর্থাৎ শৈলেন ঘোষ, সতীশ চক্রবর্ত্তী, তাঁরা থাকতেন হিন্দু হোষ্টেলে। এঁরা ছিলেন দুর্দান্ত বিপ্লবী, কিন্তু তাঁরা যুগান্তর

দলের ও আমি আত্মোন্নতির বলে, সংশ্রব কিছু থাকলেও, বিপ্লবের কর্মে সোজা যোগাযোগ হ'ত না। বিভিন্ন দলের পরিচয় বা পরামর্শ হ'ত উচ্চস্তরে দাদাদের মধ্যে, আমি সে পর্যায়ে ছিলাম না। অপ্রয়োজনীয় ঔৎসুক্য ছিল অপরাধ। মুখ বুজে, যথা সম্ভব কম কথা কয়ে, গুপ্তসমিতির কাজ করে যাওয়া ছিল নিয়ম। আত্মজাহির করতে বাজে কথায় বিপ্লবী দলের ক্ষতি সাধন করেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বেশী কথা না কহা ও নীরবে কাজ করার অভ্যাস পুরাতন বিপ্লবীদের অনেকের জীবনে আজও মুছে যায়নি তাই এখনকার পার্লামেণ্টারী জীবনে নিজেদের অনেকে যেন কতকটা স্থানভ্রষ্ট মনে করেন।

বিপ্লবের কাজে অনেক সময় দিতে হ'ত, তবু বিজ্ঞানে ইণ্টারমিডিয়েট পরিক্ষায় দেখি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়েছি। এতে সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হলাম নিজে, যেমন হয়েছিলাম ম্যাট্রিক পরীক্ষায়। অতটা ভাল ছেলে ছিলাম না। তবে আমার স্বভাবে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যখন যা করতাম, মন প্রাণ কেন্দ্রীত হয়ে যেত। তখন অন্য দিকে চেতনা হত লুপ্ত প্রায়। এমন হয়েছে, অঙ্ক কষছি, বাবা ডাকছেন খেতে যেতে, আবার আমায় ডাকছেন, কিন্তু আমার সাড়া নাই, শেষে গায়ে ঠেলা দিতে বললাম, ডাকছিলে ?

স্বাস্থ্য ছিল ভাল। বৈকালে হিন্দু হোষ্টেলে হকি খেলে, বনমালীর খাবার খেয়ে বাড়ী ফিরেছি। রাতে পড়তে পড়তে চক্ষু বুজে আসছে ভাবলাম বাহিরে রোয়াকে গিয়ে একটু

আলস্য ভেঙ্গে আসি, দেখি ভোর হয়ে গেছে, রাস্তার ধারে জানালার পটিতে হেলান দিয়ে আধবসা ভাবে ঘুমের মধ্যে সারা রাত কেটে গেছে। কিছুই জানতে পারিনি।

যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বড় হচ্ছিলাম, তার কিছুটা আভাস দিতে চেষ্টা করেছি। বিপ্লবীদের মধ্যে অসাধারণ একজন ছিলাম না, ছিলাম মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ একজন বাঙ্গালী কর্মী। ব্যক্তিগত অনেক কথা এসে পড়েছে, ভয় হয়, আত্মজাহির দোষে এ লিপি বিরক্তিকর হবে কি না! অহিংস ছিলাম মজ্জায় মজ্জায়, একটা মশা বা ছারপোকা মারতে পারতাম না, পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলাম শিশুকাল থেকে। এসে পড়লাম হিংস্র বিপ্লব পথে যেখানে জীবনের মন্ত্র ছিল।

"ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে
দৃপ্ত আমরা ভক্ত বীর!"

এসে ছিলাম কিসের আকর্ষণে! সে মায়ের মুক্তির জন্য যে মা দেশের শুধু মানুষ নয়, দেশের হাওয়া, জল, মরু, নদী, পাহাড় প্রান্তরের কেন্ সে দেশের সত্বা, অনাদি কাল থেকে এই ভারতে যে জীবন যাত্রা চলেছে, তার অনন্ত কালের পানে। তার মাঝে ক্ষণিকের যাত্রী আমি, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব কি এই দেশকে, এই জাতিকে? ভাবতাম পথের অন্তরায়, যে পরাধীনতা, তা থেকে মুক্ত হবে কি এই দেশ!

দামোদরের বন্যা

"শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহ ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে॥"

১৯১৩ সালে পূজার পূর্বে বন্যায় বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর জেলার অংশ জলপ্লাবনে ভেসে গেল। বহু দরিদ্র নরনারী আশ্রয় হারা হ'ল। আর্তের রক্ষার জন্য বাংলায় বহু স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে উঠল, তার মধ্যে লক্ষ্মী ছাড়া স্বদেশীরাই হল অগ্রণী। অনুকূলদার নেতৃত্বে আত্মোন্নতির কর্মীরা গেল কাঁথীর দিকে, মেজদা গেল সেই দলে। প্রেসিডেন্সী কলেজে উপীনদার (১) নেতৃত্বে যে দল হ'ল, আমি গেলাম সেই সঙ্গে তারকেশ্বরের দিকে। উপীনদার যেমন ছিল দেহের শক্তি, তেমন ছিল মনের উদারতা। সকল কাজে অগ্রণী। সঙ্গে নিয়ে গেলাম নৌকা, লাইফবয়, চাল ডাল আদি খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ও জমান দুগ্ধ। ট্রেণ গেল হরিপাল অবধি। তার পরে রেল লাইন সব জলে ডুবে গেছল। চাল ডালে সিদ্ধ খেয়ে লাইনের উপর শুয়ে রাত কাটিয়ে ভোরে রওনা হলাম, কাঁধে নৌকা বহে। তাইতেই কি আমাদের কম উৎসাহ! শারীরিক কষ্টের দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ক্রমে আরও পথ এগিয়ে এসে নৌকা ভাসালাম। চারিদিকে জল, জল, শুধু জল, তারই মাঝে

(১) ৺উপীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পরে ইনি ওকালতী করেন ও ভাগলপুর থেকে বিহারে এসেম্ব্লির সভ্য হন।

ক্ষুদ্র দ্বীপের মত চাষীদের ঘরের চালা জেগে আছে ও গাছ গুলির উপরাংশ দেখা যাচ্ছে। কোথাও বা মরা গরু বাছুর ভেসে যাচ্ছে। আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বৃষ্টি। সেই দ্বীপের মত স্থানগুলিতে নৌকা বেয়ে, আর্তদের খাদ্য বস্ত্রাদি দিতে লাগলাম। লবণ হয়েছিল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। সব জলে গলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা জানে 'স্বদেশীরা' তাদের সেবা করতে এসেছে। দেশের গরীব দুঃখী নরনারী স্বাধীনতা বা স্বদেশীর কথা কতটা বুঝত জানি না। কিন্তু সেবার মধ্যদিয়ে বহু আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। পল্লীবাসী চাষীদের এই বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা ভবিষ্যতে বিপ্লবী দলের কম মূলধন হয় নি।

তিন দিন সেবাকাজ করবার পর দেহে ভীষণ কাঁপন দিয়ে জ্বর এল। উপীনদা বললেন, বাড়ী ফিরে যেতে। জ্বর যদি বাড়ে, বিপদে পড়তে হবে।

একা ফিরলাম। হাঁটুভর জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রায় ষোল মাইল পথ হেঁটে এলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে, মেঘের কিনারায় সোনালী রূপালী রঙের সৌন্দর্য্য, শ্রান্তির মধ্যেও যে দৃশ্য চেয়ে দেখতে লাগলাম। একটা পুকুর ধারে বসে, হাত মুখ ধুলাম। ছানাওলা যাচ্ছিল কিছু ছানা কিনে খেয়ে যখন ট্রেণে কামরায় গিয়ে উঠেছি, তখন আমি প্রায় জ্ঞানহারা।

হাওড়া থেকে হেঁটে পুল পেরিয়ে, ট্রামে শিয়ালদা পৌঁছে ডিকসন লেন দিয়ে টলতে টলতে বাড়ী এলাম। পরণে আমার

ময়লা ছেঁড়া কাপড়, জামার অবস্থাও তাই : চুল রুক্ষ, চক্ষু দুটি লাল, জ্বালা করছে। বাবা ও ছোট বোন দোতালায় তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

দুপুরে আধ অজ্ঞান অবস্থায় ঘুমাচ্ছি, ঘুম ভেঙ্গে চাইলাম, দেখি মাথায় আইস ব্যাগ ধরে তাল পাখার হাওয়া করছে পল্লীর একটি মেয়ে, ছোট বোনের বন্ধু। উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলে, এখন কেমন আছো সেজদা! জ্বরের ঘোরে কি করুণ মিষ্টি লাগল তার কথা কি সুন্দব দেখলাম তার চোখ দুটী! জেগেছি দেখে ছোট বোন ছুটে এল, দুধ খাইয়ে দিলে। আজ সে বোনও বেঁচে নাই, তার বন্ধু ও কোথায় দূরদেশে চলে গেছে, রেখে গেছে তাদের স্মৃতির মাধুর্য্যটুকু। পুরুষ আমরা দেশের কাজ করতে পারি, লড়তে পারি, কিন্তু মেয়েরা স্নেহ, মায়া, সেবা দিয়ে দেশকে কল্যাণমণ্ডিত সুন্দর করে। মেয়েদের সেবায় কাজে দেশ যদি বঞ্চিত থাকে তবে সেটা দুর্ভাগ্য নয় কি? ডাক্তার এসে ঔষধ খাইয়ে ঘুমুতে বললে। সাতদিন পরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। যেদিন কলেজে প্রফেসার ডি এন মল্লিকের থার্ড ইয়ার ক্লাসে রোল কলের উত্তরে গলার স্বর বাহির হল না। তখনও গলা ধরা অবস্থায় ছিল। তাই পুনরায় ডেকে আমায় দেখতে পেয়ে রোল কল বন্ধ রেখে বলতে লাগলেন "সতীশ বন্যায় সেবা করে অসুস্থ হয়ে ফিরেছে। শিক্ষা কি শুধু কলেজে হয়! দেশের সেবার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা হয়, তার মূল্য অনেক

বেশী। এতে শুধু দেশের উপকার নয়, নিজেকে ও জাতিকে গঠন করে তোলা হয়।" প্রফেসারের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে মনে হ'ল, মাষ্টারমশায় স্নেহ বশতঃ প্রাপ্যের অধিক প্রশংসা করছেন। ১৯২০ সালের পরে পুরাতন প্রফেসারদের সঙ্গে দেখা হলে অনুভব করতাম, আমার জন্য স্নেহভাণ্ডার তাঁদের অন্তরে যেন অক্ষয় হয়ে আছে। সে কি দুষ্টু ছেলে ছিলাম বলে!

কয়েক দিন পরে আমায় আবার যেতে হ'ল তারকেশ্বরে। সঙ্গে গেলেন অধুনা ডাক্তার জ্ঞান ঘোষ, ডাক্তার মেঘনাদ সাহা ইত্যাদি। তাঁরা সকলেই আমার উপর ক্লাসের ছাত্র ছিলেন ও আমি ছিলাম তাঁদের স্নেহভাজন। তবুও কতকটা আমার নেতৃত্ব মেনে নিতেন। তারকেশ্বরের মোহন্তর কাছে সেবা কর্মের জন্য হাতী আদায় করলাম।

ছেলে মানুষী দুষ্টুবুদ্ধিতেও কম ছিলাম না। একটা মজার ঘটনার কথা বলি। থার্ড ইয়ার ক্লাস, অঙ্কের প্রফেসার হেম সেন কখনও হাসতেন না। সকল সময়ই এলফা বিটা গামা ওমেগার বিকৃত উচ্চারণ করতেন, তাই তাঁর নাম করণ হ'ল ওমগা। কথা হ'ল, কে তাঁকে হাসাতে পারে! আমি বললাম, ভাই, আমি পারি, কিন্তু নাম বলে দিস না যেন! ভাগ্যক্রমে সেদিন ক্লাস ঘরের সম্মুখের বারান্দায় একখানা ঘুড়ি কেটে এসে পড়ল। করলাম কি, পাখার ব্লেডের প্রান্তে কলের সুতাটা লাগিয়েদিলাম। প্রফেসার সেন মহাশয় ক্লাসে

ঢুকবার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত্তে সুইচ মেরে দিলাম, ফর্‌র্‌র্‌র্ করে সে কি বিকট আওয়াজ! আর সমস্ত ক্লাস থেকে ছাত্ররা সেই আওয়াজ শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এসে হো হো করে হাসতে লাগল। প্রফেসার সেন হেসে ফেললেন। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই যথা সম্ভব মুখখানা গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করলেন, হু ইজ দি কলপ্রিট্? ক্লাসের সবচেয়ে নিরীহ ছেলে বিজয় বললে, জানি না স্যার। তিনি সকল ছাত্রদের অনুপস্থিতি মার্ক করতে কলম ধরলেন। তখন আমি বললাম, স্যার, অপরাধ আমার। শুধু আমাকে অনুপস্থিত করুন। তখন বোর্ডে একটা অত্যন্ত দুরূহ অঙ্ক কসতে দিলেন, সেই হল আমার শাস্তি।

বড়া কোম্পানী ও মশার পিস্তল

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণ সজ্জা
আঘাত আসুক নব নব আঘাত খেয়ে অচল রব
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয় ডঙ্ক
দেব সকল শক্তি লব অভয় তোমার শঙ্খ।"

—রবীন্দ্রনাথ

কলিকাতা বহুবাজারের পশ্চিমে মলঙ্গা পল্লীতে আত্মোন্নতি সমিতির যে শাখা ছিল, তার বিশিষ্ট নেতা ছিলেন দুর্ধর্ষ শ্রীঅনুকূল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুকূল দা ছিলেন বিবাহিত সুস্থ বলিষ্ঠ, কাইজারের মত গোঁফ চোখ দুটা বাঘের মত। তাঁর মুখ খানায় প্রকাশ পেত বেপরোয়া বীরত্ব ভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তাঁর কিছু ছিল না। পল্লীর মুটে মজুর উড়ে কুলি আর যত দুষ্ট ছেলে ছিল তাঁর অনুগত ভক্ত। গিরিনদা ছিলেন অনেকটা এর অন্য দিক অর্থাৎ ব্রহ্মচারী শীর্ণ দেহ, মুণ্ডিত শ্মশ্রু, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, যেন এ যুগের চাণক্য। দুষ্টু ছেলেদের ভিতর তরুণ যুবা শ্রীশ মিত্র ওরফে হাবু সিদ্ধির নেসা ত্যাগ করে এঁদের ভক্ত হল ও ঠিক করল দেশের কাজে আত্মদান করবে। রিভলভার পিস্তল টোটা আদি সংগ্রহ না হ'লে বিপ্লবের শক্তি বৃদ্ধি অসম্ভব, সে জন্য বিপিনদা, অনুকূলদা ও গিরিনদা পরামর্শ করে শ্রীশকে মাত্র কুড়ী টাকা মহিনায় রডা কোম্পানীর জেঠি সরকারের কাজে লাগিয়ে দিলে। চল্লিশ টাকার চাকুরী ছেড়ে এই কাজ নেওয়ায় আই বি পুলিশ রডা কোম্পানীকে সন্দেহে সতর্ক করে দিল। শ্রীশের উত্তর ছিল, এত বড় অস্ত্র আমদানীর কোম্পানীতে সে চাকুরী নিয়াছে, ভবিষ্যতের উন্নতির আশায়। সে থাকত মলঙ্গা পল্লীতে তার মামার আশ্রয়ে, চেহারা ছিল ছোট খাটো সাধারণ বাঙ্গালীর। কাজে খুব মন দিত বলে সাহেবের নেক নজরে পড়েছিল। সুযোগ পেয়ে একদিন কিছু টোটা সরালে। বিপিনদা বললেন, শুধু টোটায় কি হবে, এর যদি পিস্তল না থাকে! কয়েক মাস পরে সুযোগ এল। কাশ্মীর সরকারের জন্য চারিশত মশার পিস্তল ও চার লক্ষ

রাউণ্ড অর্থাৎ চল্লিশ লক্ষ টোটার চালান এল। আত্মোন্নতির সভ্য গণের মধ্যে বিপিনদা, গিরিনদা, অনুকূলদা, কালিদাস বোস, নরেন বাঁড়ুজ্যে ইত্যাদির শ্রীশকে নিয়ে গুপ্ত পরামর্শ হ'ল, এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে, ও ওই মাল থেকে একগাড়ী সরান হবে। সকালে শ্রীশ জেঠি থেকে মাল আনতে গেল, ডালহৌসি স্কোয়ারের চারি দিকে পাহারা দিতে ও প্রয়োজন মত সাহায্য করতে পায়চারী করতে লাগল আশু লাহিড়ী, হরিদাস দত্ত, শ্রীশ পাল, কালী দত্ত হরিশ শিকদার ইত্যাদি কয়েকজন নেতা ও কর্ম্মী। সঙ্গে একটা পুরাতন মোটর-গাড়ী ছিল, দিয়েছিল আমার বড়দা ও রণেণ গাঙ্গুলী ইষ্টার্ণ মোটর ও কোচ ওয়ার্কস থেকে। সুবিধা হলে মাল মোটরে তুলে নিয়ে দ্রুত সরে যেতে হবে। মোটর গাড়ী তখনকার দিনে আজকার মত এমন সুস্প্রাপ্য ছিল না। দুপুরের পরে তারা দেখল, কাজ হাসিল, অর্থাৎ শ্রীশ এক গরুর গাড়ী মালের পিছনে পিছনে চলেছে জেঠি থেকে ডালহৌসি স্কোয়ারের দক্ষিণে রডা কোম্পানীর গুদাম ছাড়িয়ে সোজা কপালী টোলার দিকে।

শ্রীশ গাড়োয়ানকে যথেষ্ট মদ খাইয়ে রেখেছিল। তারা সেই সব মাল, কান্তি মুখুজ্যের লোহার মাঠে নামিয়ে দিয়ে মদের নেশায় ও স্ফুর্তিতে চলে গেল। প্রকাশ্য দিবালোকে তখন মালের ভারী বাক্সগুলো কিছুক্ষণ পড়ে রহিল। ঘোড়ার গাড়ী করে তখন সেগুলি উঠিয়ে পাঠান হল বহুবাজার হিদারাম বাঁড়ুজ্যের গলিতে জেলেপাড়া লেনের মোড়ে।

সারাদিন কলেজে ল্যাবরেটারীতে কাজ করার পর বৈকাল সাড়ে চারটায় বাড়ী ফিরে জামা জুতা সবে ছেড়েছি, এমন সময় শুনলাম, বিপিনদা ডাকছেন। বটতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। বিপিনদার কি যে সে ডাক! সেই অবস্থায়ই খালি গায়ে খালি পায়ে বিনা জামায় ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। বিপিনদার আহ্বান অমান্য করবার কথা কখনও মনেই আসত না বা দেরী করতে পারতাম না। তাঁর নির্দেশ মত বসন্ত ও জগতকে ডেকে নিয়ে তখনই হিদারাম ব্যানার্জী লেনে জেলেপাড়া গলির মোড়ে গেলাম ও সাধারণ কুলির মত সেই সব মালভরা ভারী বাক্স-গুলো ভুজঙ্গ ধরের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সিঁড়ির নীচে একটা ছোট ঘরে বাক্সগুলা সব খোলা হ'ল, বেরুল ঝকঝকে মশার পিস্তল পঞ্চাশটা ও টোটা পাঁচ লক্ষ অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড। পিস্তলগুলি অটোম্যাটিক, মুহূর্তে দশটার এক সার কার্টিজ লোড করা যায়। ফায়ারিং এর পরেই খোলগুলি ছিটকে পড়ে ও নূতন কার্টিজ স্বস্থানে এসে যায়। রেঞ্জ প্রায় দেড় মাইলের উপর চলে, তখন কাঠের মজবুত খোলটা পিছনে লাগিয়ে রাইফেল বন্দুকের মত ব্যবহার করা যায়। মশার পিস্তলের শক্তি যেমন প্রচণ্ড, তেমনি পর পর দ্রুত গুলি চালান যায়, প্রায় মেসিনগানের মত। পরাধীন দেশের নিরস্ত্র অধিবাসী তাই ওই অস্ত্রগুলি আমাদের চোখে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল বহুদিনের ক্ষুধিতের নিকট খাদ্য সম্ভারের মত। বসন্ত ঠাট্টা করে বলছিল এগুলা খোকা।

মরণাস্ত্রে মানুষ মরে, তবু দেশের স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ হবে, তাইতে লাগবে বলে, দেশের শত্রু মরবে বলে মন্দ লাগছিল না। গোপনে সংগ্রহ করা রিভলবার, পিস্তল, নিজেদের প্রস্তুত বোমা, এ সব ছাড়া আমাদের নিরস্ত্র করে বুকের উপর যে প্রচণ্ড বিদেশী রাজশক্তি চেপে আছে, তাকে সরাবার উপায় কি! যারা আমার দেশের কোটি কোটি অধিবাসীদের ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় অপরাধ কোথায়! যারা মেসিনগান চালিয়ে আমাদের শত শত লোকের হত্যা করতে পারে, আমরা পিস্তল বোমা দিয়ে তাদের দু চারটাকেও মারব না কেন? তাই শক্তি সংগ্রহ হিসাবে সামান্য হলেও (বিপ্লব ইতিহাসে) এই মশার পিস্তল সংগ্রহ ঘটনার একটা বিশেষ স্থান আছে আর এই কাজে সামান্য সৈনিকের মতনও কাজ করেছিলাম বলে জীবনে একটা তৃপ্তি অনুভব করি।

ভূজঙ্গদার মা ও বাবা সব দেখলেন। তাঁদের সাময়িক আশ্রয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বিপ্লবের একটা বিশেষ কাজ সমাধা করা হ'ল। ভুজঙ্গদা নিজে ত আত্মত্যাগে প্রস্তুত ছিলই, তার বাপ মাও এই সব কাজে নীরব দ্রষ্টা ছিলেন। ভুজঙ্গদা তখন বি এস সি চতুর্থ বার্ষিক ক্লাসে পড়ছিল। বড়দা তাকে পড়াত। বাপ মায়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল, ছেলে উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রফেসার হবে। তার মায়ের মুখে বাংলা দেশের মাতৃ মূর্তি বাপের মুখে বাংলা দেশের পিতৃমূর্তি

দেখতাম। এমন কত মাতা, কত পিতা বুকভরা সন্তান স্নেহ নিয়ে কত দিনের পর দিন কাটিয়েছে, ঘরের সন্তানের ঘরে ফিরে আসার পথ চেয়ে! ছেলের কত উজ্বল ভবিষ্যতের স্বপন দেখেছে। সে আশা তারা স্বাধীনতার জন্য দেশমায়ের বেদীতে অঞ্জলি দিয়েছে। তবু অপরকে অপরাধী মনে না করে, মেনে নিয়েছে ভগবানের ইচ্ছা বলে।

পূর্বজন্ম, পরজন্ম আছে কি না জানি না। বুঝিনা পরাধীন বাঙ্গালী জাতির কোন রক্তের ধারার মধ্য দিয়ে এমন সব বাপ মায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। যে বাংলায় ভারতের প্রথম পরাধীনতা এল, স্বাধীনতার প্রথম সাড়া জেগে উঠল সেই বাঙ্গালীর প্রাণে।

কয়েকটা নূতন ট্রাঙ্ক মাল ভর্ত্তি করে রাখা হ'ল, ভোরে বিভিন্ন স্থানে পাঠান হবে। কাজ শেষ করে গভীর রাতে তিন বন্ধুতে বাড়ী ফিরলাম। একটা বেজে গেছে। বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে তখনও জেগে বসে আছেন। আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন; কলেজ থেকে এসে খেলি না, কোথায় খালি গায়ে বেরিয়ে গেলি! একটু কাজ ছিল, বলে উত্তর এড়িয়ে গেলাম। দুটা অভ্যাস জীবনে মজ্জাগত ছিল, বাবার কথা অমান্য করতে পারতাম না, আর মিথ্যে মুখ থেকে বেরুত না। তিনি গীতা সভার সভ্য ছিলেন ও প্রতিদিন গীতা পড়তেন। মনে হয়, গতিক জেনে ছেলেকে নারায়ণে সমর্পণ করে রেখেছিলেন। যা হোক, খেয়ে শুয়ে পড়লাম। পুলিশের আগমণ অবশ্যম্ভাবী,

অজানা ভবিষ্যতের পানে তাকাবার চেষ্টা করলাম। এই চিন্তার মধ্যেও কাজ সুসম্পন্ন করার আনন্দে মন ভরে রইল।

কাঠের বাক্সগুলি ও তৈলাক্ত কাগজ সব পুড়িয়ে ফেলে সাফ করা হয়ে গেছল। প্রাতে ট্রাঙ্কগুলি হিন্দু হোষ্টেলে, ল কলেজ হোষ্টেলে, বড়বাজার ও অন্যান্য দলের বিভিন্ন স্থানে পাঠান হয়ে গেল। বড় বাজারে শিবঠাকুর লেনে যে সব মাড়োয়ারী ভাইগণ এ কাজে লিপ্ত ছিল, তাদের মধ্যে মনে পড়ে প্রভূদয়াল হিম্মৎ সিংকা, ফুলচাঁদ চৌধুরী ও কারমল স্রফের নাম। অধুনা ধন কুবের শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লার নাম ও কিছু জড়িত ছিল। এঁরা এখন অনেকেই বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী, তখন কিন্তু সাধারণ কুলীর মত মালের বাক্স নামাতে ও সব অতি সাধারণ শ্রমের কাজ দেশের জন্য করতে কুণ্ঠিত হন নি। একথা ভুললে চলে না, অন্তর অনেকেরই আছে ও সকল মড়োয়ারী শুধু অর্থ সঞ্চয় করে নি, তাদেরও অনেকের মন যৌবনে দেশ মায়ের আহ্বানে সাড়া দিত। আর এক মাড়োয়ারী বন্ধু ছিল কানাইয়ালাল। বিপিনদা তখন গা ঢাকা দিয়ে থাকার কালে বড় বাজারে তার ঘরেতে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁর নির্দেশ নিতে গিয়ে দেখি বিপিনদা দাঁড়িয়ে, একটা ঠোঙ্গা থেকে খাবার তুলে খাচ্ছেন ও কানাইয়ার সঙ্গে কথা কহিছেন, মশার পিস্তলটা পেট কাপড়ে গোঁজা। আমার কি কি করতে হবে সব শুনে বিদায় নেবার সময় হল। দেখি কানাইয়া বিপিনদাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ছাড়তে

চায় না নির্মম বিপ্লবী বিপিনদার চক্ষু দুটা দেখি সজল। বিপ্লবী নেতা ও অনুচরের এ কেমন প্রেম। ভাবলাম বলি, তুই মাড়োয়ারী বাচ্চা, টাকা রোজগার করবি, না ফেরারী বিপিনদাকে যেতে দিতে চাস না ; এখনই যদি পুলিশ আসে, তোকে ছাড়বে! বহুকাল পরে. এই সেদিন, বিপিনদা সার পেনণ্টাইনলেনের নিজ ঘরে চির নিদ্রার শয়ানে, দেখি শুভ্র কেশ প্রৌঢ় মাড়োয়ারী, সেই কানাইয়া, হাউ হাউ করে কাঁদছে, বুকে জড়িয়ে ধরে তার কান্না থামাতে সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করতেই লুটিয়ে ভেঙ্গে পড়ে আর্তস্বরে বললে, সতীশ ভাই, হামারে বিপিনদা চলে গয়ে। বিপিনদার সংস্পর্শে এসে বিপদ ছাড়া কোনও সম্পদ ত সে কখনও পায় নি।

গন্তব্যস্থানের সবগুলি আমাদের জানবার কথা নয়, এ সব ঠিক করতেন দাদারা অর্থাৎ যাঁরা নেতৃস্থানীয়। পুলিশ সে সময় একটিও পিস্তল বার করতে পারে নি।

শেষে পুলিশ এল। পর দিনই নয়, পাঁচদিন পরে। এর জন্য অপ্রস্তুত ছিলাম না। ভোরের রাতে উৎকট কড়া নাড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি ঊষার রাঙা আলোকে লাল পাগড়ী ও লাল মুখো সার্জনে চারি দিক লালে লাল। বাড়ীর পিছনে ও পাশের বাড়ীর ছাদগুলিতেও পুলিশ। পাছে ছাত টপকে পালাই বা জিনিষ পাচার করি। প্রত্যেক শোবার ঘর, স্নানের জায়গা, রান্নাঘর, পায়খানা, এমন কি গঙ্গা জলের ট্যাঙ্ক লাঠি দিয়ে মাটি ঘুলিয়ে তল্লাসী করে দেখলে কোথাও

কোন জিনিষ পাওয়া যায় কি না। বাড়ীতে তখন কিছুই ছিল না। শুধু একটা পুরাতন যুগান্তর লুকান ছিল, ছোট বোন সেটা পেট কাপড়ের নিচে লুকিয়ে নিয়ে প্যানে কুচিয়ে ফেলে ফ্লাস করে দিলে। গ্রেপ্তারের পরোয়ানা দেখিয়ে আমায় তখন প্রস্তুত হতে বলল। আমি স্নান করে পরিষ্কার ধুতি, মটকার পাঞ্জাবী ও সোনার চশমা পরে প্রস্তুত হ'লাম। কাজের সময় খালি গায়ে কোমরে কাপড় জড়ান অবস্থায় ছিলাম, তাই মনে চেষ্টা ছিল, সাজ পোষাকে যতটা অন্যরূপ দেখায়। খাবার ও দুধ খেয়ে পুলিশের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। যেন বেড়াতে যাচ্ছি। ছোট বোনের চোখ ছল ছল করছিল, বাবার মুখ ধীর গম্ভীর, দাদাদের মুখে উদ্বেগ, হেসে ছোট বোনকে আদর করে বললাম, কিরে, ভাবছিস নাকি! তার মুখ ম্লান চোখে জল। পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে গাড়ীতে উঠলাম! যেন দিগ্বিজয়ে চলে এমন একখানা ভাব দেখলাম। গাড়ী যখন চলেছে, মনে উদয় হল কবির গান,

"আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু, ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।"

পল্লীর লোকেরা ভালবাসত। ভয়ার্ত অবস্থায় কেউ এদিকে চাইতে ভরসা করলে না, শুধু পাশের চাটুজ্যে বাড়ীর কানু কাকা (১) এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে গেলেন।

---

(১) শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, পরে ইনি শিক্ষা বিভাগে ছিলেন।

তিনি আমাকে পূর্বে পড়াতেন। বাল্যকালে স্কুলে পুরস্কার বিতরণ সভায় কেদার পণ্ডিত মশায়ের এক স্থূলাঙ্গী নাতনী অত্যন্ত সেজে এসেছিল দেখে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছল, "সেজেছে দেখ, যেন নাচতে এসেছে।" কানু কাকা নিকটে বসেছিলেন, তাঁর কানে কথাটা গেছল। পরে বাড়ী ফিরতে কাছে ডেকে গালে একটি চড় কসিয়ে বললেন, অসভ্য কথা বলেছিস কেন! কে সেজে এসেছে, তোর কি! তাঁর সে শাসন সশ্রদ্ধভাবে আজও স্মরণে রহেছে। বিপ্লবী দলের ছোটদের নৈতিক চরিত্রের উপর বয়ঃজেষ্ঠগণ এমনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। শিক্ষা লাভেও তাঁর নিকট আমি কম ঋণী নই। তখন অব্রাহ্মণ বাড়ীতে ব্রাহ্মণদের কেউ ভাত খেত না। এই কানু কাকা এসে মার কাছে বসে ভাত খেয়ে গেছল। তাঁর বাড়ীর লোকে যখন আপত্তি করে উঠল, তিনি বললেন, যাদের সঙ্গে দেশের কাজে নেমেছি, তাদের বাড়ীতে এসব বিচার করা মহাপাপ। এক রাতে সমুখে পুরাতন এক হানা বাড়ীতে কে ছাদে যেতে পারে কথা উঠেছিল। আমি সাহসের সঙ্গে সেই বাড়ীতে ঢুকে গেলাম। ছাদে গিয়ে দেখি পিছনে কানু কাকা। পাছে সিঁড়িতে ওঠবার কালে ভয় পেয়ে জ্ঞান হারাই। কি গভীর ছিল আমার প্রতি তাঁর স্নেহ! একটা রিভলভার হাতে দিয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, ইংরেজ মারতে পারবি? তুইত মাছ মাংস খাস না'। বললাম, "প্রথমটা হয়ত একটু মনে লাগবে, পরে কিন্তু দেখবেন অভ্যাস হয়ে যাবে। কার্য্য ক্ষেত্রে দেখতে পাবেন।"

যে দেশীয় পুলিশ অফিসার আমায় ইলিসিয়ম রোর আই বি অফিসে নিয়ে গেল, নাম তার কালী সদয়। ভাবলাম সদয় যখন, মানিকতলা বোমার মামলার কুখ্যাত পুলিশ অফিসার রামসদয়ের কেউ ভাইটাই। তার মুখে সকল কথাতেই একটা ক্রুর হাসি লেগে থাকত। সাপের হাসি শুনেছি বেদেই চেনে। বোধ করি অনুরূপই হবে। বেলা তিনটায় একটা ঠোঙায় কিছু খাবার ও জল আনিয়ে দিলেন। ভোরে বাড়ীতে যেটুকু পেটে পড়ে ছিল, সে সকল হজম হয়ে গেছে, অত্যন্ত ক্ষুধা লেগেছিল, সামান্য দুটা কচুরীতে কিছুই হল না। কতকগুলা প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে আমায় লালবাজার গারদে পাঠিয়ে দিলে।

দোতালার পশ্চিম দিকের একটা বড় ঘরে একা আমায় পুরে চাবি বন্ধ করলে। তখন আঁধার হয়ে গেছে। ঘরখানার চারি দিকের দেওয়ালে প্রায় আটফুট উঁচু অবধি আলকাতরা লাগান। ছাদের মধ্যিখানে একটা লণ্ঠনে কেরোসিন তেলের ল্যাম্প জ্বলছে, তাতে আলো যত না দিক, ধূঁয়া দিচ্ছে প্রচুর আর তাতে ঘরখানা হয়ে উঠেচে আরও বীভৎস। বাহিরে প্রহরীর ভারী বুটের পা ফেলার এক ঘেয়ে আওয়াজ। জীবনে নিঃসঙ্গ আঁধারে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের সমুখে সেই প্রথম রাত্রি। সেথায় কি আছে, কোন দিকে চলেছি, দেশ মায়ের মুক্তি কি আসবে! বাবার কথা, দাদা ভাই বোনদের কথা মনে আসতে লাগল। না জানি আমার চেয়ে কত অধিক মানসিক

কষ্ট তাদের! তারা বোঝে না, মনের কত শক্তিতে কত সহজে এসব গ্রহণ করতে আমরা সক্ষম! শারীরিক কষ্ট কতটুকু, মানসিক কষ্ট কি এমন বেশী আমাদের পক্ষে!

ডান দিকের ঘরটায় আমার প্রতিবেশী সহপাঠি জ্যোতিষকে বন্ধ রেখেছে। সে ছিল ভূজঙ্গদার বিশেষ বন্ধু আর ভূজঙ্গদার বাড়ীতে যে বান্ধব লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল, সে ছিল তার সভ্য। ওই বয়সেই তার বাপ মা তার বিয়ে দিয়ে ছিল। বাড়ীতে তল্লাসীর সময় তার শালীর চিঠি পড়েছিল পুলিশের হাতে, তাতে নাকি লেখা ছিল, বুনাই বাবু বিড়াল ছানা চুরী করে নিয়ে গেছেন। পুলিশ ভেবেছিল ওই বিড়াল ছানাই হ'ল মশার পিস্তল। জ্যোতিষের বাবা পরে মাছের ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন ও থাকতেন প্রাসাদ তুল্য বাড়ীতে। কিন্তু ছোট বয়সে জ্যোতিষ তখন থাকত একটা খোলার চালা ঘরে ও পড়ত কেরোসিনের ডিবের আলোতে, মনে পড়ে তার মায়ের কাছে পটল ভাজা ও রুটি খেতাম, সে সব কত কালের কথা। সে ভীষণ হাস্যরসিক ছিল। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বাড়ী থেকে স্কুল যাবার জন্য বই বগলে নিয়ে বেরিয়েছি, দেখি পাশের বাড়ীর ধীরেন কতকগুলো রজনীগন্ধার ডাঁটা শুদ্ধ ফুল নিয়ে মার্কেট থেকে ফিরছে। একটা আমায় দিলে। দেরী হয়েছে, পণ্ডিত মশায় তখন ক্লাসে সমাস সন্ধি ইত্যাদি প্রশ্ন করছেন। আমি ঢুকতেই নিকটে ডেকে হাত থেকে রজনীগন্ধাটি নিয়ে বেতের পাশে রাখলেন। জ্যোতিষ

সমাস বলতে ভুল করায় পণ্ডিত মশায় বেত তুলতে গিয়ে হঠাৎ ফুলের ডাঁটিটী তুললেন। জ্যোতিষ সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'পণ্ডিত মশায়, ফুলশরে জর্জরিত তনু' ক্লাস শুদ্ধ সকলে সরবে হেসে উঠলাম। পণ্ডিত মশায় রেগে বললেন, "ষ্ট্যাণ্ড আপ্ অন দি বেঞ্চ"। সেই জ্যোতিষের সদা হাস্যময় মুখ গম্ভীর। সে হয়ত এর জন্য প্রস্তুত ছিল না।

তখন আমি পড়ি বি, এস, সি, থার্ড ইয়ারে। রসায়নে অনার্স নিয়েছি। পড়ার ক্ষতি হবে, দেশের স্বাধীনতা বড় না পাশকরা বড়, এমনি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরের রাতে মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে কানে এল প্রহরীর অবিরাম পদশব্দ। আজ আমার বন্দী জীবনের প্রথম প্রভাত। আজ আর নিজ ঘরে নাই, গারদে, আর গৃহে বা বাহিরে কি স্বাধীনতা আছে! সারা দেশ জোড়া ত কারাগার। কোটী কোটী ভারতবাসী যেন স্বেচ্ছায় ক্রীতদাস!

দেশ মাতার চরণে নিবেদিত কত বন্দী এখানে দিন রাত্রি কাটিয়ে গেছে। তাদের অশরীরী আত্মা যেন এর হাওয়ায় মিশে আছে। আজ আমিও তাদের একজন হয়ে এসেছি। মন গর্বে ভরে যায়। এ আমার সৌভাগ্য!

মোটা লোহার গরাদের জানালার ধারে অবসন্ন ভাবে শুয়ে আছি, হঠাৎ একটা প্রশ্ন কানে এল, 'কি মশায়, এমন ভাবে শুয়ে আছেন যে, দেখি, সিঁড়িতে ওঠবার পথে আমার চেয়ে বয়সে ছোট, একটি বালক, একটি যুবকের সহিত আমার

দিকে চেয়ে হাসছে। বন্দীদের পরস্পর কথা কহা নিষিদ্ধ, কিন্তু তবু বেহারী সিপাহী, বড় কেউ যখন থাকতনা, তখন কথা কহিতে দিত। হয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ইউনিফর্ম অন্তরটাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে পারে না। বড় বন্দীটীর বেশ গেরুয়া, সন্ন্যাসীর মত, মাথায় রুক্ষ চুল, তাঁর নাম শিশির বাবু, বললেন, 'কিছু ভাববেন না, হরি নাম করুন'। ছোটটীর নাম প্রবোধ, বললে, আমরা এক মাসের উপর আছি, মাঝে মাঝে বিচারের জন্য কোর্টে নিয়ে যায়। পূর্বে আমাদের পৃথক ঘরে রেখেছিল, এখন আপনাদের শুভাগমনে স্থানাভাব হওয়ায় এক ঘরে রেখেছে, ভারি মজায় আছি। তারা মজায় আছে শুনে আমাদের থাকবার স্পৃহা অবশ্য বেড়ে উঠল না। কিন্তু তবু অজ্ঞাত কালের জন্য কারাবাসের সম্ভাবনা নিয়ে এই বর্ত-মানকে হাসি মুখে গ্রহণ করার শক্তি আমায় মুগ্ধ করল। মনের ভার যেন কেটে গেল। সেই রাতে, আমরা কয়েকটি বিচারাধীন বন্দী মিলে পংক্তি ভোজনে বসলাম। মাছের নামে কিছু সরু কাঁটার টুকরা, টোকো বাসি ভাতের সঙ্গে ভূষির ডাল ও আদায় কাঁচকলায় প্রস্তুত তরকারী একটি শাল পাতায় খেতে দিলে। দেখি, সেই অপূর্ব ভোজ্য অমৃতবৎ সকলে উদরস্থ করছে, আমিও যথাসম্ভব ক্ষুধা নিবৃত্তি করলাম, কিন্তু আদার সহিত কাঁচকলা এমন সুন্দর সংমিশ্রণে থাকতে পারে, এটা আমার জানা ছিল না। শিশির বাবু অর্থাৎ সাধু বাবার পাতে মাছ দিতেই জনৈক সিপাহী বলে উঠল, 'আপ ক্যায়সে

সাধু হঁয় ? মচ্ছি খাতে'! তৎক্ষণাৎ সাধুবাবার উত্তর হ'ল, 'হমলোক সুবিধাপন্থী হঁয়'। খেতে খেতে আমরা খুব হেসে নিলাম ও সে রাত্রে শয়নকালে মনের ভার অনেকটা হাল্কা অনুভব করলাম।

পরের দিন প্রাতে প্রবোধ আবার আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে হাসিয়ে গেল। সাধু বাবা ভাবতে বারণ করলে। এমনি যখনই তারা সিঁড়ি দিয়ে নামত, আমার সাথে দুটা কথা না বলে যেত না। আমিও আমার বন্ধ দুয়ারের পিছনে বসে তাদের একটু হাসির প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকতাম. মনে যেন একটু বন্ধুত্বের ভালবাসার ছোঁয়া লাগত, ভিজা হাওয়ায় পাথরের গায়েও যেমন শেওলার সবুজ রঙ্ লাগে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যত কঠোর হোক না কেন, অন্তর তার রস সন্ধান করে নেয়। দুটা লোকের সঙ্গে একটু আলাপ, কিছুই নয়, কিন্তু কারাগারে সেই মানসিক অবস্থায় ওইটুকু বন্ধুত্ব দরদ কত ভাল লেগেছিল। তারা পাশের ঘরে থাকত, মধ্যে মোটা দেওয়ালের ব্যবধান, তবু ওদের ওই উপস্থিতিটুকু যেন ব্যবধান লুপ্ত করে দিত ও অশরীরী আত্মার মত পরস্পরের সঙ্গ লাভ করত। এমনি দুঃখ সুখের রৌদ্র ছায়ায় কয়েটা দিন ও রাত কাটল। হাতে শিকল, কোমরে দড়ি বাঁধা যখন তাদের বিচারার্থে নিয়ে যেতে দেখতাম, মনে হত, যেন স্বাধীনতা বন্দী হয়ে চলেছে।

গারদে নীচের তলায় দেখি প্রভুদয়াল বাবু, তিনিও রডা কেসে জড়িত ও ধৃত হয়েছেন। তাঁর বাড়ী থেকে বেদানা

আঙ্গুর পাঠিয়েছিল, আমায় কিছু ভাগ দিলেন। পূর্ব পরিচয় ছিল না, কত কালের বন্ধুর মত দু'জনে দাঁড়িয়ে সেগুলা খেতে খেতে গল্প করতে লাগলাম। প্রহরী কিছু বাধা দিল না। কয়েকদিন পরে আমাকে নিয়ে গিয়ে সনাক্ত করার জন্য এক সারি লোকের সঙ্গে দাঁড় করালে। পিস্তলের বাক্স যখন তুলেছিলাম, তখন ছিল খালি গা, খালি পা চশমা বিহীন চোখ ও কাপড় ছিল কোমরে বাঁধা। সনাক্ত কালে চোখে ছিল সোনার চশমা, পরিধানে ছিল কোঁচান কাপড় ও গরদের পাঞ্জাবী তাতে সোনার বোতাম। তবু বুকের ভিতর একটু গুর্ গুর্ করছিল না, তা নয়। দেখি, সেই বুড়া কোচম্যান, আমি তাকে চিনেছিলাম, আমাদের সারির সমস্ত মুখ পরীক্ষা করে শেষে আমার দিকে এগুল। ভাবলাম সারলে, কিন্তু মুখে একটু নিশ্চিন্ততার ভাব লাগিয়ে রাখলাম। কিন্তু সে আমার পাশের লোকের বুকে হাত দিলে। বেঁচে গেলাম এ যাত্রায়! মনের গুরুভার নেমে গেল। আরও কয়েকদিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের সমুখে নিয়ে গেল। দেখি আদালত ঘর ভিড়ে ভিড়, তার মধ্যে বাবা ও দাদারা দাঁড়িয়ে। ওদিকে দেখি সেই শিশির বাবু ও প্রবোধ। প্রবোধের মুখে মৃদু হাসি, যা সকল সময় লেগে থাকত। আশায় ও ভয়ে দোলায়মান চিত্তে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় শুনলাম, প্রমাণাভাবে আমি ও জ্যোতিষ খালাস। আনন্দে মন হাল্কা হ'ল। আত্মীয়-স্বজন ঘিরে দাঁড়াল, প্রহরী বক্‌সিস্ চাহিলে ও তখনই হাতকড়া

খুলে দিলে। আদালত ঘর থেকে বাহিরে আসবার সময় দেখলাম, শিশির বাবু ও প্রবোধ আমায় হাসি মুখে ও ইশারায় জানাচ্ছেন, আমার মুক্তিতে তারা কত আনন্দিত! আমার চক্ষুদ্বয় কিন্তু সজল হয়ে এল। দুদিনের বন্ধুত্ব, তারা রইল বন্দী, আমি চলল'ম বাহিরে! এক আত্মীয় জিজ্ঞাসা করলে 'সতে আসবার সময় হাসতে হাসতে এসেছিলি আর আজ বাড়ী চলেছিস্, চোখে জল কেন?' আমি কি উত্তর দিব! আদালতের বাহিরে চলে এসে বাবা ও দাদাদের সঙ্গে ট্যাক্সিতে বসলাম। কলিকাতা সহরের জনস্রোতের মধ্য দিয়ে গাড়ী ছুটল আমার বাড়ীর পানে, কিন্তু আমার মানস নয়নে ভাসতে লাগল, সন্ন্যাসী শিশির বাবু ও বালক প্রবোধের মূর্তি, তাঁদের সহাস্য মুখ, হাতে লোহার হাতকড়া আর কোমরে দড়ি। আরও কত দিন তারা আটক থাকবে, কারাদণ্ড হবে কি না, আর জীবনে দেখা হবে কি না, কে জানে!

মশার পিস্তল ও টোটার একটিও পুলিশ বার করতে পারলে না কিন্তু এই রডা কেশে ভূজঙ্গদা, অনুকূল দা, ও আরও কয়েক জনের জেল হয়ে গেল। রডা কোম্পানীর যে জেঠি সরকার হয়ে পিস্তল সঞ্চয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল, সেই শিশির মিত্র বা হাবু অদৃশ্য হল। সেই থেকে আজও তার আর দেখা পাওয়া যায় নি। বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই আজ বেরিয়ে আসত। আজ তার দেশমাতা ইংরেজের কবলমুক্ত। ভুজঙ্গ, অনুকূল দা, গিরিন দা, অনেকে এ জগতে আর নেই,

এই সে দিন নরেন ব্যানার্জীও চলে গেলেন। যাক, পুরাতন এমনি যায়, নূতন আসে, সেকালের বিপ্লব আজ নবরূপ ধারণ করছে, সে ধর্ম্ম, সে সমাজ, পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, হবার প্রয়োজনও আছে প্রকৃতির গতিতে। তাঁরা যে সশস্ত্র বিপ্লবের কতটা প্রচেষ্টা করে গেছে, তার অনেক কিছু হয়ত কেউ জানবে না। ভুজঙ্গদা প্রভৃতির সাহস ত্যাগ ও কর্ম্মের কথা ইতিহাসে কতটা স্থান পাবে তাও জানি না। কবি গ্রে যেমন বলে গেছেন—

Full many a flower is born to blush unseen

And waste its sweetness in desert air.

এই আধুনিক অস্ত্রগুলি পেয়ে বিপ্লবী গুপ্ত দলগুলির কিছু শক্তি সঞ্চয় হল। বালেশ্বরে যতীন মুখার্জি, চিত্ত প্রিয় আদি বীরগণ লড়েছিলেন এই মশার পিস্তল নিয়ে, বহুদিন পরে চট্টগ্রামে ধলঘাটের যুদ্ধে সূর্য্য সেনের বিপ্লবী দল, তাঁরাও সংগ্রাম করেছিলেন এই মশার পিস্তল ব্যবহার করে।

জাহাজ থেকে বিদেশী নাবিকরা মাঝে মাঝে কাষ্টমকে ফাঁকি দিয়ে পিস্তল বিক্রয় করে যেত, এইরূপে কিছু কিছু অস্ত্র সংগ্রহ চলত। সমিতির দাদাদের অনেকে কারাগারে, অনেকে আত্মগোপন করে বিপ্লব কাজে ঘুরছেন। সে সময় আমাদের মত যারা প্রকাশ্য বাহিরে ছিল, তাদের উপর নেতৃত্বের কিছু দায়িত্ব এসে পড়ল। টোটা ভরা মশার পিস্তল প্রায় সর্বদাই কাছে থাকত, ঘুমাবার সময় একটা থাকত বালিশের নীচে, যদি পুলিশ ধরতে আসে, মেরে পালাব ও

না হলে মরব, এই ছিল মনের সংকল্প। পিস্তল ও টোটা আদান প্রদান চলতে লাগল খুব সাবধানে। অপ্রয়োজনে অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছাড়া কেউ কারুর কাছে আত্মপ্রকাশ করতাম না, এই ছিল নিয়ম রীতি আর সে জন্য আমাদের দলের অনেকে শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়েনি।

ইউরোপে সমর সুরু হ'ল। জার্মাণী প্রচণ্ড বিক্রমে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের বহু স্থান দখল করল। ইংরেজের শক্তি তখন টলটলায়মান। আমাদেরও এই সুযোগ। কিন্তু কটা পিস্তল রিভলবার ও বোমা নিয়ে ত বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। অস্ত্র সংগ্রহ দ্রুত চলতে লাগল। কিছু কিছু শিখ ও পাঞ্জাবী ট্যাক্সি চালক দলে যোগ দিয়েছিল। এক জনের নাম ছিল তেজ সিং। সে ট্যাক্সি ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করত। গুপ্তচর ও গোয়েন্দা পুলিশেদের হত্যা করতে নরেন ছিল আমাদের দলের মধ্যে সিদ্ধ হস্ত।

কামাগাটা মারু

"লক্ষ বক্ষ চিরে,
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান, উড়ে যেন নিজ নীড়ে॥"

রবীন্দ্রনাথ

কানাডা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ। কানাডার লোক ভারতে এসে ইংরেজ প্রভুর মতই বিচরণ করত। কিন্তু যে শিখেরা কানাডার অধিবাসী হতে যেত, তাদের সেখানে জাহাজ হতে

অবতরণ করতে দেওয়া হত না। এই ছিল কমনওয়েলথের রূপ। কামাগাটা মারু জাহাজে এমনি একটি শিখের দলের লোকদের আমেরিকা মহাদেশে নামতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তাদের ফিরে আসতে হ'ল। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য পাঞ্জাবে সৈন্য সংগ্রহ চলেছে, এ সময় সাম্রাজ্যের এক অংশের অধিবাসীদের অপর অংশের উপর অন্যায় আচরণের সংবাদ পাছে পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, তাই বৃটিশ সরকার ছলে বলে কৌশলে বজবজের নিকট গঙ্গায় জাহাজ থেকে তাদের অবতরণ করিয়ে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয় ও সেই অজুহাতে পুলিশ, সৈন্য ও মেসিনগান দিয়ে তাদের অনেককে হত্যা করে। যারা মরেনি তাদের বিচারের প্রহসনে কারাগারে আটক রাখে। তাদের নায়ক, শিখ নেতা বাবা গুরুদিৎ সিং পুলিশের কবল এড়াতে সক্ষম হন। গুপ্তজীবনে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বালিয়ে বহুদিন পরে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ও বৃটিশ কর্তৃক কারাগারে বন্দী হন। তিনি আজ ইহজগতে নাই। বাংলার তথা ভারতের শ্রদ্ধাঞ্জলি বাবা গুরুদিৎ সিং ও তাঁর সহচরদের প্রতি যেন অটুট থাকে।

যতীন্দ্রনাথ

১৯১৫ সালে ইউরোপে যুদ্ধ আরও ভীষণভাবে চলেছে। তখন এখানে সাজ সাজ রব। বিভিন্ন বিপ্লবী দলের নেতাদের মধ্যে পরামর্শ ও প্ল্যান হতে লাগল। পিস্তল, বন্দুক ও বোমা

যোগাড় চলল। এই সময় যুগান্তর দলের ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বিপ্লবী যতীন মুখার্জী, চিত্তপ্রিয়, জ্যোতিষ চন্দ্র প্রভৃতির সহিত বালেশ্বরের দিকে গেলেন, শুনলাম জার্মানী থেকে জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র সুন্দরবন অঞ্চলে নামান মাত্র চারিদিকে বিতরণ করে আমাদের যুদ্ধ সুরু হবে। সেখানে এই কাজের জন্য হরিদা (১) 'হ্যারি এণ্ড সন্স' নামে কারবার খুলে বসেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম ও অন্যান্য অস্ত্রাগারগুলি আক্রমণ করে আমরা দখল করব। কিন্তু বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ ও চিত্তপ্রিয়ের মৃত্যু হ'ল। জাহাজ মাল না নামিয়ে চলে গেল। এ সকল ঐতিহাসিক কথা। তখন আমি সিক্সথ্ ইয়ারে পড়ি। সামনে এম, এস, সি পরীক্ষা। পড়ার জন্য সময় পেতাম না। আচার্য্য রায়ের মারক্যাপ্টান নামে এক কেমিক্যালের রিসার্চে সহায়তা করতাম ও বাকী সময় বোমার জন্য বিস্ফোরক প্রস্তুত করতে ব্যস্ত থাকতাম। কলেজ ল্যাবরেটারী ও মাল মশলা যতদূর সম্ভব ব্যবহার করতাম। নৈতিক দ্বিধা আসত না, দেশের জিনিষ দেশের কাজে লাগবে বলে।

প্রফেসর ওটেনের ব্যাপার

দুপুরে কলেজ ল্যাবরেটারীতে কাজ করছি, সংবাদ পেলাম প্রফেসার ওটেন ছাত্রদের অন্যায়ভাবে অপমান করেছে।

---

(১) ২৪ পরগণা চাংড়িপোতাবাসী শ্রীহরিকুমার চক্রবর্ত্তী।

অপমানিতের ভিতরে ছিল আমাদের সুভাষচন্দ্র। প্রঃ ওটেন অন্যায়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করায় হরতাল ঘোষিত হ'ল। সামনে পরীক্ষা, তবু অশান্তির এমনই আকর্ষণ, হরতালে যোগ দিলাম। নিরুৎসাহী, দোমোনাদের উৎসাহ দিলাম, গেটে গেটে পাহারা দিলাম, পাছে কেউ ক্লাসে যোগদান করে! পাস করে প্রফেসার হওয়ার বাসনা তখন মুলতুবি রাখতে হল। প্রিন্সিপ্যাল জেমস্ খুব শাসিয়ে গেলেন। তাঁকে সত্যই শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবিধান না করে যখন তিনি শাসনের ভয় দেখালেন, সেটা তাঁর পক্ষে উচিত হল বলে মনে হল না। চতুর্থ দিনে হিন্দু হোষ্টেলে ছাত্র নেতাদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ সভা বসেছিল, শুনলাম, প্রফেসার গিলক্রাইষ্ট সেথায় শান্তির দূত হয়ে আসছেন। আমি ও সহপাঠী বঙ্কিম ছিলাম হোষ্টেলের দ্বারে। প্রফেসার গিলক্রাইষ্ট যখন হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে ছিলেন ছাত্রদের প্রতিনিধি সুভাষ চন্দ্র ও অনঙ্গ দাম। ভাবলাম, তাঁদের কয়েকটি কথা বলে দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে পাঁচ টাকা করে ছাত্র নির্বিশেষে জরিমানার হুকুম হয়েছে, সে হুকুম প্রিনসিপ্যাল যেন তুলে নেন এবং নিষ্পত্তি উভয় পক্ষে যেন চূড়ান্তভাবে পরিষ্কার থাকে। এই কথা কয়টি যখন বন্ধুদের বলছি, প্রঃ গিলক্রাইষ্ট রুষ্টভাবে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বোধ করি ভাবলেন, আমি নিষ্পত্তিতে বাধা দিচ্ছি। বাইশ বৎসর বয়সে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থার

মধ্যে আমার মুখে উত্তর বেরিয়ে গেল এক্স, ওয়াই, জেড, তিনটি এলজ্যাবরা অঙ্ক শাস্ত্রের অজ্ঞাত সংখ্যা। তখন তিনি মুখ চক্ষু রক্তবর্ণ করে আমাকে শাষালেন, এর জন্য আমার সাজা পেতে হবে। এত রাগের কারণ বুঝতে পারলাম না, তাঁরা কলেজের দিকে চলে গেলেন।

ষ্ট্রাইকের ব্যাপার নিষ্পত্তি হ'ল, কিন্তু রয়ে গেল জরিমানা ও তা দিতেও হ'ল। তাই অশান্তি বাইরে মিটলেও তার বীজ রয়ে গেল ছাত্রদের মনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে প্রঃ গিলক্রাইষ্ট আমায় সঙ্গে নিয়ে, চললেন হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডের কাছে আমার নাম জানতে। তাঁর এই অপমান বোধ কেন যে এত তীব্র লেগেছিল, তা বুঝতে পারি না, বোধ করি বিজাতীয় প্রফেসার যাঁরা পরাধীন জাতির ছেলেদের শিক্ষকতা করতে এসেছেন, তাঁদেরই পক্ষে সম্ভব। এই সেদিন ত, দামোদর বন্যায় সেবার জন্য প্রঃ মল্লিক আমায় 'কলেজের গৌরব' বলেছিলেন। মানবতার প্রতীক এমন ইংরেজ শিক্ষকও দুর্লভ ছিল না।

আর এক ইংরাজ প্রফেসার বলেছিলেন, ভারতীয় ছাত্রেরা নাকি আফিং খায়! প্রিন্সিপ্যাল জেমস্ আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। কলেজ জিমনাসিয়মে আমাদের সহিত বক্সিং লড়তেন। যা হউক, আমি যখন বেকার ল্যাবরেটারীর সিড়িতে, প্রঃ গিলক্রাইষ্ট আমাকে হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডের কাছে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে, আমার নাম জানবার জন্য। কেউ নাই দেখে বললাম 'স্যার, দৈহিক

শক্তিতে তুমি আমার সহিত পারবে না, আমি চললাম'— বরাবর বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। বহুদিন শয্যাশায়ী থাকায় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ী এসে বাবাকে সব বললাম, তিনি তাঁর চির অভ্যস্ত ভাবে বললেন, কিছু চিন্তা করো না, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে।

ওদিকে প্রঃ গিলক্রাইষ্ট আমার সন্ধান করতে লাগলেন। ফিসিক্সএর ডিমন্সট্রেটর অবনী বাবু নামটা বার করলেন, ফিপ্থ্ ইয়ারের ফিসিক্সের আর এক সতীশদের ঠাকুরমার শ্রাদ্ধে দেশে যেতে হয়েছিল, তাকে টেলিগ্রাম করে আনান হ'ল ও দেখে বললেন, এ নয়। সে সতীশ আমায় খুবই চিনত। কত ছাত্রকে তিনি ডেপুটী বা সরকারী চাকুরী করে দেবেন বলে লোভ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কেউই আমায় ধরিয়ে দেয়নি।

ইতিমধ্যে প্রঃ ওটেন দ্বিতীয় বার আর এক ছাত্রকে জামার কলার ধরে টেনে এনে জরিমানা করলেন। হিন্দু হোষ্টেলের খেলার মাঠে আমাদের মিটিং হ'ল। আমাদের গুপ্ত সমিতির বিমান ঘোষ, সে তখন পড়ে মেডিক্যাল কলেজে, আমার সহপাঠি বঙ্কিম রায়, জ্ঞান সান্যাল প্রভৃতি কয়েকজনে পরামর্শ হ'ল। হরতালে ত ছাত্রদের জরিমানা দিতে হ'ল, এবার ঠেঙ্গিয়ে দেওয়া উচিত নচেৎ ওটেন সাহেব বড় বাড়াবাড়ি করছে। এরই দুদিন পরে আমি এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়লাম।

বিকালে কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে কতকগুলি বোমার ক্যাপ নিয়ে সাইকেলে বেরুবার মনস্থ করেছি। সেই মাল পৌঁছে দিতে হবে। সেগুলি ছিল তিনতলায় আমার শোবার ঘরে তাকের উপর। যখন একত্র করে প্যাকেট বাঁধছি, হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ও ভীষণ আগুন দিয়ে ক্যাপগুলি জ্বলে গেল। আমার সারা মুখ, সামনের চুলগুলি ও হাত দুটি পুড়ে গেল। জ্বালায় মরিয়া হয়ে ভুলে গেলাম পোড়া স্থানে জল লাগাতে নাই, সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে জল ভর্তি চৌবাচ্চার মধ্যে লাফিয়ে পড়লাম। সে কি যন্ত্রণা! বাবা, ভায়েরা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অত্যন্ত উদ্বেগে আমার কষ্টের লাঘব করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখনই প্রভাস বাঁড়ুজ্যে, আমাদের দলের ডাক্তার, ছুটে এল ও প্রলেপ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলে। প্রভাস ছিল আমার প্রিয় সহচর। গল্প করে হাসাতে সে ছিল অদ্বিতীয়। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের পার্থক্য তার কিছু ছিল না। একদিন আমাদের বাড়ীতে ভাত খেয়ে বেরুচ্ছিল, পাশের চাটুজ্যে বাড়ীর ছোট কর্তা তাকে বললেন, প্রভাস, আমরা ত রয়েছি, ভাতটা আমাদের ওখানে খেলেই কি ভাল হত না? প্রভাস হেসে বললে, মাষ্টার মহাশয় গুরু, তাঁর বাড়ীতে খাব না কি আপনার বাড়ীতে খেতে যাব! বড়দা তাকে পড়াতো।

চোখ দুটির ওপর পুড়ে যাওয়ার জন্য অন্ধ হয়ে গেলাম। ওদিকে সাবধান হতে হচ্ছে পাছে পুলিশ সন্ধান পায়। বিস্ফোরক দ্রব্যের বিষয় অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত, সে

কথা অজানা ছিল না, কিন্তু ক্রমে এ বিষয়ে একটা অসাবধানতা এসে গিয়েছিল। শুনতাম নেপোলিয়নের সমুখে কামানের গোলা পড়লে বলত সে মরতে পারে না। মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল এমনই একটা অহঙ্কার, তা চূর্ণ হ'ল।

জ্বালা কমে এল, দু চক্ষু হারিয়ে বাড়ীর মধ্যে অন্ধের মত চলাফেরা করতে শিখলাম। জীবনে সে গভীর অভিজ্ঞতা। চারিদিকে শব্দ আছে, স্পর্শ আছে, নাই আলো। ভাবতাম এমনি সারাজীবন অন্ধ হয়ে কাটাতে হবে। সারা জীবন সে কতদিন! মনে হত কবি মিল্‌টনের কথা, যদি তার মত কবিতা আবৃত্তি করে যেতে পারি, কেউ লিখে যাবে। দিন কখন আসে, রাত কখন হয়, বুঝি না। রূপময় জগৎ আমার পক্ষে তখন অবলুপ্ত। মৃদুস্বরে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে ভগবানকে বলি—

"চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে,
অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে।"

ভাবি, বিশ্ব অসীম আঁধার, আলো ত ক্ষুদ্র অংশ, মাতার ক্রোড়ে শিশুর মত, কিন্তু আলোর সন্তান আমি, রূপের পূজারী, আলোর চির-পিপাসী আমার মন, সে প্রবোধ মানে না।

পনের দিন পরে ডাক্তার এসে চক্ষের ব্যাণ্ডেজ খুলতে অস্পষ্ট আলো দেখতে পেলাম। মন আনন্দে আশায় ভরে গেল, যাক্ তা হলে আমি অন্ধ হব না। চোখের দৃষ্টি ফিরে পাব। আলোর জগতে, রূপের শোভা নিভে যাবে না।

জীবনে আর একটা হতাশার অন্ধকার কেটে গেল, বই পড়া বন্ধ হবে না বলে। দেশের বিদেশের, অতীত ও বর্তমানের কত মহা মহা মনীষী, লেখার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য কত ঐশ্বর্য্য দান করে গেছেন। আমরা তাঁদের উত্তরাধিকারী। বইএর পাতার মধ্য দিয়ে পরম বন্ধুর মত তাঁদের সঙ্গ পাই। এত বড় সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হ'ল না, এটা জীবনের কি কম সৌভাগ্য! লেখবার ক্ষমতাও লোপ পাবে না, এও কম কথা নয়!

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। ডান হাতের ঘা ভাল হয় নি বলে, বাঁ হাতে খাওয়া অভ্যাস হয়েছিল। চোখ মুখের ক্ষত কিছু ভাল হলেও বাইরের লোকের চোখে তার দাগ এড়াত না। কিন্তু আমি নিজে তা বুঝতে পারিনি। এই সময়ে সংবাদ পেলাম প্রফেসার ওটেন মার খেয়েছে আর কলেজ বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এম, এস, সি, পরীক্ষায় পাশ করার লোভ তখনও যায়নি, তাই আচার্য্য রায়ের সঙ্গে দেখা করতে কলেজে হাজির হ'লাম।

লর্ড কারমাইকেল তখন ছিলেন বাংলা দেশের গভর্ণর। তিনি দেশের গণ্যমান্য লোকদের ডেকে ডিফেন্স্ অ্যাক্ট্ সম্বন্ধে পরামর্শ করে বিনা বিচারে আমাদের আটকের বন্দোবস্ত করলেন। আচার্য্য রায় আমায় শুধু জানিয়ে দিলেন এবার ধরপাকড় সুরু হবে। আই বি পুলিশের বড় কর্তা মিঃ টেগার্ট কলেজে আসছে শুনে আচার্য্য রায় আমার ল্যাবরেটারী ডেস্ক সাফ করে যত ফালমিনেট ও পিকরিক এসিড ছিল সব

পরিষ্কার করে রেখেছিলেন। আমায় একটু ভৎর্সনা করে বললেন, তোমরা এত অসাবধান কেন? পরে গিলক্রাইষ্টকে টেগার্ট বলেছিল, তুমি সতীশ দেকে চাও? সে ত সিক্সথ ইয়ার কেমিষ্ট্রী ক্লাসের ছাত্র, বিপ্লবী দলে আছে।

পরের দিন ক্লাসে যাওয়া মাত্রই শুনলাম, গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা সচিব মিঃ লায়নের সহিত প্রিন্সিপ্যাল জেমসের দারুণ কলহ হয়ে গেছে এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ হওয়ার আদেশ জারী হয়েছে। আচার্য্য রায়ের নিকট বিদায় নিয়ে বাড়ী আসব, ঠিক সেই সময় একখানি স্লিপ এল, প্রিন্সিপ্যালের ঘর থেকে, 'সতীশ দে ওয়াণ্টেড্'। পথে দেখা প্রঃ গিলক্রাইষ্টের সঙ্গে। তিনি স্বরে করুণা মিশ্রিত করে বললেন, 'এবার তোমার সাজা হবে, এখন কিন্তু আমার হাতের বাইরে, ইচ্ছা করলেও সাজা লাঘব করতে পারব না। কিন্তু তুমি আমায় অমন অপমান করেছিলে কেন? আমি বললাম, তোমায় আমি অপমান কি করেছিলাম বুঝিনা, এক্স্ ওয়াই জেড্ নাম বলা অবাধ্যতা হতে পারে কিন্তু অপমানের কি আছে, বিশেষতঃ ওই উত্তেজনার সময়। কিন্তু আমি তো তোমার নিকট করুণা ভিক্ষা করিনি! 'তাকে গুডবাই' বলে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে প্রবেশ করলাম। মুখ দেখে বুঝলাম, তিনি খুব উত্তেজিত। আমায় দেখেই বলে উঠলেন, 'সতীশ, তুমি! তুমি যে একাজ করতে পার আমি কখনও ভাবতে পারিনি!' প্রিন্সিপ্যাল জেমস্ সত্যই ছাত্রদের স্নেহ করতেন। ফার্ষ্ট

এড্ ক্লাসে ভাল ভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছিলাম বলে আমায় বিশেষ ভাল বাসতেন। জিমনাসিয়ামে এসে আমাদের সঙ্গে বক্সিং লড়তেন ও তাঁর ব্যবহার ছিল বন্ধুভাবাপন্ন। কিন্তু যেদিন দেখলাম সকল ইংরেজ প্রফেসার এক সারীতে দাঁড়িয়েছে, ছাত্রদের মধ্যেও বিজিতের অপমান বোধ জাগতে সুরু করেছে, ব্যাপারটা তখন আর শিক্ষক ছাত্রের নয়, ইংরেজ ও ভারতীয়ের। শিক্ষা নয়, রাজনীতি। আমার উপর হুকুম হ'ল, বিচারার্থে সস্‌পেণ্ড থাকতে। বাড়ী ফিরে ছাতে এসে একলা ভাবতে লাগলাম, কোন পথে চলেছি। সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে ডুবে যাচ্ছে, আমারও কলেজ কেরিয়র, হয়ত চিরদিনের জন্য আজ শেষ হ'ল! অবশ্য কলেজ জীবন শেষ ত হয়েই ছিল, শুধু পরীক্ষা ছিল বাকী, কিন্তু সে শেষ যে এই ভাবে হবে ভাবতে পারিনি। জীবনের ছয়টি দীর্ঘ বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের আর হিন্দু হোষ্টেলের সঙ্গে জড়িত। মায়া কাটতে একটু বেদনা বোধ হয় বৈ কি! প্রায় দুই সপ্তাহ পরে কলেজ কাউন্সিলে বিচারার্থ ডাক পড়ল। গ্র্যাণ্ড ষ্টেয়ার কেসের সম্মুখে বারান্দায় দেখি সুভাষ ও অনঙ্গবাবু দুজনে বিচারার্থে দাঁড়িয়ে। তাঁদের সহিত আলাপ আলোচনা করছিলাম হঠাৎ অফিস সেক্রেটারী ভবতোষবাবু এসে পরস্পর কথা বলতে নিষেধ করলেন। কথা কওয়াতে যে অপরাধ হয়, বুঝলাম না। আমার যখন ডাক পড়ল, হাতের ঘা তখনও সম্পূর্ণ শুকায় নি বলে আমার গায়ে চাদর ছিল, ভিতরে

প্রবেশ করতেই ফিজিক্সের বৃদ্ধ প্রফেসর মিঃ পিক্ পিছন থেকে খপ করে আমার হাত ধরে চাদরটা খুলে দিলেন। হয়ত সার চার্লস টেগার্টের কাছে শুনে থাকবেন, আমার বোমা মারা বা পিস্তল ছোঁড়া অভ্যাস আছে। সাবধানের মার নেই। মনে মনে বললাম, তুমি বৃদ্ধ শিক্ষক, চতুর্থ কাল শেষ হতে চলেছে, তুমিও ! শিক্ষকতা, মানুষের মহত্তম কাজ, রাজনীতির নোংরামীতে কোথায় নেমে আসে ! আমরা ছিলাম তরুণ যৌবনের দ্বারে, বয়স কারুর বাইশের ঊর্দ্ধে নয়, আমাদের ত ভুল করার অধিকার ছিল, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের শিক্ষকগণ কেমন করে ভুলে গেল, শিক্ষক ছাত্রের পবিত্র সম্বন্ধ। আমার উপর চার্জ হ'ল, প্রঃ ওটেনকে মেরেছি ও মারবার মূলে আছি, ঘটনার দিন বা তার কয়েক দিন আগে থেকে আমি ছিলাম, পুড়ে যাওয়ার জন্য, শয্যাশায়ী ও চিকিৎসাধীন। কিন্তু সে কথা বলতে পারি না। তৎক্ষণাৎ পুলিশের কবলে পড়ব, অতএব শুধু বললাম, আমি মারিনি এবং এ বিষয়ে জানিনা। প্রঃ গিলক্রাইষ্টকে ভীষণ অপমান করার অপরাধ সম্বন্ধে জানালাম, আমি কিছু বলিনি, বিজ্ঞানের ছাত্র বলে মুখে এসে গেল এলজ্যাবরার অজ্ঞাত সংখ্যা। কয়েকদিনের মধ্যেই চিঠিতে রায় এল, আমি রাসটিকেটেড ও ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার প্রবেশ নিষেধ। বাড়ীর সামনের বারান্দায় কাগজ-খানি হাতে নিয়ে বসে পড়েছি। ভাবছি, বিদায় প্রেসিডেন্সি কলেজ ! বিদায় হিন্দু হোষ্টেল ! বাবা এসে দাঁড়ালেন,

শুনে, ম্লান হেসে বললেন, ‘জীবনের অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে আর সে গুলা হয়ত অনেক কঠিন হবে, উঠে পড়। উঠলাম ও সার্টটা গায়ে দিয়ে চলে গেলাম একলা ময়দানের দিকে বেড়াতে। মন বলল, কুছ্ পারোয়া নেহি।

সংবাদ পেলাম, সুভাষ ও অনঙ্গ দামের এক বৎসর সসপেণ্ড ও প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ নিষেধের দণ্ড হয়েছে। আর একটি ছেলের ঐরূপ দণ্ড হয়ে ছিল তাকে চিনতাম না। বইগুলা সব তুলে ফেললাম। মুখের পোড়াদাগ তখনও বোঝা যায় বলে লোকে মুখের দিকের তাকিয়ে দেখত, কেউ জিজ্ঞাসাও করত। কাজের মধ্যে ছিল গুপ্ত সমিতির ও দেশ উদ্ধারের আয়োজন আর ময়দানে ভ্রমণ, তা ছাড়া অধিকাংশ সময় বাড়ী থাকতাম। বিপিনদা তখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন, সময় সময় দেখা হত আর কাজের নির্দেশ দিতেন। সমিতির দাদাদের পরামর্শ হ’ল আমাকে সীমান্ত প্রদেশে পাঠিয়ে দেবে, তারা একজন বাঙ্গালী চায় যে বোমা তৈরী করতে পারে। লড়াই লাগলে আমার বোমা কতটা কার্য্যকরী হ’ত, সে পরীক্ষা আর হল না। আত্ম-বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, জীবনের সুখ ও শান্তিনীড় রচনা, পর্যাপ্ত উপার্জন, সমাজ ও দেশে প্রতিষ্ঠা, এমন যা কিছু মানুষের কল্যাণ ও কাম্য বলে বিবেচিত হয়, হয়ত এই কামনার আমার মধ্যে কিছু অভাব ছিল। ছিল অকল্যাণের দিকে একটা আকর্ষণ। প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকেছিলাম ১৯১০ সালে স্কলার রূপে। পরে একদিকে

যেমন শিক্ষায় অপর দিকে দুর্দান্তপনায় ছিলাম অগ্রণী, যার জন্য আচার্য্য রায় কত ভালবেসে আদর করে সর্দার বলে ডাকতেন, নাম ধরতেন না। অপর অপর শিক্ষকগণেরও, হয়ত দুষ্ট ছিলাম বলেই, কত স্নেহ পেতাম, সেদিনও ডাক্তার মল্লিক, আমার প্লাবনের কাজ থেকে ফিরে আসবার পর, কত প্রশংসা করলেন, আজ শেষ হল রাসটিকেট ও প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ নিষেধে। ছাত্র জীবনের শ্রেষ্ঠ ছয়টী বৎসর আজও মনের মধ্যে জড়িয়ে আছে।

বিপিনদা তখন লুকিয়ে থাকেন আর চারিদিকে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করেন যাতে বৃটিশ রাজত্ব পুড়ে যায়। আজ হেথা, কাল সেথা, কোমরে টোটা ভরা মসার। যেদিন সন্ধ্যায় খবর এল বিপিনদা বেলেঘাটায় লুকিয়ে আছেন, সেখানে গিয়ে আমার দেখা করতে হবে। তিনি তখন একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতারূপে অপরাপর দলের নেতাদের সহিত কর্মধারা নিয়ন্ত্রন করছেন। আমি বেলেঘাটায় একতলার একটী ঘরে ঢুকে দেখি বিপিন দা বসে আছেন, যেতেই বুকের কাছে সস্নেহে টেনে নিলেন। বললেন, কলেজের হরতালে এমন প্রকাশ্যভাবে এগিয়ে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি! এতে বিপ্লবের কাজের অসুবিধা হয়।

গভর্ণমেণ্ট জাল ফেললে, ছোট বড় বিপ্লবী, অবিপ্লবী কেউ বাদ না যায়। যদি শত নিরীহের সহিত একজন বিপ্লবী আটক হয়, সেও ভাল, এই হ'ল তখন গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ।

ইউরোপের সময়ে তখন ইংরাজের সুবিধা হচ্ছে না। ৪ঠা মার্চ ভোর রাতে আমার বাড়ীতে পুলিস এল। সাড়াবাড়ী তন্ন তন্ন করে সার্চ হল। সব পরিষ্কার ছিল, কিছুই তারা পেল না। শুধু নীচের ঘরে তুবড়ী বাজির কিছু বারুদ ছিল। বাঙালী গোয়েন্দা ত লাফিয়ে উঠে ইউরোপীয় অফিসারকে সেটা দেখিয়ে বল্লে, এটা গান পাউডার, স্যর। কিন্তু লোহা মিশ্রিত থাকাতে ইউরোপীয় অফিসার বললে, এ গান পাউডার হতে পারে না, মোড়কটা রাস্তায় ফেলে দিলে। এতে গোয়েন্দা সত্যই বড় বিমর্ষ হ'ল। সার্চ শেষ হলে আমায় কিছু সময় দিলে। স্নান করে খাওয়া সেরে পরিষ্কার কাপড় জামা পরে গ্রেপ্তার হয়ে চললাম। এটা দ্বিতীয় অভিযান বলে অনেকটা সহজ লাগল। তবু বাড়ীর লোকের মায়া, সজল চোখে সবাই চেয়ে রহিল, শুধু বাবার মুখখানা রহিল ধীর, গম্ভীর। পল্লীর লোক ভয়ে ভয়ে দূর থেকে চেয়ে দেখল। আমার ঘোড়ার গাড়ীটা বটতলা হয়ে চলল লালবাজারের দিকে। দলে দলে লোকে অফিস চলেছে, তারা চেয়ে দেখতে লাগল।

আবার চললাম ভবিষ্যতের অজানা পথে। কবির গান মনে পড়ল :

"একলা আমি বাহির হলেম, তোমার অভিসারে।"

দুঃখ কষ্ট বরণে, সুখ শান্তি বিসর্জনে জীবন মৃত্যু সাথী করে চলেছি এ কোন অভিযানে! সার্থক হবে কি এ যাত্রা, মরা দেশে হবে কি পরাধীনতার অবসান, জাগবে কি ভারতবাসী,

কেমন করে ভুলে আছে, সে পরাধীন, স্বাধীনতা যে তার জন্মগত অধিকার! মুক্ত নব জীবনে আবার কি দেশ বড় হয়ে উঠবে! আবার কি এ দেশের মানুষ, মানুষের মত বাঁচবে!

লালবাজার লক্‌আপে দেখি নরক গুলজার! প্রত্যেক ঘরগুলিতে আমার মত কত বন্দী! তাদের মধ্যে অনেক অপরিচিত। তবু এই ভেবে ভাল লাগল, সঙ্গীর অভাব হবে না। একলা মানুষের অনেক মনোবলের প্রয়োজন, কিন্তু দলে পড়লে কেউ দুর্বল বলে আত্মপরিচয় দিতে চায় না, ভীরুও বীর হয়ে ওঠে। ভীরুতার মত সাহসও কম সংক্রামক নয়।

আমাদের মত এতগুলি অতিথি সমাগমে গারদের রসুই বিভাগ কিছু অসুবিধায় পড়েছিল, তাই কিছু দালপুরি মুলা শাক সমেত নৈশ ভোজন সমাপন করে রাত্রি কাটাতে হ'ল। সত্যেন একটু রোগা ছেলে, আমার অপেক্ষা বয়স অল্প, শীতে একটু কষ্ট পাচ্ছিল। তাকে আমি সচ্ছন্দে চাদরের ভিতর টেনে নিলাম—কিছুক্ষণ পূর্বে যার নাম পর্য্যন্ত জানতাম না, কত কালের পরিচিতের মত তাকে বুকের কাছে নিয়ে শুতে মনে কিছুমাত্র দ্বিধা এল না। সেও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সেই অন্ধকারে আমার মনে জাগল কবির গানটী—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।”

পরে আমাকে যে বহুদিন জেলে ও নির্বাসনে কাটাতে হয়েছিল, সেটা যে একটানা দণ্ডভোগ হয়েছিল আজ একথা বলতে পারি না। কবিগুরুর ভাষায় বলতে পারি, শুধু কোমল করুণা পাইনি—শুধু মৃদুসুরে এ জীবন ব্যর্থ হয়নি, কঠোর আঘাতে দিনগুলি রাতগুলি দণ্ডে দণ্ডে দলিত হয়েছিল, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীদের, পুলিশ ও জেল অফিসারদের ও এমন কি কয়েদীদের ও প্রহরীদের নিকট স্নেহ ভালভাসা দরদ ইত্যাদি মানুষের যা প্রেয় তার অনেক কিছু পেয়েছি। আর পেয়েছি কোথায়! কারাগারে নির্বাসনে যেথায় মনুষ্য মনের সহানুভূতির মূল্য যে কত অধিক, লোকের ভীড়ে বাহির জগতের মানুষ তার গভীরতা নিরূপণ করতে পারে না।

লালবাজারে তিনদিন বন্দী থাকার পর বৈকালে আমাদের কয়েকজনকে কয়েদী ভ্যানের মধ্যে পুরে নিয়ে চলল, কোথায় কে জানে! বন্দী গাড়ীতে আরোহন, জীবনে সেই আমার প্রথম! এর চারিদিক খড়খড়ির মত, তাতে দু'পাশের

রাস্তার অল্প অংশ মাত্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কোন্ পথ দিয়ে যাচ্ছি, বুঝবার উপায় নাই। গাড়ী থামলে নেমে দেখি, ময়দানের ধারে একটী অর্ধ গোলাকৃতি বাড়ী, তাতে পাশাপাশি সেল, চিনলাম এটী দালান্দা বিল্ডিং। বহুপূর্বে এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে এখানে এসেছিলাম, পরে এটা পাগলা গারদরূপে ও তারপরে পুলিশ ট্রেনিংএর জন্য ব্যবহার হ'ত। ভাত, রুটী দাল ও বেগুনের তরকারী খেতে দিল। কিছুক্ষণ সময় যখন খোলা থাকতাম, সহবন্দীদের সহিত আলোচনা করে কাটিয়ে দিতাম। তার মধ্যে একজন চোখ ঘুরিয়ে এমন কথা বলতে লাগল, যেন আর কিছু সময় পেলেই সে দেশ স্বাধীন করে ফেলতে পারত। তাকে পুলিশের চর বলে আমার সন্দেহ হ'ল ও কথা কহা বন্ধ করলাম। পরদিন প্রাতেই আমায় নিয়ে গেল ইলিসিয়ম রোতে আই বি অফিসে কমিশনার টেগার্টের কাছে। তার নাকটা উচু ও চোখ দুটা ভীষণ তীক্ষ্ণ। জাতে আইরিশ। নিজের দেশ পরাধীন, আর সে আমাদের জ্বালাতে এসেছে, এমনি অর্থের মোহ! তখনই মনে হয়, আমার দেশেও ত এই রকম অনেক লোক আছে, তারা অর্থের লোভে চাকরীর মোহে নিজ দেশের সর্বনাশ করছে।

তিনি আমায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানারূপ জেরা করলেন। আমি পাশ কাটিয়ে উত্তর দিতে লাগলাম, যেমন, যখন জিজ্ঞাসা করল, বিমান ঘোষকে চেন কি না। বললাম,

বিমান বোসকে চিনি, সে আমার কলেজের সহপাঠী। তখন টেগার্ট বলে, বোস নয় ঘোষ। আমি বলি ঘোষ বলে জানি না, তবে বোসকে চিনি।

রক্ষী ছিল বন্দুক সঙ্গীনধারী একজন লম্বা রোগা ইউরোপীয় সৈনিক। বাহিরে এসে যখন গাড়ীর খোঁজ করছে, আমি তাকে বললাম, দেখ, তোমার হাতে ত সঙ্গীন লাগান গুলিভরা বন্দুক রয়েছে। আমি পালাব না, আর পালাতে গেলেই ত মেরে দেবে। গাড়ীতে না গিয়ে চল হেঁটে যাওয়া যাক। লোকটা ভাল মানুষ, আমার কথাটা মন্দ নয় ভেবে রাজি হ'ল ও কদিন পরে প্রাণখুলে আনন্দে পা ফেলে ময়দানের হাওয়ায় হাঁটতে শরীরের অবসাদ অনেকটা যেন কেটে গেল। আমার সে অবস্থায়. যানের চেয়ে পায়ে হাঁটা ছিল বেশী উপভোগ্য।

চার দিন টেগার্টের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর চল্‌ল। সে যেন বুদ্ধির লড়াই। কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দোব না এ ভাব দেখাই নি, কিন্তু প্রত্যেক উত্তর এড়িয়ে যাই। টেগার্টের প্রশ্ন শেষ হলে পর দিন এল, আই বির সহকারী কমিশনার লোম্যান। সঙ্গে তার স্ত্রী। আমায় তার মোটরে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার ম্যাক্‌কের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার আমার মুখের ও হাতের পোড়া দাগগুলা পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলে কি ভাবে পুড়ল। আমি উত্তর করলাম, ষ্টোভ ধরাতে গিয়ে বেশী স্পিরিট পড়ে আগুন লেগে গিয়েছিল। আঘাতের

চিহ্ন ছিল না বলে রিপোর্ট হ'ল, বোমা বিস্ফোরণ কারণ নয়, ষ্টোভ জ্বালাতে এমন সম্ভব। যা হউক, ফেরবার সময় মনটা বেশ ভাল ছিল ও সস্ত্রীক লোম্যানের ব্যবহারে কোনরূপ বিজাতীয় ঔদ্ধত্যের পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার মন্দ লাগেনি।

একদিন দেখি সামনের ময়দানে কলেজের পরিচিত নির্মল গুপ্ত ড্রিল করছে। সে আমার এক ক্লাশ উপরে পড়ত। কি দাদা, বলতে আমার দিকে তাকাল না, ভয়ে না লজ্জায় জানি না। আমরা গেছি দেশের জন্য কারাগারে আর সে করছে পুলিশে চাকুরী দেশের সর্বনাশে বিদেশী শাসককে সাহায্য করতে।

পনের দিন পরে দুজন করে হাতকড়া লাগিয়ে আমাদের নিয়ে চলল প্রেসিডেন্সি জেলে। এক হাত বাঁধা। বাড়ী হতে যে কাপড় জামা আদি দিয়েছিল, সেই হুঁটলি কাঁধে নিয়ে অপর হাতে ধরে চলেছি। আলিপুর পুল যখন পার হচ্ছি, একটা বুড়ি দেখে চেচিয়ে উঠল, আ মরণ! ডাকাত-গুলার চেহারা দেখ, যেন ভদ্রলোক।

প্রেসিডেন্সি জেল—চুয়াল্লিশ ডিগ্রী

সামনের প্রকাণ্ড ফটক খুলে গেল ও আমরা প্রবেশ করতেই বন্ধ হ'ল। ছোট টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ছিল ইউরোপীয় জেলর ও দাঁড়িয়ে ছিল অনেকগুলি দেশীয় হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডার। আমাদের সারীবন্দী বসতে হুকুম হল। এক বন্ধু তিন ইঞ্চি

উচু ধাপ দেখে তারই উপর বসেছিল, একটা ওয়ার্ডার ভীষণ চীৎকার করে লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। প্রথমটা কারণ বুঝতে পারি নি, যখন বুঝলাম অপরাধটা কি, ভাবলাম, হাঁ এটা জেল বটে। তারপর সুরু হ'ল রীতিমত খানাতল্লাসী, কাঁচা, কোঁচা খুলে দেখল, পকেটে গোটা কয়েক এলাচ ছিল ওয়ার্ডার সেগুলা বার করে ছাড়িয়ে বিনা সংকোচে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। কিছু বলতে ভরসা হ'ল না, পরে আমাদের এক এক করে নিয়ে চলল জেলের ভিতরে। চারি দিকে সুউচ্চ প্রাচীর, মাঝে মাঝে বড় বড় ওয়ার্ড, কোথাও কোথাও ছোট পোষাক পরা কয়েদী ঘোরাফেরা করছে, দ্বারের পর দ্বারের মধ্য দিয়ে এসে পড়লাম চৌবাচ্চার মত ঘেরা একটা ক্ষুদ্র স্থানে। সামনে শেল্, মোটা লোহার কপাট খুলে আমাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে চাবি লাগিয়ে দিলে। এ যেন চব্বিশ কৌটার ভিতরের কৌটা, জেলের ভিতর জেল, শেষ এই সেল, এর নাম প্রেসিডেন্সি জেলের বিখ্যাত চুয়াল্লিস ডিগ্রি। জন্তু জানোয়ারের ও পিঁজরা এর চেয়ে বড় হয়। একমাত্র কপাট ছাড়া অন্য কোনও দিকে আলো বায়ু প্রবেশের পথ নাই। মেঝে টালিবিছান অসমতল, পিছন দিকটা বহুকালের লেপা চুণে উচু হয়ে গেছে। কোনে ঢাকনী সমেত তিনটি আলকাতরা মাখান টুকরী, দুটী পায়খানা ও প্রস্রাবের জন্য ও আর একটীতে বালীমাটী। মল ঢেকে রাখতে হবে, মেথর তার সময়মত সাফ করে নিয়ে যাবে। চৌবাচ্চার মত এন্টিসেলের

সমুখের কাঠের দরজায় চাকতি লাগান একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র, ইচ্ছা মত প্রহরী চাকতি সরিয়ে দেখে নেবে কি করছি।

দুটা রুক্ষ কম্বল, সরার মত মরিচা ধরা লোহার বাটী ও লোহার থালা দিয়ে গেল। সিপাহী এসে চাবি খুলে দিলে এণ্টিসেলে আসতে ও অল্পক্ষণ পরে তিনজন কয়েদী রুটী, দাল শাক ও নূন দিয়ে গেল। রুটীগুলি মোটা ও ব্যাস বার ইঞ্চির উপর হবে। শাকে দেখলাম সরু কাটা মাছের তরকারী নামে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আমি মোটের উপর নিরামিশ খাওয়া পছন্দ করলেও মাছ মাংসর আর আপত্তি করি না ও আমার সতের বৎসরের অভ্যাস পরিত্যাগ করেছি। ক্ষুধা যথেষ্ট ছিল বলে কিছু খেলাম। পাশের সেলে মাড়োয়ারী কানাইয়া লালকে বলতে শুনতে পেলাম, এ সতীশ ভাই, এ ত মচ্ছি দিয়া, ক্যায়সে খায়েঙ্গে? আমি তাকে উপদেশ দিলাম, ভাই আজ স্রেফ্ নিমক লাগাকে খা লেও, কাল জেলারকো বলো। যা হোক, কানাইয়া ছিল বিপিনদার ভক্ত চেলা, বড় ভালমানুষ। নিজের শত কষ্টের মধ্যেও আত্মবলে বিশ্বাস ছিল কিন্তু বেচারা কানাইয়া, জৈন মাড়োয়ারী, তার আজীবনের সংস্কার ত্যাগ করে কি করে মাছের ছোঁয়া রুটী খায়, ভেবে দুঃখ হ'ল।

এক বাল্তি জল দিয়ে গেল, খাওয়ার পর মুখ ও সেই লোহার থালা বাটী ধুয়ে রাখলাম। সেলে পুরে ভারী লোহার দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিলে ও দরজার বাইরে সামনে জলের বাল্তীটা রেখে দিলে। তেষ্টা পেতে কি করে জল খাব

ভাবলাম। জলভর্তি বাটী ত গরাদের ফাঁকে ঢোকান যায় না, কাত হলেই জল পরে যায়, শেষে বাইরে বাটী ধরে লোহার রডের ফাঁক দিয়ে ভিতর থেকে চুমুক দিয়ে জল পান করলাম। চারিদিক ক্রমে আঁধার হয়ে এল। লক্ষ মশার ভনভনানির মধ্যে বসে না থেকে পায়চারী করতে লাগলাম।

ক্ষুদ্র সেল, মাত্র পাঁচটী পা ফেলা যায়, পিঁজরায় যেমন জন্তুগুলা ঘোরে। মন অবসাদে ভারী ছিল। অজ্ঞাত ভবিষ্যতে জীবনে কি আছে কে জানে। বাড়ীতে বাবা, ভাই সকলে এখন কি করছে, কি ভাবছে! বন্ধুরা এখন কে কোথায় কি করছে! থিয়েটার হলে এখন থিয়েটার হচ্ছে. হোটেলে এখন মদের গ্লাস নিয়ে বড় বড় লোক গোগ্রাসে গিলে চলেছে, ঘরে ঘরে সুখ দুঃখের সংসার চলেছে, কারুর বাড়ীতে মৃত্যু হচ্ছে, কারুর বাড়ীতে বা সন্তান জন্ম নিচ্ছে, আমি এই ক্ষুদ্র আঁধার সেলে বন্দী, পায়চারী করছি, দেশ স্বাধীন করতে চেষ্টা করার অপরাধে! পা ফেলছি আর ভাবছি, হয়ত এমনি সেলের মাটী দেশ মায়ের কত বীর সন্তানগণের পাদস্পর্শে পূতঃ পবিত্র হয়ে আছে, কত সন্তান স্বাধীনতা পূজার বেদীতে আত্মদানের জন্য দিনের পর দিন কাটিয়েছে। তারা যেন এই সেলের হাওয়ায় মিশে আছে। এ যেন একটা তীর্থ, আমার মত নগন্য লোক এই তীর্থে এসে ধন্য হয়েছে। এমনি নানারূপ চিন্তা ও পায়চারী করতে করতে যখন ক্লান্ত বোধ করলাম, শুয়ে পড়লাম। কারাগারের বীভৎসতা মনে

যেন সহজ হয়ে এল। দুটী কয়েদী কম্বল দিয়েছিল, একটী ত অসমতল টালির মেঝেয় যথা সম্ভব দরজার দিকে টেনে, পা্তলাম, বৈশাখী গরম, যদি একটু হাওয়া পাই, অপর কম্বলটী পাকিয়ে মাথার নীচে দিলাম বালিশের অভাবে। রুক্ষ কম্বলের কুটকুটে লোমে সর্ব্বাঙ্গে অসোয়াস্তি হতে লাগল। ওদিকে আবার মশার আক্রমণ চলল। সে কি ভীষণ ঝাঁক! তখন কম্বলটী মাথার নীচ থেকে নিয়ে খুলে গায়ে দিলাম। গরমে ঘেমে সমস্ত শরীর ভিজে গেল। শেষে ওই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরের রাতে কারাগারের ঝনঝনানি শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেথর টুকরী দুটা নিয়ে গেল, সাফ করতে। তাকে দেখে কত ভাল লাগল, সে যে মানুষ! ইচ্ছা হ'ল দুটা কথা কহি। কিন্তু প্রহরী তার সঙ্গে থাকায় সুবিধা হ'ল না। পাশের দেওয়ালে টোকা দিলাম। শব্দের প্রত্যুত্তর পেলাম। এণ্টিসেল প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে পার্শ্ববর্ত্তী সেলের কানাইয়া লালের সহিত মৃদুস্বরে কথা কইছি। তাকে দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ ঘটাং করে দ্বার খুলে গেল ও সার্জন ক্লারিক চীৎকার করে বকাবকি করল। এণ্টিসেলের দ্বারের ছিদ্র পথে দেখতে পেলাম, শ্রীরামপুরের জিতেন দা সামনের বারান্দায় পায়চারী করছে, তার পরণে প্যাণ্ট ও সার্ট। জিতেন দা আমেরিকা ও জার্মান ফেরত ও গদর পার্টির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। পূর্ব্বে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে সতীশ সেনের মেসে তার সঙ্গে

কত ব্যায়াম করেছি ও বক্সিং লড়েছি। শুনলাম ১৯১৫ সালের শেষের দিক থেকে তাঁকে ৩নং রেগুলেশনে বন্দী করে রেখেছে। এমনি আরও দু একজন পরিচিতকে দেখতে পেলাম। পরে আমাকেও পনের মিনিট পায়চারী করবার জন্য সেলের দরজা খুলে দিল।

কারুর সঙ্গে পরস্পর চাক্ষুষ দেখা হত না, কথা কহাছিল অসম্ভব, শুধু খুব সাবধানে পাশের সেলের বন্দীর সঙ্গে সময় সময় দু' একটা কথা বলা যেত। তবু তারা যে আছে, আমরা যে অনেকে এখানে, শুধু এই জানাটুকুতেই মনে বল আসত। একলা বিনা কাজে সময় যায় অনুচ্চ স্বরে গান ধরলাম, একটু পরেই সেই ক্লারিক দরজা খুলে ভীষণ চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, জেলখানাটা আমি নাচঘর মনে করি কি না। কি করি, কবিতা বা গীত, যা স্মরণে ছিল, গুণগুণ করে আবৃত্তি ও গান করতে লাগলাম। মনে হল ভাগ্যে চয়নিকা পড়া ছিল। তায় এন্টিসেলের উপর যে আকাশটুকু দেখা যাচ্ছিল তাই কি কম সান্তনা!

লোহার বাটিতে প্রাতরাশ লপ্সি ঢেলে দিয়ে গেল। দেখলাম শুধু খুদ সিদ্ধ, তাও লবণের আস্বাদ নাই। ক্ষুধাই স্বাদ আনে, নহিলে কি করে সেই লপ্সি অমৃতের মত লাগল, জানি না।

সাড়া পড়ে গেল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসছে। চিৎকার উঠল, "সরকার সেলাম।" হুকুম হল, কিম্ভূত ভঙ্গিতে দুটা হাত

বুকের কাছে তুলে দাঁড়াতে হবে। হাত তোলার মানে বুঝি নাই। হয়ত বা পাছে যদি কিছু হাতে থাকে, ছুড়ে মেরে দিই, তাই হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে দাঁড়ান, এই জেলের নিয়ম। অকারণে মানুষকে এখানে অপমান করবার নিয়ম পদ্ধতি অনেক ভেবে চিন্তে বার করা হয়েছে যাতে তার ভিতর কিছু যদি মনুষ্যত্বের অবশেষ থাকে, তা যেন, নষ্ট হয়ে সে অমানুষ হয়ে যায়।

এক বাল্তি জল ও বার সোপের এক টুকরা দিয়ে গেল। শুনলাম, ওই টুকু জলে স্নান করা, কাপড় কাচা, খেয়ে আঁচান, থালাবাটী সাফ করা, সব করতে হবে ও সাবানের টুকরাটা গায়েমাখা, কাপড় গামছা পরিষ্কার করবার জন্য এক সপ্তাহ ব্যবহার করতে হবে। তেল হাতের তেলোয় সপ্তাতে একটীবার ঢেলে দিত। গায়ে বার সোপ মাখতে কোনও দিন রুচি ছিল না। তাই এমনি শুধু জলে স্নান করতাম, বালতী থেকে লোহার বাটীতে কিছু জল নিয়ে মাথায় গায়ে ঢেলে দিতাম। গরমে ওটুকু জলে গা ঠাণ্ডা হ'ত না। এগারটা আন্দাজ ভাত ডাল ও শাক দিয়ে গেল। ঘড়ি ছিল না বলে রৌদ্রে প্রাচীরের ছায়া দেখে সময় আন্দাজ করতে হ'ত।

মোটা চালের কাঁকড় মিশ্রিত ভাত, মটর ডাল ও কিছু ঘাস চচ্চড়ি। খাওয়া ও মুখধোয়া শেষ হতেই এন্টিসেল থেকে সেলের মধ্যে বন্ধ করে দিলে তালা নেড়ে দেখে, খোলা না থাকে। বিনা কাজে নিঃসঙ্গ সেলে সময় কাটতে চায় না।

মানুষ সামাজিক জীব। সঙ্গ ছাড়া মানুষ কি থাকতে পারে! তাও যদি মানুষের লেখা দু' একটা বই পেতাম পড়তে বা একটু কাগজ পেনসিল থাকত কিছু লেখবার জন্য, মানুষ পড়বে বলে! ক্ষুদ্র সেলে বন্য জন্তুর মত পায়চারী করতে লাগলাম, যেমন দেখেছি, জু গার্ডেনে বন্দী পশুদের অবস্থা। অরণ্য তাদের ডাকে, আমাদের ডাকে মানুষের লোকালয়। ক্লান্তি এলে রুক্ষ কম্বলে শুয়ে পড়তাম। ভগবানের চিন্তা করতে চেষ্টা করতাম। কিছুই পারতাম না। মনে হ'ত মানুষ নইলে ভগবান কোথা!

বৈকালে মেথর টুকরী সাফ করতে এল, সঙ্গে প্রহরী ছিল না। কয়েদী টুপির মধ্যে থেকে এক টুকরা কাগজ ও ইঞ্চি খানেক লম্বা একটী ক্ষুদ্র পেনন্সিল দিয়ে গেল। কথা কইল না, শুধু ইঙ্গিতে জানাল পড়তে। অশিক্ষিত মেথরের নিঃস্বার্থভাবে বিপদ বরণ করে এই সাহায্যটুকু করায় মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এদেরই আমরা অস্পৃশ্য করে রেখেছি। জেলে হাতে কিছুই নাই যে তাকে পুরস্কৃত করি। কিছু থাকলেও দিতে মন সরত কিনা জানি না, হয়ত মনে হ'ত, এতে ওর মহৎ অন্তরের অবমাননা করা হবে। দেখি, জিতেনদা লিখেছেন, সতীশ, কতজন ও কে কে এল? আমি নভেম্বর থেকে আছি। সংক্ষেপে ক্ষুদ্র কাগজটির উপর উত্তর লিখলাম, পুনরায় যখন টুকরী দিয়ে গেল তখন মেথর আমার ক্ষুদ্র পত্রটী নিয়ে গেল। দরজার লোহা ও প্লাষ্টারের যোগ স্থলে একটু ফাটল ছিল,

তার মধ্যে অতিক্ষুদ্র পেনসিলটী লুকিয়ে রাখতাম, খানাতল্লাসীর সময় যাতে কেউ দেখতে না পায়। গোপন চিঠি লেখার আর একটী উপায় শিখলাম, সেটী হচ্ছে, একটা কাঠী দিয়ে মুখের লালায় কাগজে যা লিখলাম, শুষ্ক হলে তার কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু লোহার বাটীতে ক্ষণিক রাখলে চা যে কালো হয়ে যায়, তাইতে সে কাগজ চুবালে লেখা ফুটে ওঠে।

কানাইয়া লালের পাশের সেলে ছিল পর্বতী দা, সে রুটীর উপর দাঁত মাজার কয়লা দিয়ে লিখে সেটা কানাইয়ার সেলে ফেলত আর কানাইয়ালাল আমায় ছুড়ে দিত। লেখার যে অনেক কিছু জরুরী খবর থাকত, তা নয়, তবু ওইটুকুই ভাল লাগত। একদিন পার্বতীদার এন্টিসেলে যখন আমার লেখা রুটী ফেলে দিলে, ঠিক সেই সময় সশব্দে দরজা খুলে ফিরিঙ্গী ওয়ার্ডার ক্লারিক তাকে জিজ্ঞাসা করলে, রুটী কোথা থেকে পড়ল। পার্বতী দা তোতলার ভান করে বললে কাইট ফ্লাইয়িং ড্রপ। পার্বতীদার সাজা হয়ে গেল, তিনদিন সেল থেকে এন্টিসেলে বেরুন নিষেধ। এরূপ নিঃসঙ্গ সেলবাস কারা আইন অনুযায়ী সাজা, আমাদের জন্য এইটাই হল সাধারণ ব্যবস্থা ও সেটা অনির্দিষ্ট কালের জন্য। কত লোক পাগল হয়ে যায়, ডিফেন্স এক্টএর বিনা বিচারের নজর বন্দীদের নির্জন সেলে রাখা ও অতি নিকৃষ্ট ব্যবস্থা আমাদের জন্য কোন আইনে হয়েছিল তা তখনকার বৃটিশ সরকারই জানে,

আর জানে তার তাঁবেদার সরকারী উচ্চপদস্থ দেশদ্রোহীরা। লোকে নাকি বলে বৃটিশ খুব আইন মানা জাত।

এরা যখন আমাদের দেশ পরাধীনতার নাগপাশে বেঁধে শোষণ করে, বলে এটা আমাদেরই উপকারার্থে Government established by Law দ্বারা শাষন করতে। এদেশের শিল্প ধ্বংস করে যখন নিজদেশের মাল আমাদের বিক্রয় করে, বলে আমাদেরই ভালর জন্য করছে, আইনের ভিত্তিতে যদি কাউকে কারাগারে আবদ্ধ করার রাষ্ট্রিয় প্রয়োজন মনে করে, তবে তার জন্য ডিফেন্স এক্টের অর্ডন্যন্স, রেগুলেশন জারি করে, বা আইন সভায় বিশেষ ক্ষমতা পাশ করিয়ে নিয়ে অন্যায়কে আইন সংগত করে নেয়, যেমম আমাদের জন্য করেছিল। আর মানুষ হিসাবে তাদের অন্তঃকরন নাকি উদার। কথা কতটা সত্য জানি না, নিজ দেশকে জাতিকে এরা ভালবাসে সে জাতি প্রেম এমন উগ্র যে পর জাতিকে শোষণ করে।

অরবিন্দ বাবু কারাগারে যোগ অভ্যাস করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে ছিলেন, এমনি একটা কথা শুনেছিলাম। পূর্বে রাজযোগের কিছু পড়া ছিল, আসন করে নাক টিপেটিপে প্রাণায়াম সুরু করলাম, দু চোখের দৃষ্টি নাকের ডগা থেকে ক্রমে দুটী ভ্রূর মধ্যস্থলে টানতে চেষ্টা করলাম। যদি সুষুম্না নাড়ী দিয়ে কুলকুণ্ডলিনি জাগ্রত হয়। আঙ্গুল ব্যথা হল, নাক ফুলে গেল, শত চেষ্টাতেও কিছু সুবিধা হল না, বরং শেষ ভয় হ'ল, স্নায়ুগুলির উপর প্রতিক্রিয়ায় পাছে মাথা খারাপ হয়ে যায়!

দেওয়ালে দেখতাম, কোথাও পিস্তল বন্দুক আঁকা, কোথাও ভারতের মানচিত্র, কোথাও কবিতার দু ছন্দ, আমার পূর্বে যে বন্দী ছিল, তারা রেখায় ও লেখায় বন্দী প্রাণের আশা বেদনা প্রকাশ করে গেছে। আমিও কয়লার একটা টুকরা দিয়ে দেওয়ালের গায়ে লিখলাম কবির দুইটি লাইন,

"মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।"

মুহূর্তের পর মুহূর্ত যায়, রাত্রি শেষে সকাল হয়, সূর্য্য ওঠা দেখা যায় না। দুপুর হয়, সন্ধ্যায় আঁধার হয়ে যায় যেন পা টিপে টিপে এক একটী বেলা, এক একটী দিন যেতে লাগল, অতি ধীরে মৃদু মন্থর গতিতে। সময় আর কাটে না। বিনা কাজে সময় যেন অচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আকাশে একটু মেঘ করত, যদি একটু ঝড় উঠে আমার একঘেয়ে বন্দী জীবনে দূরে মুক্ত আকাশের বারতাবায় এনে ক্ষণিকের একটু বিচিত্রতার সৃষ্টি করত, যদি একটা ক্ষুদ্র পাখী এন্টিসেলে আমার ভুক্তাবশেষ খাদ্য কণার লোভে উড়ে এসে একটু শীষ, একটু নাচন দেখিয়ে উড়ে যেত, আমি কত যে তৃপ্তি লাভ করতাম।

এমনই ভাবে প্রায় একমাস কাট্‌ল। শেষে এক প্রত্যুষে আমায় নিয়ে গেল জেল ফটকে। দেখি আরও ছয়জন সহবন্দীকে গেটে এনেছে। সাতজন উবু হয়ে বসে এনামেলের মগে দুধ চিনি বিহীন চা ও এক টুকরা করে শুষ্ক রুটী খেয়ে

অপেক্ষমান বন্দী গাড়ীতে উঠতে হ'ল। হো'ক কয়েদী গাড়ী, আমরা সাতভাই এতদিন পরে পরিচিত ও অপরিচিত পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে, কথা কয়ে, কত যে আনন্দ পেলাম, কি করে বোঝাবো? এ অনুভূতির তুলনা নেই। মানুষ মানুষকে যে কত ভালবাসে, বাহিরে তার কতটুকু বোঝা যায়। কিছু বুঝেছিলাম সেই সকালে কয়েদী গাড়ীর মধ্যে আমার সাত বন্ধু! গাড়ী এসে দাঁড়াল, শিয়ালদহ ষ্টেশনে। ট্রেনে লোহার শিকে ঘেরা একটী কামরায় আমাদের তুলে দিলে, সঙ্গে চলল এক হাবিলদার, নয়জন প্রহরী ও তাদের একজন ইউরোপীয় কম্যাণ্ডার। ষ্টেশনের কত যাত্রী আমাদের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। কেউ বললে ডাকাত, কেউ বললে স্বদেশী, ফাঁসি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ চাহিল করুণ চোখে, কেউ ঘৃণায় মুখ ফেরাল, বলে ভদ্রলোকের ছেলেদের এসব কি! আমার কিন্তু সকলকেই আপনার জনের মত লাগল ও ইচ্ছা হতে লাগল তাদের গায়ে একটু হাত বুলিয়ে নিই, দুটা কথা বলি।

ব্যারাকপুর ষ্টেসনে কিছু জল খাবার খাওয়া হ'ল। মন স্ফুর্তিতে আছে যদিও কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছে জানি না, শুধু বুঝেছি উপস্থিত যাব চট্টগ্রাম। কম্যাণ্ডারের সামনে বেহারী পুলিশ প্রহরীরা কথা কহিতে ভরসা করল না। অফিসারটীর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা দেখে ভাবলাম মানুষ ভাল হবে, আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। আমরা দেশের কাজে বন্দী, এটা জানে কিনা। বুঝলাম না। ডিউটী বলে সে চুপ করে রইল।

ট্রেন চলেছে গোয়ালনন্দের দিকে। আমরা চলেছি অজানা বন্দী নিবাসে। সার্জনটা ও প্রহরীগুলা হেলান দিয়ে বসে ঝিমুচ্ছে। আকাশে বাতাসে বৈশাখী রুদ্র তেজ, দুপাশে অবারিত প্রান্তর। টেলিগ্রাফের পোষ্ট ও গাছগুলা যেন পিছন দিকে ছুটে চলেছে, তারের উপর পাখীগুলা বসে প্রাণের আনন্দে শিষ দিচ্ছে, নাচন দেখাচ্ছে। আনন্দের অভাব নাই বাইরের প্রাকৃতিক জগতে, আমরা চলেছি বন্দী নিবাসে। প্রাণ ভরে নিশ্বাস টেনে নিই মুক্ত হাওয়ায় ; যতক্ষণ যতটুকু মিলে! মনে বিশ্বাস, আমাদের জীবনের কষ্ট ভোগের মধ্যে যে নব জীবনে জেগে উঠবে। পরাধীন দেশ স্বাধীন হবে। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

দুপুরে গোয়ালনন্দ ষ্টীমারে চলছি পদ্মার বুকে। অতি দূরে ক্ষীণ তটরেখা, অবাধ জল রাশি চলেছে। কোথাও পাল তুলে চলেছে মাল বোঝাই নৌকা, কোথাও চলেছে জেলে ডিঙ্গি, ষ্টীমারের যাত্রীরা, কত ছেলে মেয়েরা প্রহরীদের ভয়ে কথা কহিতে সাহস পাচ্ছে না। তাদের চোখে কতজনের দরদী দৃষ্টি, কত বিস্ময়! কে আমরা, সঙ্গে বন্দুক সঙ্গীনধারী প্রহরী কেন!

ক্ষুধা লাগছে। প্রহরী সার্জনকে বলতে উত্তর করল, সরকার থেকে অমাদের জন্য যে জন প্রতি তি আনা হিসাবে পেয়েছিলাম তা আমরা ব্যারাকপুরেই খাবার খেয়ে ব্যয় করে ফেলেছি, আর তার নিকট অবশিষ্ট কিছু নাই। চব্বিশ

ঘণ্টাব্যাপী যাত্রার জন্য রাহা খরচ তিন আনায় কিরূপ সম্ভব জিজ্ঞাসা করায় বলল, সে কিছু জানে না। শুনেছি, তিন আনায় যে একজন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সারাদিনের খাওয়া চলে এ ধারণা ইংরেজের ছিল না, কিন্তু বাংলার এক মহারাজা লাট সভায় বলেছিলেন, একজন বাঙ্গালীর পক্ষে দৈনিক তিন আনার খোরাক যথেষ্ট। রাজার চেয়ে উচু নকল মহারাজা হতে গেলে এমনিভাবে স্বজাতিদ্রোহী হয়ে বৃটিশ প্রভুদের মনস্তুষ্টি করতে হয়। বাংলার অনেক বনেদী রাজা ও জমিদারদের এমনি লজ্জাস্কর ইতিহাসের অভাব নাই। আজও যাদের নামে রাস্তার নাম রয়েছে, তাদের অনেকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে ভারতকে বেঁধে দেবার জন্য ইংরেজকে সহায়তা করেছিল বা এদেশের শিল্প ধ্বংস করে বিদেশী মাল প্রচলন করেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তূপের উপর স্বাধীন ভারত গঠনে তারা চেষ্টা করেনি, শুধু বিদেশী শাসন ও শোষনে সহায়তা করে নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। তাই যারা দৈনিক শতাধিক টাকা নিজেদের জন্য ব্যয় করে, তাদের একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৈনিক তিন আনা খোরাক বলতে লজ্জা বোধ করে না। আর ইংরেজের অন্তঃকরণ ও এমনি যে এ কথা মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। সহবন্দী যোগেনদার দুই টাকা ক্যাপ্টেনের কাছে জমা ছিল, তিনি ওই টাকা খরচ করতে বললেন। উত্তর হ'ল, হুকুম নাই। হুকুম কি আমাদের উপবাসে রাখা। অনেক তর্কের পর সার্জন

যোগেনদার দুটী টাকা বার করে দিলে। ততক্ষণে আমরা চাঁদপুরে পৌঁছেছি। সানকীতে নাবিকদের রান্না ভাত ও মাছের ঝাল সালোন খেয়ে যে পরিতৃপ্তি পেয়ে ছিলাম, অতি বড় ভোজেও তা দুর্লভ।

ভোরের রাত্রি, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে ট্রেন চলেছে। ঘুমঘোরে আধ আচ্ছন্ন চোখে দেখছি, চাঁদের আলো যেন গলা রূপার মতন স্বপনের মায়া সৃষ্টি করেছে। দু চক্ষু ভরে সে অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করলাম। কাল এতক্ষণে রুদ্ধ সেলের বন্দী ছিলাম, চারিদিকে ছিল লোহা ও পাঁচিলে বদ্ধ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই অপরূপ পরিবর্তন। ক্রমে ভোর হল, রবির সোনালী রাঙা আলোয় চারিদিকে রঙে রঙে বিচিত্র হয়ে উঠল। ক্রমে পৌঁছিলাম চট্টগ্রাম। রাঙা মাটীর পথদিয়ে এসে পড়লাম জেলখানায়।

জেলা কারাগার প্রেসিডেন্সি জেলের মত বীভৎস লাগল না। একটা বড় বন্দীশালায় আমরা আবদ্ধ হলাম। সেখানে মাঝে মাঝে ইটের উচু পটি, শয়নের জন্য। আকাশ সেদিন মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল। সকাল যেন সন্ধ্যার মত মনে হ'ল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান এল,

'এসেছে এসেছে' উঠিতেছে এই গান
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।"

মানুষের মন এমনি, ইন্দ্রজালের কাঠির স্পর্শে নিমেষে সমস্ত

পরিবেশ যেন ওলট পালট হয়ে গেল। সুপ্ত কবিত্ব যেন মনের মধ্যে স্বপনে ভেসে উঠল।

নতুন স্থানের হাওয়া, জেলে হলেও মন্দ লাগল না। বিশেষ করে আমরা সাতভাই যে একত্রে ছিলাম, তাইতেই মনের আনন্দ। বালকের মত এক পটী থেকে আর এক পটীতে লাফাতে লাগলাম, গান করলাম, তর্ক করলাম, আলোচনা করলাম, স্ফূর্তির শেষ ছিল না। কাঁকর মিশ্রিত মোটা চালের ভাত, ডাল ও কলাগাছের বাকলের তরকারী, তাই লাগল যেন অমৃত। বৈকালে নিয়ে গেল পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট মিষ্টার ডিকসনের কাছে। ভদ্র ব্যবহার পেয়ে মনটা খুসী হ'ল। পুলিশের লোকের কাছে এটা দুষ্প্রাপ্য বলেই বোধ হয় যেখানে পাওয়া যায়, ভাল লাগে। নাম, ধাম, আঙ্গুলের ছাপ ফটো ইত্যাদি নিল ও হুকুম দিল কাল সকালে জাহাজে যেতে হবে, কুতুবদিয়া দ্বীপে নির্ব্বাসনে। ধরা পড়ার দিন হতে গোঁফ দাড়ী কামান হয়নি, বেশ গালপাট্টা গজিয়ে শিখদের মত দেখতে হয়েছিল, ভাবলাম, ফটোটা না জানি কি সুন্দরই হবে। বাড়ীতে দেখলে চিনতেই পারবে না, ভয় পেয়ে যাবে। ভাববে বুঝি কোনও শিখ সর্দার। প্রহরীর নজরে আমরা সহর ঘুরে বেড়ালাম। রাত্রে পুলিশ অফিসে ঘুমাবার স্থান পেলাম। রাত্রী যখন গভীর, চোখ যখন ঘুমে বুজে আসছে, মনে মনে, ভাবলাম, আমাদের কতভাই আন্দামানে নির্বাসনে গেছে, আমরা চলেছি কুতুবদিয়া দ্বীপে, অবশ্য কত দিনের জন্য জানি না!

কিন্তু তাদের ত্যাগ ও বীরত্বের মহিমার কাছে আমাদের কিছু তুলনা হয় কি ? তবু একই পথের পথিক, একই ভাবের ভাবুক। প্রচণ্ড সশস্ত্র বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান ? আমাদের সাধনা কি সফল হবে ! ভারত হবে কি স্বাধীন !

কাছের ঝোপ থেকে কোনও ফুলের মৃদু গন্ধ ভেসে আসছিল, একটা রাতের পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল, ক্রমশঃ ঘুমিয়ে পড়লাম।

কুতুবদিয়া দ্বীপে

"আমি পৃথিবীর শিশু, বসে আছি তব উপকূলে
শুনিতেছি ধ্বনি তব।' ভাবিতেছি বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তার, বোবার ইঙ্গিত ভাষা যেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝ খানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে।"

প্রাতে কর্ণফুলি নদীর বন্দর থেকে সমুদ্রগামী জাহাজ চলল ধীরে ধীরে মোহানার দিকে, সাগরের পানে। ডিফেন্স এক্টের বন্দী, আমরা কুড়িজন, বহু সিপাহী শান্ত্রি নিয়ে রওনা দিলাম। নদী যেখানে সাগরে মিশেছে, নদী জলের ঘোলা ও সাগরের সবুজে যেন একটা মিলনের রেখা পড়েছে। পূর্বে পুরীতে সমুদ্র দেখেছিলাম নীলাভ, আর এ দিকে সাগরের রঙ সবুজ। রেখার ওপারে অনন্ত বারিধি, তরঙ্গ নৃত্যে, কলরোলে চির দোদুল্যমান। প্রেসিডেন্সি জেলের ক্ষুদ্র সেলের প্রাচীর ও আঁধার

বেষ্টন হতে এই অপার সাগব বুকে প্রভাতের আলোকের ঝরণাধারায় মুক্তি, এ অজস্র আনন্দ, কেমন করে যে লুট পুটে ভোগ করে নোবো, যেন বোধশক্তি হারিয়ে গেল। আঁধারের মধ্য থেকে হঠাৎ অত্যুজ্বল আলোকে এলে চোখে যেমন ধাঁধাঁ লাগে! অনন্তের বুকে দুলতে লাগল আমার অন্তর। কি বিরাট! কি সুন্দর!

আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল, তবঙ্গে জাহাজের দোলানী লেগে অসুস্থতায় ও বমনের বেগে মাথা ঘুরতে লাগল। দেখি অনেকেরই অবস্থা আমার অনুরূপ। চক্ষু মুদে ডেকের উপর শুয়ে রহিলাম।

ক্রমে যখন জাহাজ সাগর ছেড়ে খালের মধ্যে প্রবেশ করল, সুস্থ হয়ে উঠলাম ও ক্ষুধা লাগল। তখন আমরা সাত ভাই মিলে চট্টগ্রাম নাবিকের রান্না গরম ভাত ও ফাউল কারি খেতে বসলাম। এর পূর্বে জীবনে কখনও মাংস খাইনি, তাই কেমন করে খেতে হয়, বাগিয়ে উঠতে পাবলাম না। শুধু ঝাল মেখে ভাত খাচ্ছিলাম। পাশে ছিল সুরেশ মৌলি, সে তখন নিজের প্লেট সাফ কবে ফেলেছে ও অবস্থা বুঝে আমার প্লেটের মাংসগুলাও তুলে নিয়ে খেয়ে ফেল্লে। হাসি ঠাট্টার মধ্যে খাওয়া শেষ হতে জাহাজ কুতুবদিয়া পৌঁছে গেল। দূরে দেখি আকাশ প্রদীপ সমুদ্র গর্ভে লুকানো চরা থেকে জাহাজ রক্ষার জন্য নিশানা দিতে দাঁড়িয়ে আছে! মনে ভাবলাম, সাগর বেষ্টিত দ্বীপে সমুদ্র উপকূলে বাস মন্দ

হবে না! প্রেসিডেন্সি জেলের বীভৎস সেল নিত্য অপমানকর ব্যবহার, সে তুলনায় এ যে অনেক ভাল।

জাহাজ ছেড়ে নৌকা করে তীরে অবতরণ করলাম, হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেল। মনে কিন্তু অসীম আনন্দ। কে বলে নির্বাসনে এসেছি! হেথায় সাগরে আনন্দ, হাওয়ায় মুক্তি, এ অভিনব! রবিন্সন ক্রুসের কথা মনে হ'ল। ভাবলাম, হয়ত এই দ্বীপটাই আমাদের ভবিষ্যত জীবনের কলোনি! মন্দ কি!

দ্বীপের ছোট হাট, সপ্তাহে দুদিন বসে, স্থানীয় জিনিষগুলো পাওয়া যায়। হাট বাজার ও রান্না, যোগেনদার আয়োজনে শেষ হল ও সকলে মিলে ভোজন করলাম, যেন পিক্নিক পার্টির মত লাগল।

বৈকালে আমার পেটের অসুখ করল। থানাতেই একটা ঘরে আমার শোবার বিছানা করে দিলে, ঔষধ দিলে, দারোগা বাবুর বাড়ী থেকে বালিশ এনে দিলে। এ সব পুলিশের কর্তব্য কি না জানি না, কিন্তু বসন্ত বাবুর যে দরদ ও উদ্বেগ লক্ষ্য করেছিলাম, সে ত দারোগার শুধু কর্তব্য নয়, তা হচ্ছে পরমাত্মীয় মানুষের। শুধু আচার পালন করে ও অন্যায় কর্মে বিতৃষ্ণা থাকে, এ রকম লোক জীবনে অনেক দেখেছি, কিন্তু বসন্ত বাবু শুধু ধর্ম ভীরু ছিলেন না, যা ভাল কাজ বলে বুঝতেন তা অন্তরের সঙ্গে করতেন। পুলিশে তাকে আধ পাগলা বলত। শুনেছি তার সততার জন্যই কোনও গুণগ্রাহী উচ্চ অফিসার তাঁকে দারোগার পদে উন্নীত করে দিয়েছিল

ও অন্যান্য পুলিশের লোক তাতে আশ্চর্য্য বোধ করেছিল, কি করে এই অর্ধ বিকৃত মস্তিষ্ক সরলসাধু লোকটা পুলিসে কাজ করছে।

দুই বন্ধুতে কথা কইছি, দেখি সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কার সাহেব। তিনি একটু হেসে ডেকে বললেন, জান না, পরস্পর কথা কওয়া আইনে নিষিদ্ধ? জিজ্ঞাসা করলাম, এই দ্বীপে পরস্পর কথা না বলে থাকতে পারি বলে মনে কর? তখন উত্তর দিলে, আচ্ছা, আমার সামনে পরস্পর আলাপ করো না। আমি জানালাম, পুলিশে না এসে তোমার স্কুল মাষ্টার হওয়া উচিত ছিল, তুমি এমন ভদ্রভাবে কথা কও। জানি না, এরা পুলিশের চাকুরীতে কর্ত্তব্য পালন করে, কিন্তু আমাদের মত দেশের স্বাধীনতাকামীদের নির্যাতনের অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার হতে কেউ মনের অন্তরালে নিজেকে অপরাধী বোধ করে কি না! জগতে স্বাধীনতার বাণী প্রচারে স্বাধীনতা-কামীদের আশ্রয়দানে বৃটিশ জাতি যেমন অতুলনীয়, ঠিক তেমনি জগতে জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তারে ও দুর্বল জাতির শোষণেও বৃটিশের তুলনা বিরল।

বিকালে দারোগা আমাদের নিয়ে চলল বাসাঘর দেখাতে। দলবেঁধে তার সঙ্গে মাটীর পথ দিয়ে হেটে চলেছি। ডাকঘর পেরুতে-ই কানে এল সমুদ্রের কলরোল, একটা সরু বাঁধের উপর উঠতেই দেখি সামনে অপার নীলাভ সবুজ সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে তীরে আছড়ে পড়ে আমাদের অভিবাদন

জানাচ্ছে। যেন বলছে তার কাছে থাকতে মনে আনন্দের অভাব হয় না। বালুর চর, উত্তরে ও দক্ষিনে সমুদ্রের তীর রেখার দু দিকে চলে গেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, তা ছাড়িয়ে তার ধারে ধারে চলেছে বাঁধ, তার গায়ে প্রায় শতহাত ব্যবধানে এক একটী ছেচা বেড়ার কুটীর, যেন মাটীর বুক আঁকড়ে রহেছে।

সমুদ্র চর দিয়ে যেতে যেতে চোখ ও মন কেবলই সমুদ্রের পানে চায়। বায়রণের কবিতা মনে আসে,

"Roll on thou dark deep blue ocean, roll"

অসীম জলরাশির তরঙ্গের উপর তরঙ্গ খেলা চলছে, তার বিরাম নেই।

কলিকাতা সহরের ছেলে, পাকা বাড়ীতে মানুষ হয়েছি, কিন্তু সহরকে ভালবাসতে পেরেছি কি? প্রকৃতির মাঝে ও কুটীরের একটীতে একলা থাকব ভেবে, মনে কিছু ভয় বা দুঃখ না হয়ে বরং লাগল একটু অভিনবত্ব। আমাদের কুটীরের সারীর দুই প্রান্তে দুটি গারদ ছিল, সেখানে থাকত হিন্দুস্থানী প্রহরীরা, বন্দুক নিয়ে পালা করে আমাদের পাহারা দিত। দ্বীপের অপর প্রান্তে যে খাল ছিল সেদিকে যাওয়ার নিষেধ ছিল, পাছে খাল সাঁতরে পলায়ন করি। আর সন্ধ্যা ছ'টার পর নিজ নিজ কুটীরে থাকতে হ'ত। কিন্তু এসব মানে কে? পরস্পর কথা কওয়া, এ ওর ঘরে যাওয়া, রাত্রে সমুদ্র চরে বেড়ান, কিছুই বাদ যেত না! প্রথম প্রথম প্রহরীরা

নিষেধ করে, পরে বলা নিষ্ফল দেখে আর আপত্তি করত না। তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল।

তাদের মন গলে যেত যখনই তাদের ঘর সংসার ও সুখ দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করতাম। বাড়ী থেকে কিছু বই এনেছিলাম। রাতে কুটিরের সামনে হারিকেনের আলোকে সে গুলি পড়তাম। মাঝে মাঝে দুই কুটিরের ব্যবধান ভূমিতে বাঁধের আড়ালে বসে কোনও বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতাম, নজর রাখতাম প্রহরী আসছে কি না। তার লণ্ঠন দেখলেই সভা ভঙ্গ করে যে যার কুটীরে এসে বই নিয়ে পড়তে বসতাম। যেন কোথাও যাইনি।

রাঁধা কাজে মন দিয়েছিলাম আর হাতও পেকেছিল বেশ। কিন্তু দিনের পর দিন দুবেলা রান্না করা বাঙ্গালী পুরুষের কি ধৈর্য থাকে! তাই কোনও দিন সাগু ভিজিয়ে কলা ও গুড় দিয়ে খেয়ে কাটিয়ে দিতাম। কখনও বা সকালের রাঁধা ভাতে দুবেলা চালিয়ে নিতাম। রান্না ঘরে উনুনের মধ্যে কাঠ সাজিয়ে, তলায় শুকনা পাতা দিয়ে আগুন ধরাতাম। বাঁশের একটা চোঙা ছিল, তাই দিয়ে প্রয়োজন হলে ফুঁ লাগাতাম। ধোঁয়ায় চোখ দুটা জ্বালা করত। স্বপাক রান্না, সংক্ষেপ করার জন্য, জল হাঁড়িতে চড়িয়ে চাল ঢেলে ও তার মধ্যে ডালের পুটলী, কুমড়া বা সব্জীর টুকরা ও গোটা পাঁচেক হাঁসের ডিম ছেড়ে দিতাম। এক পাকে হয়ে যেত। দুধ দই ও কলা ত থাকতই। এরূপ আহারে দিনে

দিনে শরীরে পুষ্টিলাভ হল কম নয়। তবু বুঝতাম, অন্নপূর্ণা স্ত্রী জাতির অভাব। খাওয়া হত বটে কিন্তু তাতে লক্ষ্মী শ্রী থাকত না। দরদী হাতে অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে কাছে বসে খাওয়ানর কেউ ছিল না। ঘরের সামনে পুরাতন শ্মশান ভূমি ছিল, বালীর মধ্য হতে মাথার খুলি, দু একটা হাড় বেড়িয়ে পড়ত। সেখানে বসে হয়ত কোনও এক বন্ধুর রান্না ভাত ভাগ করে খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি অদূরে প্রহরীর দোদুল্যমান লণ্ঠন, তৎক্ষণাৎ সব ফেলে যে যার কুটিরে ফিরে অপেক্ষা করে, প্রহরীর চলে যাওয়ার পর খাওয়া শেষ করতে এসে দেখি কুকুরে তা নিঃশেষ করে দিয়েছে। লোকে হয়ত ভাববে, কি কষ্ট! আমাদের কিন্তু কম আনন্দ হত না।

সেই নির্জন কুটীরে বেশী সময় কাটিত সমুদ্রের ও আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে! জলোচ্ছ্বাস, তরঙ্গ আছড়ে আছড়ে পড়ত বাঁধের উপর। দেখতাম, সমুদ্র জলে কখনও নীলাভ সবুজের মেলা, কখনও তার স্থানে স্থানে মেঘের ধূসর ছায়া, কখনও শান্ত স্থির জল টল টল করছে, কখনও সফেন তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত, কখনও মৃদু সুরে যেন ঘুমপাড়ানি গান গাইছে, কখনও বা প্রবল গর্জন চলেছে। ভাবতাম, এই যে রূপ, রঙের ও সুরের খেলা, এই যে অবিরাম নৃত্য, এ সকলের সার্থকতা কোন্ লীলার আনন্দে। মানুষের বিচারবুদ্ধিতে একি শক্তির বিরাট অপচয়! ভাবতাম, কৃত্রিম সভ্যতায় মানুষের এই

আনন্দ উপলব্ধির কি নিদারুণ অক্ষমতা! আমরা বিধাতাকেও বিচার করি।

সামনের ওই অসীম সাগর, মাথার উপরে ওই নীল আকাশ, প্রাণ জুড়ান বাতাস, তারা যেন আমার ক্ষুদ্র প্রবাসীর বন্ধু, নিকট আত্মীয়! মানুষ বন্ধুদের সহিত দেখা হত, কথা হ'ত, সে বা কতক্ষণ! জাগ্রত দিন রাতের অধিকাংশ সময় ত আমার কাটত ওই সমুদ্র আকাশ ও বাতাস নিয়ে। বিশ্ব সৃষ্টির একটা ধুলিকণাসম, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষ, সে কি করে আকাশ সমুদ্রের সঙ্গে অন্তরের যোগ অনুভব করে, কি করে আত্মীয়তার দাবী জানাতে চায়। দিনের পর দিন যায়, আমি মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকি, সে চাওয়ার শেষ নাই, তৃপ্তি নাই। উষার আলো যখন সাগর বুকে ছড়িয়ে পড়ত, আমি শিশুর মত বালুচরে ঢেউএর সাথে ছুটাছুটী খেলতাম। আকাশের মেঘ যখন সাগর বুকে কালো ছায়া ফেলত, চেয়ে দেখতাম সেই স্নিগ্ধ শোভা। সন্ধ্যায় যখন সোনার রঙের অস্তাচলে সাগর জলে সূর্য ডুব দিত, তার সে অস্তগামী রক্তবর্ণ রূপ চেয়ে চেয়ে দেখতাম, মেঘে মেঘে ছড়িয়ে যাওয়া রঙের শোভা দেখতাম, বসে বসে আমার ঘরের সমুখে উচু বালির বাঁধের উপর, আর মনে জাগত কবির নিরুদ্দেশ যাত্রার কথাগুলি,

"নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,

দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন,
গগন কোণে।”

যৌবনের সেই রঙিন স্বপ্নে ভেসে যাওয়া, মায়াময় সাগর বুকে, কোন অজানা জীবনসঙ্গিনীর সাথে, পশ্চিমে তপন ডুবে যাচ্ছে, আমি আকুল কণ্ঠে মিনতি জানাচ্ছি,

‘আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ু-ভরে তব
কেশের রাশি।
বিকলহৃদয় বিবশশরীর
কাঁদিয়া তোমারে কহিব অধীর—
“কোথা আছ ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি।”
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি॥

কাজকর্ম ছিল না যে পরিশ্রম করি, এমন বিশেষ বই ছিল না যে পড়ি, সঙ্গীরা থাকত দূরে দূরে, একা আমি, সাগর ও আকাশের সাথে দিনে দিনে মন যেন এক সুরে ঐক্যতানে বাঁধা

হয়ে গেল, আমার সে তরুণ মনের অবস্থা কেমন করে বোঝাব! কোনও নিশীথ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেত, কুটীরের বাহিরে আসতাম দেখতাম সাগর বুকের জলোচ্ছ্বাস, পশ্চিমাকাশে কালো মেঘে চাঁদের আধখানা ঢেকে আছে, মেঘের কিনারায় চন্দ্রালোকের রূপালী পার ঝলমল করছে, তারই প্রতিচ্ছবি পড়েছে সাগরের বুকে, নিবিড় কালো ছায়ার পাশে রূপালী আলোকে উদ্ভাসিত চঞ্চল নীর, মনে হ'ত যেন কোলাহলময় পৃথিবী হতে দূরে,—দূরে, এ কোন এক স্বপনের মায়াপুরী। কোনও অমাবস্যা রাত্রে সমুদ্র চরে পাগলেব মত পায়চারী করতাম, উপরে আকাশে কত গ্রহ নক্ষত্র জ্বলত, নীচে সাগর বুকের ঢেউগুলার চুড়ার সারীতে নীলাভ আলোকমালা নিয়ে নাচতে নাচতে কুলে আছড়ে পড়ত। পায়ে চলার চাপে ভিজা বালীতে অসংখ্য কীটানু আলোককণা বিকীরণ করত, সেই গভীর অন্ধকারে নিজেকে পৃথক মনে হত না, পাগলের মত একা বেড়াতাম আর ভাবতাম, প্রকৃতির কোটি কোটি সন্তানের আমিও একটি অভিন্ন অংশ। অসভ্য, আদিম আমার অন্তর! কোথায় মানুষ, কোথা তার লোকালয়, সভ্যতা! সমুদ্র তীরে গভীর অন্ধকারে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আসত একত্বের নিবিড় এক বিচিত্র অনুভূতি।

কুটিরে মশারীর মধ্যে ঘুমাচ্ছিলাম, হঠাৎ জেগে উঠে শুনি ভীষণ সন্ সন্ আওয়াজ। মশারীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বালুকণা ঢুকে আমার গায়ে বিঁধছে। প্রথম একটু হতবুদ্ধি হয়ে পরে বুঝলাম, এ কালবৈশাখী! প্রবেশ পথে দেখি কপাট নাই,

বাহির হতে গিয়ে মনে হল যেন মাথাটা গলা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে যাবে। নীচু হয়ে খুজে দেখলাম, দরজাটা বারান্দায় আটকে আছে। সেটা অনেক কষ্টে টেনে এনে বন্ধ করতে যাচ্ছি, দৃষ্টি পড়ল, সম্মুখে সমুদ্র পানে। সে কি ভীষণ, কি বিরাট দৃশ্য। বাইরে ওই কালবৈশাখীতে মেতে তরঙ্গের পর তরঙ্গের সেই ধাবমান জলরাশি ছুটে আসছে তীরের পানে, তাদের মাথায় মাথায় জ্বলছে নীলাভ আলোর মালা। একা আমি, মনে ভয় এল না, তাণ্ডব নৃত্যে আদিম অন্তরে যেন দোলা লাগল। তা'র মধ্যেও মনে কবিব গান জেগে উঠল,

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশসম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।

সারা রাত্রি কালবৈশাখী ও সাগরে মাতামাতি চলল। নির্জন কুটীরে একা আমি, চারিদিকে গভীর অন্ধকার ও প্রলয়ের গর্জন। দরজাটা বন্ধ করেছিলাম। ঝড়ের বেগে কুটীর দুলছিল, মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তে ভেঙ্গে উড়ে যেতে পারে, শয়নের তক্তাপোষটা খাড়া করে বেড়ার গায়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যদি চালা ভেঙ্গে পড়ে, তক্তাপোষের

নিচে থাকলে চাপা পড়ার আঘাত থেকে বাঁচব। যে কোনও মুহূর্ত্তে আশ্রয় হারা হতে পারি।

ক্রমে সকাল হল, ঝড়ের বেগ কমল। বেরিয়ে দেখি, সমুদ্র যেন ক্লান্ত, শ্রান্ত। কোথায় জাহাজ ডুবি হয়েছে, একখানা প্রকাণ্ড ডেকের কাঠ ভেসে এসেছে। আমার রান্না ঘরের খানিকটা উড়ে গেছে। হাটবাজারের স্থানে সব চালা সাফ হয়ে গেছে। খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা ও কষ্টে দিন কাটল, কিন্তু মনে আনন্দ কম ছিল না এই অভিজ্ঞতার অভিনবত্বে।

গ্রীষ্মের রুদ্র তেজ পরাভব করে কুতুবদিয়ায় বরষা এল। সারা আকাশ ছেয়ে গেল ঢেউ খেলান কালো মেঘে। মনে আমার কবির গান জেগে উঠল,

> "আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু,
> ডমরু রব হয়েছে ওই সুরু ॥

সমুদ্রের কলরোল, ঝড়ো হাওয়ার শব্দ ও মেঘ গর্জনের ধ্বনি, এ তিনে মিলে বিশ্ব প্রকৃতির নৃত্যচ্ছন্দে এক ঐক্যতান।

আমার কুটীরের পিছন দিকে ছিল ধানের ক্ষেত। চাষীরা চাষের কাজে লেগে গেল। গ্রামের কয়েকটী ছেলেমেয়ে আমার কাছে পড়তে আসত, পুলিস আপত্তি করত না।

মন একদিকে স্নেহ, ভালবাসা পেতে চায়, অপর দিকে সে পাত্র খোঁজে দেবার জন্য. আদান প্রদান বিনা তার তৃপ্তি নাই। কবি যেমন গানে বলে গেছেন,

"হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়।
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার,
যা কিছু সঞ্চয়।।

মানুষের স্নেহপ্রবৃত্তি আশ্রয় খোঁজে। ছোট ছাত্রগুলিকে পেয়ে তাই পড়াতে অত ভাল লাগত। বড়টী, জন্নু মিয়া, পড়ায় ছুটী নিয়ে চাষের কাজে যোগ দিলে। চাষীর ছেলেমেয়েরা এ সময় সকলেই কাজ করে। দেখতে দেখতে ক্ষেতের মাটি শ্যামল শ্রীতে ঢেকে গেল। সহবন্দী বন্ধু, যোগেনদা, ব্রজেন ও আমি, তিন জনে এক মৌলভি রেখে উর্দ্দু পড়তে সুরু করলাম। প্রতি প্রাতে, বই খাতা নিয়ে প্রায় এক মাইল দূরে, সমুখের চর দিয়ে যোগেনদার ঘরে পাঠশালায় যেতাম ও ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত। একদিন তিন বন্ধুতে পড়ছি, খস্ খস্ করে আওয়াজ শুনে দেখি চালের দরমার ফাঁকে ফাঁকে সর্পের মসৃন সাদায় কালোয় ডোরাকাটা অঙ্গ। যোগেনদা একটা ছুচলো মুখ লাঠি দিয়ে খোঁচা মারল। সাপটা বাঁখারীতে ল্যাজ জড়িয়ে ঝুলে পড়ল ও ভীষণ ফণা বিস্তার করে দুলে দুলে আমাদের দিকে লক্ষ্য করে গর্জন করতে লাগল। কী ভীষণ প্রকাণ্ড গোখরো! আমি আর ব্রজেন লাফ দিয়ে দরজার কাছে পালিয়ে এলাম। কিন্তু যোগেনদা, ধীর সাহসের সহিত, সাপের ফণা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে মারলে সেই লাঠি। সে মার অব্যর্থ হল, সাপটা মাটীতে পড়ে গেল ও তৎক্ষণাৎ ল্যাজে ভর দিয়ে গর্জে ছোবল

মারতে লাফিয়ে উঠল, যোগেনদাও পুনর্বার লাঠী মারলেন সাপটার মাথায়। তখন সেটা পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারল না। আমি ও ব্রজেন সাহস করে মোটা চেলা কাঠ দিয়ে সেটাকে পিটে মেরে ফেললাম।

বৈকালে বিষণ্ণ মুখে দারোগা বসন্তবাবু এসে বললেন তাঁর এক বাল্যকালের বন্ধুকে কলকাতায় স্বদেশীরা গুলি করে মেরে ফেলেছে; নাম, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, আই বির ডেপুটি কমিশনার।

মানুষের মৃত্যু সংবাদে দুঃখ হওয়াই উচিত, কিন্তু তবু আনন্দে মন ভরে গেল। তার মতন পুলিশ অফিসার আমাদের বিপ্লবী বন্ধুদের প্রতি কত অত্যাচার ও কারুর মৃত্যুর কারণ হয়েছে, কত পিতা, কত বিধবা মাতা সন্তানহারা হয়ে অশ্রুজল ফেলেছে, আমাদের বিপ্লবী দলের কিরূপ সর্বনাশের চেষ্টা করেছে, দেশের স্বাধীনতার সাধনায় অন্তরায়, দেশের শত্রু, সেই একজন আজ তাহলে মরেছে। যোগেনদা মুখখানা যথাসম্ভব দুঃখিত দেখিয়ে বললেন, আহা! ব্রজেন বললে আহা! আমি বললাম আহা! আড়ালে হাসি চাপতে পারি না। বসন্ত দারোগা এমন সরল; তিনিও আহা বলে চোখ মুছলেন।

মরা সাপটাকে বসন্ত চাটুজ্যের মৃত দেহের প্রতীক বলে একটা লাঠিতে ঝোলান হল ও দুপাশে কাঁধে নিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বললাম, একটা খবর দেবো, ক টাকা চাঁদা দিবি বল, শুনলে খুব খুসি হবি। ভোজের জন্য একটা খাসি কেনা হল, সেটা দেখতে ঠিক হরিণের মত, বিশেষ তার চোখ

দুটো ও গায়েব রং বড় সুন্দর। আমরা যে তাকে খাবো, না বুঝে সেটা আমাদের হাতে খেতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে তাব উপব মায়া জন্মে গেল ও মৎলব হ'ল, না মেবে সেটা পোষা যাক। তখন বুঝলাম, খাসী হলে কি হয়, ওটা পেটে পেটে বুদ্ধি ধরে।

যোগেনদা ফ্রেঞ্চ ক্লাশ খুলল, কলকাতা থেকে প্রাইমাবী বই আনিয়ে পড়তে সুরু করলাম।

আর একদিন ব্রজেনের ঘরে বৈকালে গিয়ে অসুস্থ শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছি, যোগেনদা ও ব্রজেন দুজনে ফ্রেঞ্চ পড়ছে, হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বললে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারোজ সাহেব এসে পড়েছে, তক্তাপোষেব নীচে লুকো। এক ঘবে থাকা বা মেলামেশা কবা আইনতঃ অপরাধ বলে গণ্য হত। আমি আব যোগেনদা ত হামা দিয়ে তক্তাব নীচে ঢুকলাম, একটা বোতল ছিল, মাটীর মেঝেতে তেল গড়িয়ে যোগেনদার উদরদেশে যে অপরূপ শোভা ধাবণ কবল তা দেখবাব মত। ওদিকে ব্রজেন বৈকালে গুডমর্নিং করে বসল আর যোগেনদা খুক খুক শব্দ করে হাসি চাপতে চেষ্টা কবতে লাগল। ব্যারোজ সাহেব দু একটা কথা বলে দাবোগা ও প্রহরীদের সঙ্গে চলে গেল। যোগেনদা ও আমি কুটীরেব পিছন দিক দিয়ে চলে এলাম নিজ নিজ ঘরে ও শান্ত বালকের মত বসে পুস্তক পাঠে মন দিলাম। যেন কেউ কারুর সঙ্গে মেলামেশা করি না।

একদিন যোগেনদার ঘরে ঘুমাচ্ছি, হঠাৎ বুকে শীতল কি একটা যেন নড়ছে অনুভব করে ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি যোগেনদা একটা সাপের মুণ্ড চেপে ধরে আমার বুকের উপর তার সর্বাঙ্গ খেলাচ্ছেন। আমার হাতের ঝটকায় সাপটা তাঁর হাত ফস্কে ছিটকে মেঝের উপর পড়ে পলায়ন করল। হেসে বললেন, তোমার মুখের অবস্থাটা কিরকম হ'ল, ক্যামেরা থাকলে একটা ফটো রাখতাম। যোগেনদার এরকম দুষ্টবুদ্ধি প্রায়ই জাগত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমার বন্দী জীবনে ও পরেও অনেক সময়ই তাঁর সঙ্গ পেয়েছি ও তাঁর স্নেহ ও যত্নের অভাব কখনও দেখিনি. আর আমারও চির-স্নেহাতুর স্বভাব কম প্রশ্রয় পায়নি। জীবনে সকল অবস্থায়ই, কেউ না কেউ দরদী দেখবার লোক থাকা, এটা একরকম ভাগ্য বলে মানতে হবে। ভাবি, ভগবান যদি কোথাও থাকে ত তার স্থান মানুষের মনে। স্বার্থ ও সংস্কারের গাঁথা পাথরের প্রাচীর দিয়ে বন্দী করে তাকে দেখতে পাই না। খুঁজে মরি শূন্যে।

আর একটা মজার ঘটনা ঘটল। খোকা অর্থাৎ কালী দত্ত, থাকত ১৪ নম্বর কুটীরে, আমার ছিল ১১ নম্বর। নিজের রান্না বন্ধ করে তার রান্নাঘরে দুজনে রাঁধতে বসেছি, এমন সময় দেখি প্রহরী একেবারে সেই রান্নাঘরের দোরে। একত্রে থাকা নিয়ম

কলিকাতা বহুবাজার দুর্গা পিথুরী লেনের শ্রীকালীচরণ দত্ত, যাদবপুর কলেজে ইনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রফেসর ও তৎপরে ব্যবসায়ী হন।

বিরুদ্ধ ও সে রিপোর্ট করবে বলে তাকে আপ্যায়িত করতে দরদ দেখিয়ে বললাম, ঘরমে কোন হ্যায়, সাধি ভৈল ক্যা ন্যহি, কতনা তংখা, হাটমে ক্যা মিলা, ইত্যাদি সমবেদনার কথা। তারও মন একটু কোমল হল আর দেহাতের জন্য শোক উথলে উঠল। তার বাড়ীতে কত ভৈঁস আছে আর এখানে খাবার জিনিষ কিছুই পাওয়া যায় না, জঙ্গলী দেশ, ইত্যাদি কথা বলতে লাগল। সেদিন হাটে এক কাঁদি কলা কিনেছিলাম! তাকে বললাম, কলা খায়গা আর খোকাকে বললাম কাটারিটা এনে এক ছড়া কলা কেটে দিতে, তাকে দোবো বলে। বুঝলাম না, হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। আমি আশ্বস্ত করতে তার কাঁধ ধরে বললাম ক্যা, হুয়া, ডরতে কাহে, বলেই বন্ধুকে পুনরায় কলা কেটে দিতে তাগিদ দিলাম। তখন প্রহরী চক্ষু তারকা কপালে তুলে কাঁপতে কাঁপতে কাঁধে বন্দুক নিয়ে লম্বা পা ফেলে মারলে দৌড়। আমি খোকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল বল দেখি? সে বলল, কি জানি! চিন্তিত মনে নিজ কুটীরে ফিরে এসে লণ্ঠনের আলোকে বই পড়ছি, বড় জমাদার এল ও আমায় বললে, আমি তার সিপাহীর গলা কাটতে গেছলাম। তখন সমস্ত ব্যাপার খুলে বললাম, কাটারীতে গলা নয় কলা কেটে দিতে চেয়েছিলাম, সে তখন ব্যাপার বুঝে হাসতে লাগল ও তখনই সে তার সেপাহীকে ধরে আনলে আর কলার কথা বুঝিয়ে দিলে। সে বুঝল বলে মনে হ'ল না। খুন করতে চেয়েছি, রিপোর্ট হলে কি হত জানি না, যাহোক

সে বিপদ কেটে গেল ও সেই থেকে প্রহরীটী আমার বাধ্য হয়ে গেল।

একদিন আমি আর একজনের সঙ্গে আলাপ করছিলাম, এমন সময় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এসে আমাদের তুজনকে একত্র দেখে ফেলেছিল। সেই সিপাহী আমাব পরিবর্তে অপর এক বন্ধুর নাম কবে দিল। সে কেন আমার বন্ধুর নামে মিথ্যা রিপোর্ট দিলে, জিজ্ঞাসা করায়, সে বললে, সাহেব তুজনকে দেখেছিল, তুটা নাম না দিলে তাব নোকরী বাঁচে কি করে আর আমার মত মহৎ লোকেব নাম কি করে দেয়। সমস্যা বটে! এবকম করতে নিষেধ করে দিলাম, সে বুঝল কিনা সেই জানে।

কুতুবদিয়ায় শ্রাবণের ধারা অশ্রান্তভাবে ঝরতে লাগল। আমার কুটীরে বসে বসে দেখতাম, তরঙ্গে তরঙ্গে দোলা সাগববুকে অবিরত ঝরধার নৃত্য, পিছনে ধানের ক্ষেতে বাদল হাওয়ায় শ্যামলের নৃত্য, বাঁধের স্থানে স্থানে বালির উপরেও সবুজের অভিযান।

গভীর রাতে আকাশের পানে চেয়ে গাইতাম

“আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে!”

আকুল অন্তর, সে কাকে চাইত, সে কে আসত আমার মনের দুয়ারে ?

কতকাল এ দ্বীপে থাকতে হবে জানবার উপায় ছিল না যদিই বা চিরকাল থাকতে হয়, ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি বেশ সহজ ভাবে মনে এঁকে নিয়েছিলাম।

বাবা ও মেজদা সরকারী হুকুম নিয়ে দেখা করতে এলেন। জলপথে তাঁদের সমুদ্রপীড়ায় ভুগতে হয়েছিল খুব আর তার চেয়ে বেশী ভুগেছিল কর্দমাক্ত পথে চলতে। সহরের লোক, অভ্যাস নাই, সেই এঁটেল মাটির পথ এমন পিচ্ছিল, পা রাখা যায় না। দুপাশে লোকের হাত ধরে কোনও রকমে তাঁরা এলেন। পুরাতন দারোগা বদলি হয়ে তখন নতুন বসন্ত গুহ এসেছেন। ইনিও খুব ভদ্র ও ভাল। আমার বাবা ও মেজদার প্রতি ব্যবহারে শুধু সৌজন্য নয়, যে আন্তরিক সহানুভূতি ছিল তা নজর বন্দীর পিতা ও ভ্রাতার প্রতি সমবেদনায় ভরা।

বহু দিন পরে বাবা ও দাদার সহিত মিলনে, শুধু আমার নয়, সকল বন্ধুদের আনন্দে তিন দিন কাটল. তাঁরা যেন সবার আত্মীয়। সঙ্গে অনেক ল্যাংড়া আম ও সন্দেশ এনেছিলেন, দারোগাবাবু অবধি সকলে মিলে ভাগ করে খাওয়া হ'ল। প্রহরীরাও কিছু কিছু ভাগে বঞ্চিত হল না।

এরই কিছুদিন পরে সরকারী হুকুম এল, আমাদের কয়েক জনকে কলকাতায় যেতে হবে। কলকাতায় আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, আমার আত্মীয় স্বজন থাকে কলকাতায়, তথাপি এই

সংবাদে আমাব মন আদৌ খুসী হ'ল না। আমায় নিয়ে যাচ্ছে, মুক্তির জন্য যে নয়, আবার কোন মন্দ উদ্দেশ্যে, তা বুঝেছিলাম। কুতুবদিয়ায় নির্বাসনে অনেকটা একা থাকতে হ'ত, কিন্তু মুক্ত প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে মনেব আনন্দেই ছিলাম। শুধু মাঝে মাঝে বাবা, বাড়ীর লোক ও বন্ধুবান্ধবের অদর্শনে একটু দুঃখ হ'ত আর যে কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলাম, দেশের মুক্তি, বন্দী অবস্থায় তার কিছু আব কবতে পাবছি না. ইউরোপীয় মহাসমবের সুযোগ বয়ে যাচ্ছে, ভারত হয়ত স্বাধীন হ'ল না, এর জন্য মাঝে মাঝে মন অস্থির হ'ত। কুতুবদিয়ায় সাপ, শ্মশান, খাদ্যাভাব, সাইক্লোন ইত্যাদি শাবীবিক কষ্টের কাবণ কম ছিল না, কিন্তু সমস্ত পুরিয়ে মনে আনন্দ উপচে পড়ত, অন্তরে সমুদ্র ও আকাশের নিবিড় সংস্পর্শে। ভাঁটার সময় যখন প্রবাল দ্বীপগুলি জেগে উঠত, সাঁতবে সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়ে উঠতাম। বালুচবে টকটকে লাল কাঁকড়াগুলা যেন অসংখ্য শালুক ফুলের মত শোভা পেত, ছুটে গেলে সরু সরু গর্তে বালির মধ্যে সেগুলা ঢুকে যেত, একা এই ছুটাছুটী খেলা কত ভাল লাগত, রাতে ভিজা বালিতে দেখতাম চিংড়ির বাচ্ছার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, জোনাকীর মত আলো দিচ্ছে, তরঙ্গ গুলো নাচতে নাচতে আসছে, আছড়ে পড়ছে, ফিবে যাচ্ছে, ধানের ক্ষেতে চাষাদের গান ভেসে আসত, ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত। এ সব যেন পরস্পর সুরে বাঁধা, তাই নিয়ে আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছিল, আবার নূতন কোথা

যেতে হবে, কে জানে! বন্ধুগণ, যাদের ছেড়ে এলাম, সাশ্রু-হাসিতে তাদের নিকট বিদায় নিয়ে, দারোগাবাবুর বন্ধুর মত ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, সিপাহী জমাদার সকলের কাছে রাম রাম বলে জাহাজঘাটে এলাম। ছাত্রগুলি বুকের কাছে মাথা রেখে বিদায় নিলে, বড়টী কেঁদে ফেল্লে।

যে তেঠ্যাঙা কুকুরটা আমার কুটীরের কাছে থাকত ও নিত্য আমার ভুক্তাবশেষটুকু আহার করত, সেটাও দেখি জাহাজঘাটায় এসে আমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। সেও যেন বুঝতে পেরেছে, আমি চলে যাব। তার আবার নতুন কোনও ঘরে অতিথি হতে হবে। আবার কোন অজানা স্থানে নিয়ে চলেছে! জাহাজ ছাড়ল। বিদায়ক্ষণে কুতুবদিয়া বড় করুণ, বড় মনোরম দেখাতে লাগল। সীমান্তে দ্বীপটীর ক্ষীণ তটরেখা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে গেল, তখনও দেখা যাচ্ছে দূরে লাইট হাউস, বা বাতিঘরের চূড়া।

বাঁকুড়া

আমায় ও শরৎ গুহকে নিয়ে এল কলিকাতায় দালান্দা বিলডিংএ এক পুলিশ অফিসারের কাছে ও আমাদের দুইজনকে ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এক্টের অন্তরীণ আইন থেকে মুক্তি দিয়ে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে বন্দী করল ও হুকুম হল বাঁকুড়া জেলে যেতে। দুজন রক্ষী সেপাহী সমেত আমরা দুভাই চলেছি হাওড়া ষ্টেশনের দিকে, শরৎদাকে বললাম ৩নং রেগুলেসন হল রাজরাজরাদের জন্য, বাংলায় বলে

রাজবন্দী, কাজেই উচ্চ সম্মানিত পদ প্রাপ্তি হল, কিন্তু থাকতে হবে কারাপ্রাচীরের মধ্যে! আরও শুনলাম, ভীষণ বিপ্লবী মনে করে বলেই, সরকার আমাদের বাছাই করে রাজবন্দী করসে। পথে কলেজের এক পুরাতন সহপাঠীর সহিত দেখা হতে তাকে ডেকে বলে দিলাম, বাড়ীতে সংবাদ দিতে, যেন হাওড়া ষ্টেশনে কেউ দেখা করে। বাবা বাড়ী ছিলেন না। দাদারা এসে দেখা করে গেল। তাদের নিকট হাসিমুখে বিদায় নিলাম। ট্রেন ষ্টেশন ছেড়ে চলল! বাইরে রাত্রির ঘন অন্ধকার, মনের ভিতরও অজানা আঁধার ভবিষ্যৎ। দেশের তরে আমাদের এই কারাবরণের জন্য ভারত স্বাধীনতার পথে এগুচ্ছে কি? একি সবই বৃথা যাবে? ভোরে বাঁকুড়া পৌঁছিলাম। জেলের পথে হেঁটে চলেছি, গাড়ীর চেয়ে হাঁটা ভাল ও যতক্ষণ পারা যায় বাইরে কাটান যাক। জেলের কাছে আসতে জমাদার আমাদের হাতে হাতকড়া লাগাতে চাইল। দৃঢ় আপত্তি করায় কলহ বেঁধে উঠল। একটী লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, গোলমাল দেখে বললে, জেলে যাচ্ছেন, হাতকড়া লাগাতে আপত্তি করলে চলবে কেন! লোকটা কে জিজ্ঞাসা করায়, সগর্বে উত্তর করল, সে স্থানীয় পুলিস সাব ইন্সপেক্টর। ভয় পেয়ে যাব ভেবে, সে সিপাইদের হুকুম করলে, সোজা ভাবে যদি হাতকড়া না লাগাতে দেয়, জোর করে লাগাতে।

তিন নম্বর রেগুলেশনে ষ্টেট প্রিজনার কি জানেন। বলতে চোখ ঘুরিয়ে, খুব জানি বলে, সিপাহীকে জবরদস্তি হাতকড়া লাগাতে

হুকুম করলে। সেপাইরা আমার হাত ধরতেই যখন তাব পাছায় লাথী মারতে গেলাম, লোকটা ছুটে পালাল। জী হুজুব নকরী জায়গা, বলতে বলতে সেপাহী দুজন আমাদের কাকুতি মিনতি করতে করতে জেল ফটকে উপস্থিত হল।

জেলে প্রবেশ করে মনে মনে বললাম,

এ দাড়ির দেশে,

বিদেশী নামিনু এসে!

বুড়া জেলারের দীর্ঘ কাঁচাপাকা দাড়ি, ফোকলা মুখে একটু হেসে খাতির করে বললে, 'আসুন দাদাভায়েরা আসুন। ইউরোপীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল, দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি, যেন পাদ্রী সাহেব। ফাঁসির আসামী রাখা হয়, এমন দুটী সেলে দুজনের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল, তাও পাশাপাশি নয়, দূরে দূরে। পরস্পর কথা বলার সম্ভাবনা রইল না, শুধু জানলাম, শরৎদা ও আমি দুটীতে এই জেলে আছি আব এই জানাটাই যা স্বান্তনা!

কুতুবদিয়ায় ছয় মাস সমুদ্রতীরে মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে বসবাসের পর হঠাৎ এই দেওয়ালঘেরা অতি ক্ষুদ্র সেলে বন্দী দশায় মন অস্থির হয়ে উঠত। প্রাতে ও বৈকালে মাত্র আধ ঘণ্টা করে সমুখে পথে পায়চারী করতে দিত। অবশিষ্ট সব সময় সেলে বন্ধ থাকতে হ'ত। বন্দী পাখী পিঞ্জরের লোহার উপর ঠুকরে ঠুকরে যেমন নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করে. আমার অন্তরাত্মারও হত সেই দশা। উপায় কি? জেলার,

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সকলেরই কথায় কৃত্রিম সৌজন্য। কিন্তু খেতে দিত প্রাতে একটু লপ্সি ও দুধ চিনি নাই বললেই হয়, এমন আধ মগ চা। দুপুরে দিত অল্প ভাত, একটু ডাল ও সামান্য বেগুনের তরকারী, সন্ধ্যায় তিনখানি পাতলা ছোট রুটী ও বেগুনের এতটুকু তরকারী। আধ পেটাও খাওয়া হ'ত না। জেলারকে খাদ্য বিষয়ে জানালে বলত, দাদাভাই, আলু এ দেশে পাওয়া যায় না, মাছ, ডিম, এ সব কোথায় পাব, চিনির দাম বড় বেশী. বলত কিন্তু দাড়ির ফাঁকে এমন মিষ্টি হেসে যে চিনির অভাব পুরে যেত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টটীও অদ্ভুত জীব। বললেও কিছু করে না. শুধু হেসে চলে যেত।

ক্ষুধায় যখন অস্থির হতাম, বাড়ীর কথা মনে আসত। ধনীর ঘরে জন্মাইনি। খাওয়া ছিল সবল। মনে পড়ে, ছোট্ট রান্না ঘরে একধারে খেতে বসেছি, অপর দিকে মা আটার রুটী বেলে নিয়ে চাটুতে সেঁকে আগুনে ফুলিয়ে পাতে ফেলে দিচ্ছেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ীতে যে পুরোনো ঝি ছিল, সে ছেলের মত স্নেহাদরে খাওয়াত। যত্নের কখনও অভাব পাইনি। ভাত ডাল রুটী ও দুধ যথেষ্ঠ খেতাম। কখনও চেয়ে খাইনি বলে; খাওয়ার বিষয় লজ্জায় নালিশ করতে পারতাম না।

মনে জানতাম, আমাদের জন্য যা ব্যয়বরাদ্দ, সবই যাচ্ছে জেলারের পকেটে। শরৎবাবু নালিশ করতে বসবার জন্য একখানা টুল দিল আর প্রাতরাশের জন্য লপ্সির বদলে পাউরুটীর

টুকরা দিতে সুরু করল। বাড়ী থেকে কয়েকটি কাপড়জামা আনালাম।

শারীরিক শ্রমের অভাবে ও কম খেয়ে ক্ষুধা লোপ পেতে লাগল। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাতে ঘুম হ'ত না, চোখ দুটী হয়ে থাকত প্রায়ই রক্তাভ। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার বহু শিশি ব্রোমাইড ও আরসেনিক মিক্সার খাওয়াল। কর্ণ রোগের জন্য এক কয়েদী কমপাউণ্ডার কানে ওষুধ ঢেলে দিতে এল। মাটীতে এক ফোঁটা পড়তে কালো হয়ে গেল। দেখে বুঝলাম কষ্টীক। কানে ঢালতে দিলাম না, নচেৎ কালা হয়ে যেতাম। কথা কইবার কেউ ছিল না, প্রহরী কথা কইতে ভয় পেত, জেলার দেখলে সাজা হয়ে যাবে। এমনি দিনের পর রাত, রাতের পর দিন একটু একটু করে সময় ধীরে ধীরে কাটতে লাগল। শারীরিক কষ্ট, খাদ্যের অভাব, এ সব সইতে পারতাম কিন্তু মানসিক কষ্ট, একলা থাকায় অসহনীয় লাগত। যদি কিছু কাজ থাকত! লোকে ভাবে পরিশ্রম করতে কষ্ট লাগে, কিন্তু জবরদস্তি আলস্যে যে কি কষ্ট তা তারা বোঝে না। যথেষ্ঠ পরিশ্রম যে মানুষের ভগবানদত্ত অধিকার! বিকৃত সমাজ ব্যবস্থায় ধনীরা যে আলস্য ও বিলাসিতায় দিন কাটাবার চেষ্টা করে, হজমি খেয়ে খাদ্য হজম করে ওষুধের প্রভাবে ঘুমায়, সেই সকল অলস ধনীর দুঃখ গরীবের দুঃখের চেয়ে কম নয়। এ যে কত বড় অভিশাপ, তা হয়ত নিষ্কর্মা বন্দী অবস্থা না হলে বোঝা দুষ্কর। মনে

পড়ে স্নেহময় পিতার চোখ দুটী, মনে পড়ে ভাই বোন আত্মীয় বন্ধুদের কথা, মনে পড়ে কুতুবদিয়া দ্বীপের অপার সাগর তীরে উন্মুক্ত আকাশের তলে মুক্ত প্রকৃতির অন্তরঙ্গতা, মনে পড়ে সেখানের ছাত্রছাত্রীদের তরুণ মুখগুলি। ভেবে ভেবে ক্লান্ত মন যখন, অবসন্ন হয়ে পড়ত এই চিন্তাগুলিই ছিল অবলম্বন, যার জন্য মন ভেঙ্গে পড়ত না।

একটা ক্ষুদ্র পেনসিল ও কিছু কাগজ জুটেছিল। যে কয়েদী খাবার দিত, সে এনে দিল। তার ত কোন স্বার্থ ছিল না, বরং ধরা পড়লে সাজা হয়ে যেত। সেই অশিক্ষিত সমাজ পরিত্যক্ত কয়েদীর এইটুকু সহানুভূতি, কত ভাল লাগত। সামান্য কাগজে কবিতা লিখে লিখে মনের বেদনা ঢেলে দিতাম। একমাত্র দরদী পাঠকবন্ধু, সহবন্দী, শরৎদাকে সেগুলা কয়েদীর হাত দিয়ে পাঠাতাম ও তার কাছে প্রশংসা পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠতাম। আকাশের নীলিমার পানে চেয়ে চেয়ে ভাবতাম, পাখীর মত যদি উড়ে যেতে পারতাম, কবির কথা মনে হত,

> 'সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
> বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি,
> কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
> সে কথা সে যাই পাসরি।'

পূর্বে দার্জিলিঙ গেছি অনেকবার, হিমালয়ের বিরাট মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে মনে কত বিস্ময় লাগত! পুরীতে কুতুবদিয়ায়

সমুদ্র দেখেছি, তার অসীম বুকে তরঙ্গোচ্ছাসের দিকে চেয়ে চেয়ে অবাক হয়ে গেছি; কত অবারিত প্রান্তরের পানে বিরাট রূপ দেখেছি। আজ তারা কেউ চোখের সম্মুখে নাই. আছে শুধু মাথার উপর নীল আকাশ। সেলটি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তিন দিক সম্পূর্ণ বন্ধ, সম্মুখে খোলা জায়গায় একটা কতকালের অশত্থ গাছ, যেন নিষ্কাম নির্লিপ্ত মনে পাতায় পাতায় আকাশের পানে সহস্র মুখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক করে সেপাইকে রাজী করিয়ে দুপুরে সেই গাছ তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতাম আর চেয়ে থাকতাম শরৎকালের আকাশের নীলিমার পানে। মনে মনে বলতাম, আজ সবই ত হারিয়েছি, কিন্তু চির পুরাতন বন্ধু আকাশকে হারাইনি, যেখানেই যাই, সে সাথে আছে। হোক চারিদিক প্রাচীর ঘেরা, মাথার উপরে আকাশ সঙ্গে আছে, সান্ত্বনা দিতে। অবজ্ঞাত বন্ধুর মত সে আমার অন্তরে ফিরে এসে ডাক দিল। তাকে নিবিড় ভাবে বুকে পেলাম। মনে আছে কাগজে লিখেছিলাম, অকবির কবিত্বে,

কত পাহাড় দেখেছি ধবল শৃঙ্গে
রয়েছে তোমারে চুমি,
কত বারিধির চরে খেলিয়াছি সুখে
কত দেশে দেশে ভ্রমি।
কত অবারিত মাঠ, কত প্রান্তর,
চেয়ে থাকে তোমা পানে

সে সকলি আজ কিছুই দেখি না,
(শুধু), স্মৃতি পথে আসে মনে।
আজি কারাগারে বন্দী আমারে
গিয়াছে সকলে ছেড়ে,
চির পুরাতন বন্ধু আকাশ
তুমিত ছাড়নি মোরে।

আরও কত কি লিখেছিলাম, ভুলে গেছি, সে সব কাগজও হারিয়ে গেছে !

আকাশের পানে চেয়ে সময় কাটান কতকটা অভ্যাস হয়ে গেলে, মনের তার যেন আকাশের সুরে বাঁধা হয়ে গেল, চেয়ে চেয়ে দেখতাম, ক্ষুদ্র মলিন আঁচড়ের মত চিলগুলি হাওয়ায় সাবলীল ভঙ্গীতে ঘুরে যাচ্ছে, কখনও দু এক খণ্ড মেঘ ভেসে চলেছে, জলের বুকে পালতোলা নৌকার মত।

কিন্তু কয়েকদিন না যেতেই একদিন জেলার আকস্মিক দর্শন দিয়ে, প্রহরীকে, আমায় গাছতলার শুয়ে থাকতে দেওয়ার জন্য গালি সুরু করে শাস্তি দেবে বলে শাসাল। আমি জেলারকে যতই বোঝাই, শাস্তি দিতে হয় আমাকে দিন, ওর কি দোষ ! এমন কোনও নিয়ম আছে যে ষ্টেট প্রিজনারকে সারা দুপুর ফাঁসির সেলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে ! জেলের মধ্যে, প্রহরীর সমুখে, গাছতলায় শুয়ে থাকায় আপত্তি কি হতে পারে ! কোনও ফল হল না, আমাকে সেলে বন্ধ করে জেলার চলে গেল। প্রহরী বিমর্ষ মুখে বললে, যানে দেও

শালাকো। গরীব প্রহরী কেন সাজা পায়, তাই আমি সেই থেকে সেলেই থাকতাম। যথেষ্ঠ খেতে দিত না, শোবার বিছানা দিত না, পরার কাপড় দিত না, বই না, খাতা না, শুধু একটা সেলের মধ্যে ষ্টেট প্রিজনারকে বন্ধ রাখা হল, জেলের নিয়ম! শয়তান গভর্ণমেণ্ট আর অমানুষ এই রকম কর্মচারী! কি করি, উপায় কি! তখন মনে ভাবলাম, যোগ অভ্যাস করা যাক। শিরদাঁড়া খাঁড়া করে খুব জোর নাক টেপা সুরু করলাম। বিশ্বাস ছিল, ইড়া, পিঙ্গলা, সুশুম্না দিয়ে এমন একটা তুরীয় অবস্থায় পৌঁছিব, যখন ব্রহ্মদর্শন. ঘটে যেতে পারে। আব তখন ত, বাহির কি, আব জেলই বা কি, মুক্তি কি; আর বন্দী থাকাই কি! তখন আমাকে পায় কে! কয়েকদিন যোগ অভ্যাস কবেছি, হঠাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত শির শির কবতে লাগল আব দর দর করে ঘামতে লাগলাম। আব কিছুক্ষণ লেগে থাকলে ব্রহ্মদর্শন মিলত কি না জানি না, মনে কিন্তু এল ভয়, যদি পাগল হয়ে যাই। সেই থেকে যোগাভ্যাস ত্যাগ করলাম।

বাড়ী থেকে কিছু বই এসেছিল, তার মধ্যে দেখি গীতাঞ্জলি। বহু পূর্ব্বে একবার গীতাঞ্জলি পাঠ সুরু করেছিলাম, কিন্তু প্রথমেই মাথা নত করার কথা পড়ে মন সায় দিল না। ভাবলাম, যদি নতই করতে হবে তবে ভগবান মাথাটা দেহের সবার উপরে দিলেন কেন? কিন্তু পরে আরও পড়তে পড়তে আমি তন্ময় হয়ে গেলাম ও শ্রদ্ধার ভারে মাথা আপনি নত হয়ে গেল, ফুলের

পর ফল ফললে শাখা যেমন মুয়ে পড়ে। মনে হ'ল, প্রত্যেক গীতি কবিতাটীতে যেন বিশেষ করে আমারই মত কারাগারে নিভৃত সেলের বন্দীর মুক্তি পিপাসী অন্তরের কথা, কবি অতি সূক্ষ্ম ভাবে বয়ন করেছেন। মনের জমাট কাঠিন্য গলে যেতে লাগল, রবির কিরণে যেমন তুষার যায় গলে। অন্তরেব ঠাকুরের নিকট বার বার কবির কথাতেই বলতে লাগলাম,

"এই করেছ ভালো নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।"

জানি না কত লোক আমাব মত অবস্থায় পড়ে মরণের পথ থেকে বেঁচেছে। জেলে, নির্বাসনে, নিঃসঙ্গ জীবনে যিনি এনে দিয়েছেন মুক্তির বার্তা তিনি আমাদের কবি।

গীতাঞ্জলির একটি গীতে আবৃত্তি কবতে বিশেষ ভাল লাগত, সেটী হ'ল,

"পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে"

বিশ্ব নৃত্যের এই গানটীর অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতাম না, আজও বুঝি না। তবু যখন আমার সেই ক্ষুদ্র আট ফুট লম্বা সেলে পায়চারী করতে করতে গাইতাম,

"পাগল করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন-পানে
রয় না বাঁধা বন্ধে রে"

ভাবতাম, আমাদের এই উদ্দাম দুরন্ত বিপ্লবী প্রাণের ছন্দের সঙ্গে ওই কবিতা গানের কোথায় যেন গভীর মিল আছে।

কারাগারের প্রাচীর ও লোহার ফাঁকে ফাঁকে খবর আসত, ইউরোপে মহাসমর ভীষণ ভাবে চলেছে, ইংরেজ ও ফরাসীর অবস্থা কাহিল। মনে মনে আফশোষ হ'ত, সুযোগ বয়ে যাচ্ছে, আর আমরা কারাগারে বন্দী!

এমন সুবিধা আবার কি আসবে! বাইরে কি হচ্ছে! কাজ এগুচ্ছে কি! আবার গীতাঞ্জলী পড়ি, মৃদু সুরে গান গাহি, আবার পড়ি, মাঝে মাঝে কবিতা লিখি। হঠাৎ একটা ভাব এল, লিখে ফেললাম, পাছে ভুলি। সে সব ছিন্ন পাতা কোথায় উড়ে গেছে! নিদ্রা কমতে লাগল ও শরীর দিনে দিনে শীর্ণ হয়ে গেল। তখন সকাল ও সন্ধ্যায় অসুস্থ বলে এক ঘণ্টা করে পায়চারী করতে দেয়। জ্বরের ঘোরে সারারাত্রি ছটফট করেছি। কেউ নাই মাথায় জলের পটী বা একটু হাত বুলিয়ে দেয়। বাড়ীর সকলের কথা, গরীব সংসারে অগাধ স্নেহের কথা মনে হতে লাগল।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে স্বপন দেখেছি যেন বাড়ীতে মায়ের কাছে শুয়ে আছি। ঘুম ভেঙ্গে গেল, কোথায় মা, কোথায় তার স্নেহ, শরীর দুর্বল, মাথা কিন্তু যেন হালকা। যেন ঝড় বৃষ্টির পরে নির্মল আকাশ। সমুখের পথে পায়চারী করতে বেরুলাম আর ভাবতে লাগলাম এই জেল কি মানুষের পৃথিবীর বাইরে, এখানে এমন অমানুষিক ব্যবহার কেন? এইখানেই নাকি সরকার দুষ্ট মানুষকে শিষ্ট করতে চায়। এই সব ভাবছি আর পায়চারী হঠাৎ কানে এল, কে যেন বলছে 'আপনার কি অসুখ করেছে, এমন দেখাচ্ছে কেন?' চেয়ে দেখি, জেলারের ছাদ থেকে একটী ছেলে আমায় এই কথা জিজ্ঞাসা করছে। তার পাশে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটী তরুণী, যেন ভোরের শুকতারা! চক্ষু দুটীতে তখনও সদ্য নিদ্রাভঙ্গের আবেশ, কয়েকটী চূর্ণ কুন্তল বাতাসে উড়ে মুখের উপর এসে পড়েছে। অসুখ করেছে বলতে, তরুণী, ছেলেটির মারফত অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন, বাড়ীতে কে কে আছেন, বিয়ে হয়েছে কি না। অসুখে স্নান যেন না করি, ভাত না খেয়ে দুধ সাগু খাই ইত্যাদি অনেক উপদেশও দিলেন। জেলে ভাল কিছু খেতে পাই না বলে ইচ্ছা হয় খাবার পাঠাতে, কিন্তু উপায় কি! যদি ধরা পড়ে যায়! এত কথা দাঁড়িয়ে হবার উপায় ছিল না, প্রত্যেক বার পায়চারী করতে করতে যখনই ছাদের নীচ দিয়ে যেতাম, একটী করে প্রশ্নোত্তর হত। দু একটা চেনা কয়েদী দেখে হাসত ও সে হাসির অর্থ বুঝবার আমার বয়স হয়েছিল, কিন্তু তবু

তাঁর মত অনাত্মীয়ের এই বন্দীর জন্য অযাচিত করুণা, স্নেহের ভর্ৎসনা, উপদেশ, মিষ্টি লাগত ও প্রতিদিনই পায়চারীর সময় আমি সেই ছাদের পানে না চেয়ে থাকতে পারতাম না। জগতে আশ্চর্য্য কিছুই নেই। বহুদিন পরে শুনেছি, বড়দা যখন ঢাকার এক দুর্গম পল্লীতে অন্তরীণ অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, মুসলমান দারোগার স্ত্রী তার স্বামীকে বলেছিলেন, তোমরা কি মানুষ! নিজে পথ্য প্রস্তুত করে, স্বামীর অসম্মতি সত্ত্বেও, সেই মুসলমান মহিলা এক হিন্দু নজরবন্দীর জন্য ঝির হাতে পাঠিয়ে দিতেন। কত শ্রদ্ধা ও দরদ! বড়দা বলেন, এই মানবতার কাছে ভেসে যায় জাতি ধর্মের ভেদের গণ্ডী। সেই প্রাণস্পর্শী সহানুভূতি পেয়ে আমারও প্রাণে কবির কথা জেগে উঠত,

"জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে।"

বাঁকুড়া জেলে এক যুদ্ধবন্দী তুরকীকে এনে কিছুদিন রাখল। প্রায় সাড়ে সাত ফিট লম্বা চেহারা, প্রাতে চা খেত, আটটী মুর্গির ডিম সহযোগে আর জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অজস্র গালি দিত। ভাবতাম, বিদেশে একা বন্দী সে, তার একটীও লোক এখানে নাই. কিন্তু তবু কত নির্ভয় এই স্বাধীন দেশের, বন্দী, অন্যায় তার কাছে কত অসহনীয় ও কি বেপরোয়া সাহস!

এক পাঠান মেট কয়েদী ছিল। একদিন সে কতকগুলি কয়েদীকে ড্রীল করাচ্ছিল, তার মধ্যে একজনের ছিল স্থূলকায় চেহারা। বেচারা বসে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হেলে পড়ল, তখন সেই পাঠান মেট তার পাছায় জুতা পায়ে সজোরে মারল এক লাথি। সে পড়ে গেল ও তার চোখে জল দেখা দিল, দেখে আমার মনে দুঃখ হ'ল। পরে পাঠান মেটকে বললাম, ও বেচারা একটু মোটা, ওকে অমন করে লাথি মারলে কেন? সে বললে, জানেন না, ও এখানে দারোগা ছিল, ঘুষের দায়ে জেল হয়েছে। বেটা আমাদের কি মার মেরেছিল! এখন হাতে পেয়েছি, মারব না। প্রায়শ্চিত্ত বটে। লোকটার জন্য দুঃখ হলেও আপত্তি করবার আছে কি? পরে সে অনেক চেষ্টা করে কলকাতায় বদলী হয়ে গেল। এখানে থাকলে মারা যাবার উপক্রম হত। জগতে উল্টা পালার এ এক বিচিত্র ব্যাপার।

অসুস্থতার জন্য হুকুম এল আমায় নিয়ে যাবে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। শুনে মন উল্লসিত হ'ল না। আবার প্রেসিডেন্সি জেল, আবার সেই জেলার হিল ও কুখ্যাত টমসন্। মফঃস্বল জেলে যা হোক দিন কেটে যাচ্ছিল, হাওয়াও ছিল ভাল, কিন্তু প্রেসিডেন্সির চুয়াল্লিস ডিগ্রি, বীভৎসতায় তার কি তুলনা আছে? প্রহরীদের সহায়তার ফলে শরৎদার সঙ্গে গোপনে দেখা করে, চোখের জল মুছে, বিদায় নিলাম। প্রেসিডেন্সি জেলে প্রথম যখন আসি, আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব অটুট করে দিয়েছিল এক হাতকড়ার বন্ধনে, আজ ছাড়া ছাড়া হলাম। সে থাকবে

একা। এই একা যে কত ফাঁকা তা অনুরূপ অবস্থায় না পড়লে কে বুঝবে! বৃদ্ধ জেলর কৃত্রিম সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না ভাই, আপনারা মহৎ প্রাণ, দেশের জন্য জেলে এসেছেন, কিন্তু কত কষ্ট দিলাম। শুনে মনটা ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'ল। আপনাদের কি দোষ দোবো, সরকারী হুকুম তামিল করেন মাত্র, বলে প্রহরী সঙ্গে বেরিয়ে আসছি, দৃষ্টি পড়ল জেলারের বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে সেই তরুণী। মেঘলা আকাশপটে মূর্তিখানি, ঘরছাড়া এই বন্দীর চোখে দেখাচ্ছিল যেন অপরূপ। ঘনপল্লবের ছায়ায় ছুটী নয়নের সকরুণ চাহনীতে এই নির্বাসিত পথিকের কাছে কোন নীরব ভাষায় বিদায় নিচ্ছিল, কি জানি! দুঃসাহসে একটা নমস্কার করে জেলের বাইরে চলে এলাম।

সারারাত্রি ট্রেনে চলেছি। ভোরে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, প্রান্ত সীমায় তখন আধখানা সূর্য উঠেছে ও তার অরুণ রঙে ধরিত্রীর বুক ভেসে গেছে। প্রকৃতির এই রূপ বহুকাল দেখতে পাইনি, কারাগারে চারিদিকে ছিল প্রাচীর। ভাবতে লাগলাম, এই সূর্য হতেই আমাদের পৃথিবার জন্ম, পৃথিবী শীতল হতে কত যুগ লেগেছে, তারপরে পরে গুল্ম লতার সৃষ্টি, কত রকমের প্রাণী এসেছে, গেছে, ও সর্বশেষ সৃষ্টি হয়েছে এই মানুষের। ওই সূর্যই পৃথিবীর সকল জড় ও শক্তির আদি উৎস, কিন্তু মানুষের চেতনা কোথা হতে এল, সকল জড় ও শক্তির সঙ্গে চেতনাও কি প্রচ্ছন্ন আছে? ভেবে দিশা পাই না, এর

উত্তর দেবে কে? দেখতে দেখতে সূর্য সম্পূর্ণ উদয় হ'ল, আকাশ রক্তিম আলোয় আলোয় ভরে গেল। চোখ দিয়ে তৃষ্ণার্ত অন্তরে আকণ্ঠ পান করে নিই, সেইরূপ. যতক্ষণ পাই। ট্রেন চলতে লাগল হু হু করে। অবারিত শস্যক্ষেত্র, তারই মাঝে মাঝে এক একটি তাল বা নারিকেল গাছ দাঁড়িয়ে, কোনও রাখাল গরুর পাল নিয়ে মাঠে চলেছে, তরু ছায়ায় ছোট ছোট গ্রামগুলি, কোনও পুকুর ঘাটে মায়েরা কলসীতে জল নিচ্ছে, কেউবা বাসন মাজছে, উলঙ্গ সন্তান মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আমাদের ট্রেন দেখছে। বাহির জগতে এদের জীবন দুঃখে সুখে বিচিত্র। দেখলে কবির কথায় বলতে চাই.

"মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।"

হাওড়া ষ্টেশনে রক্ষী সেপাইরা গাড়ী ভাড়া করতে কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করলে, প্রেসিডেন্সি জেল কোথা। আমি নিয়ে যাচ্ছি, বলে, প্রহরীদের আশ্বস্ত করে কোচম্যানকে বললাম, শিয়ালদহ ঘুমকে চলো। গাড়ী যখন আমাদের বাড়ীর কাছে ডিকসন লেনে প্রবেশ করেছে, সরু গলি দেখে প্রহরীরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ও চেঁচাতে সুরু করলে, এ কোথায় চলেছি। পাছে লোক জমা হয়, তৎক্ষণাৎ সিপাহি দুজনকে বুঝিয়ে বললাম আমার বাড়ীতে একবারটী দেখা করে প্রেসিডেন্সি জেলে চলে যাবো, তোমরা ভয় পেয়ো না। পাশের বাড়ীতে টিকটিকি থাকে, জানলে বিপদ। নকরী তো যাবেই, সাজাও হতে পারে। অধিকন্তু চার টাকা দুজনকে বকসিস দোবো। বকসিসের লোভে

বা আমার কথা যুক্তিসঙ্গত ভেবে তারা রাজী হয়ে চুপ করল। বাবা বা ভায়েরা বাড়ী ছিলেন না ; ছোট বোন ও তার বন্ধু গল্প কবছিল, আমায় দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তুজনে আমায় খাওয়াল, সেপাহীদেরও খাবার খাওয়ান হল। আমার গালপাট্টা দাড়ী দেখে পল্লীর ছোট ছোট ছেলেরা অবাক হয়ে গেল। চেনা কণ্ঠকর। তুয়ার হতেই দেখা সাঙ্গ করে বিদায় নিলাম। তুজনের চোখে জল গড়াতে লাগল। সেজদাকে ছাড়তে তাদের মন চায় না। ক্রমে ময়দানের পথে চলেছি। তুপাশে সবুজ মাঠ, পূর্বে নিত্য কত বেরিয়েছি, কত খেলেছি, ছ্যাচুব তলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, তাঁর দল নিয়ে বসতেন, এখনও নিশ্চয় বসেন তাঁর প্রিয় ছাত্রকে মনে পড়ে কি! আকাশেব শোভা দেখতে দেখতে ঘাসের উপর শুয়ে থাকতাম, তারা আমার সর্বাঙ্গে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দিত। তারা আমায় ডাকছে। মৌন বেদনায় তাদেব নিকট বিদায় নিতে নিতে চললাম জেলেব পানে, আবার সেই আলিপুবেব পুলের উপব গাড়ী উঠে বাঁদিকে নেমে প্রেসিডেন্সি জেল ফটকে দাঁড়াল। বাহিব জগতেব সহিত সম্পর্ক আবার কতকালের জন্য ছেদ পড়ল।

প্রেসিডেন্সি জেল-ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড !

" 'অমৃতের পুত্র মোরা' কাহাবা শুনাল বিশ্বময়।

আত্মবিসর্জ্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়

ভৈরবের আনন্দেরে

দুঃখেরে জিনিল কেরে,
বন্দীর শৃঙ্খল ছন্দে মুক্তির কে দিল পরিচয়।”

—রবীন্দ্রনাথ

এবার আর চুয়াল্লিশ ডিগ্রী নয়, নিয়ে গেল ইউরোপীয় ওয়ার্ডে। সেলগুলি বীভৎস নয়, দোতালা বাড়ীটী, নীচে উপরে পাঁচটী করে সেল, সামনে বারান্দা একটু, উঠান ও স্নানাগার আছে। স্থানটী পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এ দেশের অর্থে বিদেশীদের জন্য অনেক ভাল ব্যবস্থা, খাওয়া পরার ব্যয়ও অনেক বেশী। মন্দ ব্যবস্থা কারুরই বাঞ্ছনীয় নয়। ভারতীয়ই হোক, আর ইউরোপীয়ই হোক, অপরাধী ত অপরাধী। তার ভিতরেও তারতম্য না করে ভারতীয়দেরও একটু মানুষের মত রাখা হয় না কেন?

নীচের চারটী ঘরে চারজন রাজবন্দী, তারমধ্যে দেখলাম বন্ধু দেবেন চৌধুরীকে। সে পূর্বে আমার চেনা ছিল ও আমার কাছে শিবপুর ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত শ্রীনরেন ঘোষ চৌধুরীর বাসা ঠিক করে নিয়েছিল। সামনে বারান্দায় থাকত এক ইউরোপীয় সার্জন! পঞ্চম ঘরটীতে আমায় ঢুকিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর টমসন এসে আমার সর্বাঙ্গে ষ্টেথিসকোপ লাগিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, তিনি আমার চিকিৎসা করবেন। আমি তাঁকে বললাম তাঁর চিকিৎসা থেকে আমায় যেন রেহাই দেন। নিঃসঙ্গ সেলে আবদ্ধ থেকে যে রোগের উৎপত্তি, তাতে ওষুধে কি হবে! আর বললাম, আমায় যেখানে খুসী পাঠান হোক, প্রেসিডেন্সি জেলে তার তত্ত্বাবধানে থাকতে চাই না।

কিছুক্ষণ পরে পলিটিক্যাল সেক্রেটারী, অনারেবল কামিং এলেন ও আমায় বললেন যে আমায় নীরোগ করবার জন্যই সুবিখ্যাত চিকিৎসক মেজর টমসনের তত্ত্বাবধানে আনিয়েছেন। তাঁকেও আমি জানালাম, বাঁকুড়ায় যে অনিদ্রা ও স্নায়ু রোগে ভুগছিলাম, সেখানে তবু এক ঘণ্টা করে দু বেলা পায়চারী করতে পেতাম, এখানে মাত্র পনের মিনিট পায়চারী করে সে রোগ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। ঔষধে কি হবে! তার চেয়ে আমাকে অন্তরীণ করে যে কোনও স্থানে পাঠান হোক, তা সেখানে সাপই থাক, আর বাঘই বেরুক। কামিং আমায় জানিয়ে দিলেন যে আমার মত ভীষণ বিপ্লবীকে বাইরে অন্তরীণ করা বৃটিশ রাজের পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়, আমার জেলে থাকতে হবে। পরের দিন আমায় উপর তলার দশ নম্বর সেলে নিয়ে গেল। দোতলা সব ঘরগুলি খালি ছিল। নীচে তবু আর চার ভাই ছিল, তাদের দেখতে পেতাম ও ইঙ্গিত ঈশারায় দু একটা কথা কইতাম, আর তারা পাশের সেলে থাকাতে ততটা নিঃসঙ্গ মনে হত না।

সকালে ও বিকালে যখন পনের মিনিটকাল পায়চারী করতাম, সহবন্দীদের চেয়ে চেয়ে দেখতাম, একটু হাসি, একটু ইঙ্গিত চলত, সাবধানে, পাছে ওয়ার্ডার দেখে ফেলে। তারা সকলেই মন্দ লোক ছিল না ও বড় একটা আমাদের দিকে চেয়ে বসে থাকত না। টেবিলে পা তুলে অনেক সময় ঘুমুত, ইয়ার্ডের দরজা খুলবার আওয়াজ হলেই উঠে

দাড়াত। আমাদের ওই ইঙ্গিতে নীরব আলাপটুকু ভাল লাগত, বাইরের সুদীর্ঘ আলাপের চেয়ে কত বেশী। বন্দীদের ভিতর নরেনবাবু, দেখতাম, সোহহং জ্ঞান লাভ করেছেন। তাঁর অকালে সমস্ত চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। বিনা দ্বিধায় নর্দমার জল পান করে বলতেন, সোহহং সেই আমি। দেবেনবাবু বৃটিশ রাজকে সর্ত দিয়েছিলেন, তিনি এক লক্ষ বাঙ্গালী পল্টন গড়ে তুলে এই অসময়ে যুদ্ধে সাহায্য করতে পারেন যদি এই মুহূর্তে ভারত স্বরাজ পায়। ইউরোপীয় জেলর বুক ফুলিয়ে বলত, রাশিয়া হলে তোমাদের গুলি করে মারত। আমরা বলতাম, তাই কর না ও তার ফলও দেখ না। যে দিন এ কথা বলেছিলাম, কে জানত তার দু বৎসরের মধ্যেই রাশিয়ায় বিপ্লবের মধ্যদিয়ে জারতন্ত্র ধ্বংস হয়ে বলশেভিক গভর্ণমেন্ট রাষ্ট্রভার গ্রহণ করবে।

অত্যাচারী, শক্তির মাদকতায় মনে ভাবে বটে, সে চিরকাল সাধারণ লোকদের পদদলিত করে চলবে, সে দেখতে পায় না প্রপীড়িতের মনে সঞ্চিত বিদ্রোহ একদিন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

নীরব—নিস্পন্দ—নিঃসঙ্গ—দোতালায় সেই ছোট সেলে বন্য জন্তুর মত অবিরাম পায়চারী করতে লাগলাম, যাতে শরীরে একটু ক্লান্তি ও ঘুম আসে। সামনে বারান্দায় অনবরত একটা গুর্খা প্রহরী ভারী বুট পরে কুরকী ঝুলিয়ে পায়চারী করছে। কথা বলি এমন লোক পাই না, প্রহরীর

সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করি, প্রথম প্রথম সে ফিরেও তাকাল না। পরে সে এমন বশ হয়ে গেল, নিজ ব্যয়ে পোষ্টকার্ড এনে দিত ও গোপনে সে চিঠি ডাকে দিয়ে আসত। এ সব কাজ করত নিঃস্বার্থ ভাবে, কাছে কিছুই ছিল না যে বখসিস্ করি! তবু কেন সে নিজের বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও সাহায্য করত, জানি না। তাদের বাহিরের আবরণ যত কঠিন, ভিতরের মানুষটা তেমন বলে মনে হল না। মানুষগুলা ইউনিফর্ম পরলেই অমানুষ হয়ে যায় ও ডিসিপলিনের নামে তাদের বুদ্ধি ও মনগুলাকে অকেজো করে দেওয়া হয় ও এমন কুকাজ নাই যা তাদের দিয়ে বিনা দ্বিধায় করিয়ে নেওয়া যায় না পাশের সেলগুলা শুদ্ধ শূন্য। বাঁকুড়া জেলে লুকান কাগজ পেনসিল ছিল, এখানে তাও পাইনি। একটা কাজ নাই যে করি, একটা বই নাই যে পড়ি। পায়চারী করি আর গুণ গুণ করে কবির গান গাই,

"বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউত হানে না।॥"

মাঝে মাঝে শুয়ে পড়তাম ও আকাশের পানে চেয়ে দেখতাম, সন্ধ্যায় দূরে কোথা হতে পূজারতির ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসত, আমার অন্তর উধাও হয়ে যেত, অসীম বিশ্বের নক্ষত্রলোকে, অনন্তের পানে অন্তরের বেদনা নিবেদন করত। তখন আমি

দূরশ্রুত ঘণ্টাব তালে তালে পায়চারী কবে সোহহং জপ করতাম, ধ্যান করতাম, আমিই সেই, আমার দেহ মন, সকলই মায়া, একমেবাদ্বিতীয়ং, আমাব বন্ধন নাই, আমি নিত্যমুক্ত। কিন্তু মন মানে না, মানুষের সঙ্গের জন্য তার অস্থিরতা কমে না।

যত পারতাম, ধ্যানে আত্মস্থ হয়ে দিনরাত কাটাতাম। প্রাতে, দুপুরে সন্ধ্যায় যোগাসন কবে নিঃশ্বাস নিতাম, গভীব রাতে বসে বসে আমার কল্পনাকে অসীম শূন্যে মুক্তি দিয়ে মহতোমহীয়ানের ধ্যান করতাম।

এমনি করে আত্মীয় স্বজন বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলতে চেষ্টা করতাম, বিশ্ব প্রকৃতিব রূপ, রস, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ানুভূতি হতে বঞ্চিত হয়ে নিজ মন অন্তব হতে অন্তরতরে প্রবেশ করাবাব চেষ্টা করতাম, নির্লিপ্ত, নির্বিকাব হবার সাধনা করতাম। দিনে দিনে আমার পার্থিব দেহ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। পাঁচ মাসে ষোল সের ওজনে কমে গেলাম। ঘুম হ'ত না, আহারে রুচি কমে গেল, দিন রাত্রি পরমাত্মাব ধ্যানে কাটাতে লাগলাম. তবু অবুঝ মন মানল না, সে চায় মানুষকে কাছে পেতে, দুটো কথা বলতে। কুতুবদিয়ায় যে প্রকৃতিকে বুকের কাছে পেয়েছিলাম, বাঁকুড়ায় যার স্মৃতিতে সময় কাটাতাম, আজ মানুষ. প্রকৃতি, সকল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রসাভাবে অন্তর শুষ্ক হয়ে উঠল। যেন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললাম।

সরকারী হুকুম নিয়ে বাবা এলেন দেখা করতে। কতকাল তাঁকে দেখিনি। ইউরোপীয় প্রহরী ক্লারিকের সঙ্গে চললাম

জেল অফিসের দিকে। একখানা ছোট ঘর জাল দিয়ে তিন ভাগ করা হয়েছে। মধ্যভাগে আই, বি, পুলিশ অফিসার বসে, এক পাশের অংশে আমি, ওদিকের অংশে বাবা একলা, দুজনেই দাঁড়িয়ে। আমার রুগ্ন মরণাপন্ন চেহারা দেখে "তুই কি হয়ে গেছিস" বলে তিনি মাটীতে বসে পড়লেন, তাঁর দুই চক্ষের অশ্রুধারায় শীর্ণ গাল দুটী ভিজে গেল। জালের এপারে নিরুপায় বন্দী আমি, আমার এতদিনের সাধনার নির্লিপ্ততার প্রাচীর যা মনের চারিদিকে গড়েছিলাম, মুহূর্তে সব ভেঙ্গে গেল, আমিও কেঁদে ফেললাম ও ইচ্ছা হ'ল জালের আড়াল দুটা ভেঙ্গে ছুটে যাই, বাবাকে ধরি! মধ্যে যে আই, বি অফিসার ছিল, প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী ইসমাইল, সে টেবিলের উপর মাথা নীচু করে বসে রইল। বাবাকে আশ্বাস দিলাম, ভয় না করতে, আমি ঠিক আছি। বললাম তোমরা চিন্তিত হলে আমার মনে কষ্ট হবে। দাদাদের উপর রাগ হ'ল, কেন তারা বাবাকে একলা আসতে দিল! কতটা আশ্বস্ত হলেন জানিনা, সময় হয়ে গেল, চোখ মুছতে মুছতে তিনি চলে গেলেন, ইসমাইল তার কর্ত্তব্য বজায় রাখলে, আমি প্রহরীর সাথে সেলের পথে ফিরলাম। সার্জন ক্লারিক ছিল নামজাদা নির্দয় কর্কশ স্বভাবের। সে হঠাৎ বলে বসল, আমি তোমার বৃদ্ধ পিতার জন্য সত্যই দুঃখিত! চেয়ে দেখি, তারও চোখ দুটা ভিজা। কত কয়েদীর উপর কত রূঢ় ব্যবহারে সে অভ্যস্ত, দেখি তারও মনের গোপনে লুকিয়ে

আছে মানব মনের করুণা। সেই সন্ধ্যায় যোগাসনে বসে নির্বিকার পরমাত্মার ধ্যানে মননিবেশ করতে পারলাম না। মানস চোখের সম্মুখে ভাসতে লাগল বাবার স্নেহকাতর মুখ, মাটীতে বসে পড়া তাঁর ভগ্ন দেহ আর ভাবতে লাগলাম এই শ্যামল পৃথিবীর সন্তান মানুষের মনের বিচিত্র প্রকৃতি।

দুপুরে সেলে বসে আছি, প্রহরী টমসন বললে, তিনকড়ি তোমার কে? সে চুয়াল্লিস ডিগ্রিতে। বড়দা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির প্রফেসর মানুষ. বঙ্গবাসী কলেজে কেমিষ্ট্রি পড়ান। দেশের শত্রু হলেও মানুষ মারা তাঁর অসাধ্য। চিরজীবন নিরামিশাষী, একটা মশা বা ছারপোকা তার সমুখে মারবার উপায় ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে দেশভক্তি প্রচার করতেন ও স্বদেশী ব্যবহার শেখাতেন। শুনেছি সরকারী হুকুমে যুদ্ধের কাজের জন্য কলেজে রিক্রুট হচ্ছিল, বড়দা ক্লাসে বলেছিলেন, আমাদের দেশ ত পরাধীন, কার জন্য তোমরা যুদ্ধে সাহায্য করবে যার নিজের দেশ স্বাধীন নয়, সে যদি পরের সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিতে যায়, এটা কি প্রহসন নয়! বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য আমরা লড়ব কেন? একে আমার দাদা, তায় বিপিনদা ইত্যাদির বন্ধু, আত্মোন্নতি সমিতির আদি সভ্য, অতএব তাকে বন্দী থাকতে হবে, নচেৎ বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যেতে পারে! ভাবতে কষ্ট হ'ল, জেলের এই কঠোরতার কি করে তার সহ্য হবে! পরে শুনেছি, জেলে বাহিরে সুদূর পল্লীগ্রামে নজর বন্দী অবস্থায়, যেখানেই যখন তাঁকে যেতে হয়েছিল, সেইখানেই

মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্জন করেছিলেন, এমন কি স্বভাব নির্মম পুলিস অফিসাররাও অধিকাংশ তাঁর কাছে দুদিনে বন্ধু হয়ে যেত। বদলী হবাব কালে তাঁকে বিদায় দিতে সত্যই দুঃখ বোধ করত যেমন স্বজন বন্ধুর বিদায়কালে লোকের মনের অবস্থা যেমন হয়। শীর্ণ দেহ, দুর্বল মনের বড়দার সে ছিল আশ্চর্য্য শক্তি। বাবার জন্য দুঃখ হ'তে লাগল। একে আমার জন্য উদ্বিগ্ন, তবু আমাব দুঃখ কষ্ট সহ্য কববাব ক্ষমতা ও সবল স্বভাবেব উপব তাঁব ছিল কতকটা আস্থা। কিন্তু বড়দার জেলে যাওয়ায় তাঁর মন হয়ত ভেঙ্গে পড়বে। আজ বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কত বৃদ্ধ পিতা কত বিধবা মাতা হয়ত একমাত্র পুত্রকে এই বিচাবেব প্রহসনে হারিয়ে অশ্রুজলে, অনশনে দিন কাটাচ্ছে। আমার ত তবু আরও ভাই আছে, বোন আছে। আমার বাংলা দেশ, বাংলাব বাপ, মা, ভাই, বোন, ভাবি সেই দেশ আজ বিভক্ত হয়ে অধিকাংশ চলে গেল বিদেশ পাকিস্তানে।

কবি তাদের কথাই বলে গেছেন,

'কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মুলে নদীর কুলে কুলে

আজও কোনও কোনও লোককে যখন দেখি, পুববাংলা পশ্চিম বাংলার পৃথক জোট পাকায়, মনে ভীষণ বেদনা অনুভব না করে

পারি না। বিপ্লবী দলের মধ্যে সারা বাংলার ভাইবোনেরা যে এক সে কি মিথ্যা হতে পাবে।

দাঁড়ালে মাথা ঘুবে অন্ধকার দেখতাম, মনে হত যেন একটা কালো পাথব মাথার উপব চেপে পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে যেতাম। মেজর টমসনকে বললে সে গ্রাহ্য করত না। শেষে ভাবলাম, যখন সত্য অজ্ঞান হই, কেউ দেখে না, এবাব দেখিয়ে অজ্ঞান হব। মহাবীর ছিল আমাদেব ওয়ার্ডের মেট। তাকে সব বললাম ও মতলব ঠিক হল।

মহাবীর উঠান ঝারু দিচ্ছে, আমি স্নানাগারে স্নান করতে করতে মগটা সশব্দে ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম আর, মহাবীর, 'বাবু গিরগিয়া' বলে চীৎকার কবে ছুটে এসে আমায় তুলে ধরল। আমার তখন যেন জ্ঞান হ'ল। জেলর হিল এল, টমসন এল, সেই দিনই আমায় দোতলা থেকে একতলায় মাঝের সেলে নামিয়ে দিলে যাতে প্রহরীর চোখের সমুখে সর্বক্ষণ থাকি। হিল জিজ্ঞাসা করলে, কি ফল খেতে চাই, টোম্যাটো না তেঁতুল।

একদিন সব পরিষ্কার কবে নর্দমায় চুন লাগাল ও একটা করে ডাব দিয়ে গেল, বুঝলাম, আজ কেউ আসছে। এল এডিসন্যাল সেক্রেটারী মিঃ ষ্টিফেনসন। চার্ট পরীক্ষা করে ও ভয়াবহ ভাবে ওজন কমে যাওয়ায় আমায় জিজ্ঞাসা করল, কোথায় থাকতে চাই। বললাম, বাড়ীতে থাকতে চাই। বলল, আমাব মত ভয়ানক বিপ্লবীকে বাড়ীতে বা বাহিরে নজরবন্দী রাখায় গভর্ণমেণ্ট রাজী নয়। শেষে ভাবলাম, এমন জেলে যাওয়া ভাল, যেখান থেকে

বাহিরের পৃথিবী আড়ালে থাকে না। তাই দার্জিলিঙের নাম করলাম।

সেখানে পূর্বে অনেকবার গেছি, মানসচোখে এরই মধ্যে ভাসতে লাগল হিমালয়। যোগাসন ও পরমাত্মার ধ্যান বন্ধ হয়ে গেল, পায়চারী করি আর গাই,

"তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ ত জানে না
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ ত মানে না।"

এবার প্রেসিডেন্সি জেলে প্রবেশকালে নিজের বিছানা আনতে দিয়েছিল। বালিশের তুলার মধ্যস্থলে পাঁচটি টাকার একটী পুটুলী লুকান ছিল। খানাতল্লাসীর বহর দেখে ভাবলাম, টাকা কটা বেরিয়ে পড়তে পারে, তাই মেট কয়েদীকে বললাম, মহাবীর, এটা লুকিয়ে রাখতে হবে। সে ছিল খুনী আসামী, দশ বৎসর সশ্রম জেল বাস ছিল তার দণ্ড। সে টাকাগুলো নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে মহাবীর আমাদের ইয়ার্ড থেকে বদলী হয়ে গিয়েছিল, আমিও টাকার কথা ভুলে গেছলাম। যেদিন আমি প্রেসিডেন্সি জেল থেকে রওনা হব, হঠাৎ দেখি মহাবীর এসে আমায় টাকা কটা দিয়ে গেল। তা থেকে একটা তাকে দিলাম। মুক্তির পর কত শিক্ষিত ও তথাকথিত ভদ্রলোককে কত টাকা আত্মসাৎ করতে দেখেছি, কিন্তু নিরক্ষর ও যাকে সমাজ

কারাগারে নিক্ষেপ করে পরিত্যাগ করেছে, মহাবীরের মত কয়েদীর সেই সততাটুকু এ জীবনে ভুলতে পারিনি।

বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে সেলের বাহিরে এলাম। দুটা ফিটন গাড়ীতে ছয় জন বন্দুকধারী সেপাহী, একটী হাবিলদার ও একজন হৃষ্টপুষ্ট ইউরোপীয় সার্জন সমেত রওনা হলাম, শিয়ালদহ ষ্টেশনের পানে। বাড়ীর কাছে, ডিকসন লেনের সমুখ দিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডে যখন গাড়ী যাচ্ছে, পল্লীর লোক আমায় দেখে বাড়ীতে সংবাদ দিলে।

একটী রিসার্ভ ইণ্টার কামরায় অষ্টরথী পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছি, দেখি মেজদা। কয়েকটী কথা কহিতে কহিতে ট্রেণ ছেড়ে দিল। বললাম, গত সপ্তাহে আমার ওজন কিছু বেড়েছে ও ভাল আছি। ভেবো না। মেজদার কাছে শুনলাম, বাবাকে কামিং সাহেব বলেছে, তুমি তোমার ছেলেদের মানুষ করতে পারনি, বাবা উত্তরে বলেছেন, পুত্র গর্ব্বে তিনি গর্ব্বিত বোধ করেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা যদি তাদের অপরাধ বলে মনে কর, জগৎ শুদ্ধ লোকে এমন অপরাধী হোক, এই আমি চাহি। তোমার চোখে যারা ভাল, যারা দেশের পরাধীনতা বজায় রাখতে নিজ স্বার্থে বিদেশীদের সাহার্য্য করছে, তা'রাই সত্যিকারের অপরাধী।

প্রভাতের আলোকে চারিদিক জেগেছে। দুপাশে অবারিত ধানের ক্ষেতে বাতাস ঢেউ খেলে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে খাল বিলের কালো জল মেঘলা আকাশের ও গাছগুলির

প্রতিচ্ছবি বুকে নিয়ে কাঁপছে। আমার অন্তরেও স্পন্দন লাগল সে দৃশ্যে। যখনই আমি প্রকৃতির সম্মুখে আসি, দেখি চিরকালের বন্ধুর মত বুক খোলা রেখেছে আমায় তার কাছে টেনে নেবার জন্য। কিন্তু বন্দীর সকল সময় ত সে সুবিধা জোটে না! দিগন্তে বৃক্ষরাজি ট্রেণের গতির মুখে গগনপটে ঘুরে ঘুরে সরে যাচ্ছে, নিকটের গাছগুলা উল্টা দিকে ছুটেছে, আকাশের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে অনন্তেব নীলিমা দেখা দিচ্ছে। সেই কতদিন কেটে গেছে, বাঁকুড়া থেকে আসবাব পথে দেখা হয়েছিল, আজ আবাব সে চির সুন্দব রূপে সম্মুখে এসেছে মাটীর সবুজ ও আকাশের নীলের অপরূপ মিলনে। মুক্ত অবস্থায় কল্পনা চায় তার পানে, কাজের নামে অকাজের ভিড়ের মধ্যে মানুষের সে অবকাশ কোথা, কিন্তু বন্দীব প্রাণে তার মন মুগ্ধ করা কি গভীর আকুল আহ্বানের সাড়া জাগে!

দার্জলিঙ

"ধূর্জ্জটীর তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে তালে,
যেন গিরি পিছে গিরি, উঠিছে নামিছে বারে বারে।
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে,
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে, শূন্যে অংলীন,
তুষার নিরুদ্ধ বানী, বর্ণহীন বর্ণনা বিহীন॥"

—রবীন্দ্রনাথ

ভোর হয়ে এসেছে, ট্রেণ ছুটেছে, সৈয়দপুর ছেড়ে এসেছি, নিদ্রাভঙ্গে বাহিরের পানে চেয়ে আছি, দিগন্তে প্রান্তসীমায় হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ আকাশের গায়ে অস্পষ্ট দেখা দিল। মেঘ ছায়ায় রবির কিরণে স্বর্ণাভ চির তুষারাচ্ছন্ন শিখর শ্রেণীর অংশগুলি কখনও দৃষ্টিপথে পড়ে, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, সে বিরাট অপরূপের সমুখে অন্তর বিস্ময়ে সম্ভ্রমে নত হতে চায়। সে মহান হতে মহত্তর।

শিলিগুরীতে চা খেয়ে পাহাড়ী ছোট গাড়ীতে দার্জিলিঙ রওনা হলাম। তরাই এর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাড়ী চলেছে, দিনের বেলাতেও অবিশ্রান্ত ঝিঝি রব দুপাশে গভীর জঙ্গল, তার মধ্যে অধিকাংশ শাল গাছ আকাশে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে। তাদের উচ্চ শিখরে, রৌদ্রকিরণে, সবুজের ঝলমলানি।

ক্রমে পাহাড়ী গাড়ীতে বিচিত্র গতিতে অনেক উচ্চে উঠে এসেছি। দূরে, নীচে সমতল ভূমি, ছবির মত দেখা যাচ্ছে। তার মাঝে মাঝে চিক চিক করছে চঞ্চলা পার্বতী নদীর উজ্জ্বল জলরেখা। শালবনের ঝিঝিরব অনেকটা নীরব হয়ে এসেছে। পাহাড়ের গায়ে মায়ের বুকে শিশুর মত আঁকড়ে আছে, কত বিচিত্র রঙের কুটীর. কত চা বাগান, কত ফুলের শোভা কোথাও পাহাড়ের ফাটল দিয়ে ঝির ঝির করে জল বেরুচ্ছে, কোথাও দূরে দেখা যাচ্ছে ঝরণার জলপ্রপাত, প্রভাত আলোয় গলা রূপার মত উজ্বল। অপর দিকে পাহাড়ের বিরাটকায় উপরে উঠেছে, যেন পাষাণ সমুদ্র বিরাট তরঙ্গলীলার মধ্যে

হঠাৎ হয়ে গেছে স্তব্ধ স্থির। হিমালয়ের বিরাট বিচিত্র রূপের পানে চেয়ে চেয়ে মন বিস্ময়ে ভরে যায়, যত চাহি, আরও চেয়ে থাকতে হয়।

গাড়ী কারসিয়াং ছেড়ে আরও উপরে উঠেছে। শীত বোধ করছি। বস্ত্র ছিল সামান্য, তাই ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম। ইউরোপীয় সার্জন পূর্বে কখনও দার্জিলিঙ আসেনি ও জানত না বাংলার সমতল ভূমিতে গরম থাকলেও এখানে শীত। বেচারা পাতলা খাকী জামায় দেখি কাঁপছে, বিছানা থেকে একটা চাদর বার করে দিলাম। সে চাদরটা গায়ে দিয়ে একটু আরাম বোধ করল। ডুক ডুক শব্দ করতে করতে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে চড়াই পথে গাড়ী এগুতে লাগল। কত পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা পথের পাশে খেলা করছে, কেউ বা চিনা বাদাম বা চা বেচছে। তাদের অনেকের মুখগুলাতে যেন পাকা আপেলের রঙ, ঢলঢলে, যদিও বুক পাতলা, দেহ রোগা, হয়ত অত্যন্ত গরীব, ভাল খেতে পায় না বলে। পাহাড়ী স্ত্রীলোকরা বাজার হাট করছে, পিঠে কয়লার বোঝা বুকে ছেলে তার উপর গান করতে করতে উল বুনে চলেছে। অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের মুখে একটু হাসি, যেন পাহাড়ী ফুলের শোভা। মঙ্গোলীয় মেয়েদের জীবনী শক্তির যেন একটু বৈশিষ্ট আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

ট্রেন এসে ঘুমে পৌছল, এটা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ষ্টেশন। রাত্রির অন্ধকার নেমেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে,

গাঢ় কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না, অতি কাছের আলো-গুলাও ঝাপসা। কাল এমন সময় গরমে ঘর্মাক্ত ছিলাম আর আজ লাগছে শীতের কম্পন। গাড়ী ঢালু পথে চলে ক্রমে বৈদ্যুতিক আলোকে উজ্জ্বল দার্জিলিঙ ষ্টেশনেব মধ্যে গিয়ে যাত্রা শেষ কবল। মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ভ্রমণ-সুখের অবসান হয়ে এল। এতক্ষণ যেন ভুলে ছিলাম আমি বন্দী, প্রহরী বেষ্টিত হয়ে আসছি, আবাব ঢুকতে হবে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

. প্রহবীদের মধ্যে কেউ জেলখানার পথ জানত না। বহু পূর্বে বেড়াতে এসে সখ করে পাহাডী কাবাগার দেখে গেছলাম, তখন কে জানত এইখানে আমায় বন্দীরূপে থাকতে হবে। আজ আমাকেই সেই পথ দেখিয়ে প্রহরীদেব নিয়ে যেতে হ'ল নিজেরই কারাগারে। যেন জীবনের·একটা পরিহাস। বাজার থেকে নেমে বট্যানিক্যাল বাগানেব পথ দিয়ে পৌঁছলাম জেলের ফটকে। প্রকাণ্ড গেটের মধ্যে একটা ছোট দরজা খুলে দিল। ভিতরে প্রবেশ করে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঢুকলাম দোতলায় অফিস ঘরে। জেলার বদলী হয়ে চলে গিয়েছিল, নতুন জেলার তখনও দার্জিলিঙ আসেনি, সহকারী জেলার ছিলেন সাময়িক ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। প্রহরীরা কাগজপত্র, ও আমার জিনিষ আমাকে সমর্পণ করে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে চলে গেল। আমি তখন খুব ক্ষুধার্ত। আমার আসার সংবাদ তখনও পৌঁছায়নি বলে কি

খেতে দেবেন ভেবে জেলর কুল পেলেন না। সর্দ্দার জমাদার, বুড়া গুর্খা পাশে দাঁড়িয়ে অবস্থা দেখে বললে- বাবুজী, চা, পাউরুটী, মাখন ও চিনি এনে দিতে পারি। আমি সানন্দে সম্মতি জানালাম। এর চেয়ে ভাল খাবার কি হতে পারে ভেবে পেলাম না, বিশেষ ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায়।

পাহাড়ী জমাদার, বয়স বোঝা শক্ত। বেঁটে রোগা আঁটসাট চেহারার উপর খাকি ইউনিফর্ম পরা, মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগড়ী তার উপর ছোট ছোট দুটা চোখ, সারা মুখখানায় বলী রেখায় ভরা। নিজ হাতে যখন খাবার এনে দিলে, সেই ভঙ্গিটীতেই আতিথেয়তার পরিচয় পাওয়া গেল। বন্দী জীবনে বারে বারে দেখেছি আর ভেবেছি, আমাদের বিদ্যার অহংকার কত বৃথা। সহকারী জেলার শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে যা পেলাম না, এই নিরক্ষর জমাদার তা পুরিয়ে দিলে। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। পরিতৃপ্তির সহিত ভোজনের পর ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছিল। আমাকে এনে একটা ঘরে বন্ধ করে দিয়ে গেল। ঘরটী বড় ও কাঠের মেঝে ইউরোপীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট। আমার এখানে অনধিকার প্রবেশ। দেখলাম, ইউরোপীয়েরা এই পরদেশে কয়েদী হলেও যে সুবিধা আদায় করে বিনা বিচারে রেগুলেশনে রাজবন্দী হয়েও আমরা তার তুলনায় কিছু পাই না। শুনেছিলাম, এখানে এক জর্মন যুদ্ধবন্দী ছিল, সে তিন দিন ঝগড়া ও উপবাস করে ভাল খাবার আদায় করেছিল।

বিলাসিতা বা অতিমাত্রায় পার্থিব সুখভোগের বাসনা ভাল বলি না। পৃথিবীতে যত উৎপাদন হয় তা জনপ্রতি অতি সামান্যই ভাগে পড়ে। তাই যারা অতিভোগ করে তারা অনেককে ন্যায্য প্রাপ্য বঞ্চিত করে। কিন্তু দারিদ্রজনিত নির্ভোগকে আমরা যেমন মহিমান্বিত করেছি, এমনটী ইউরোপে কম দেখা যায়। নিরুদ্যম, নিষ্কর্ম থাকা আমরা বৈরাগ্য ও অধ্যাত্ম সাধনা মনে করি। কল্পিত স্বর্গসুখের জন্য পুণ্যলোভে, হেন অন্যায় নাই, এমন হীনতা নাই, যাতে আমরা কুণ্ঠিত হই। ইউ-রোপীয়েরা পরিশ্রম করে ভোগের জন্য, আর আমরা ত্যাগ করি ভীরুতা ও আলস্যে। তা নইলে দেশে জনসাধারণের এমন দারিদ্র্য কেন, যার জন্য মনুষ্যত্বের বিকাশ হতে পারে না ?

আমরা অধিকাংশ অমানুষ ভীরু। তাই নিজের দেশে আমরা ক্রীতদাস থাকতে লজ্জা বোধ করি না। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে থাকি। এমনি চিন্তা করতে করতে সেই ঘরে কাঠের মেঝের উপর পায়চারী করতে লাগলাম ও ক্লান্তি বোধ হলে কোম্বল গায়ে শয়ন করে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হলাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল, মাথা বেশ হাল্কা ও মন বেশ প্রফুল্ল। গুর্খা প্রহরী সেলের সমুখে দাঁড়িয়েছিল, সে মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন করলে, তার মধ্যে বেশ সসম্মান ভাব, নিকটেই ছোট একটা প্রাঙ্গণে যোগেনদা ও অনন্ত ছিল, তারা ছুটে এসে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলে, কত কথা হ'ল। চা, রুটী, মাখন দুধ ও ডিম সমেত প্রাতরাশ দিলে, বাঁকুড়া ও প্রেসিডেন্সি জেলের

খাদ্যের যেমন অভাব, এখানে তেমনি প্রাচুর্য। কিছুক্ষণ পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল, দেখি, কুতুবদিয়ার পূর্ব্ব পরিচিত মিষ্টার ব্যারোজ, তখন দার্জিলিঙে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। ব্যবহার ও কথাবার্তায় ভদ্রতা ছিল। দুপুরে ভাত মাছ আদি এনামেলের থালা বাটীতে খেতে দিল ভালই। খাওয়ার পর সেলে বন্ধ করলে না, কখনও বন্ধুদের সঙ্গে, কখনও প্রহরী বা কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ করে বেলা কেটে গেল।

বৈকালে সহকারী জেলারবাবু তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন। কোমলা খাইয়ে খাতির করে অনবরত বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

বুঝলাম. শ্রোতার অভাবে আমাকে অফিসে এনেছেন। কার্যক্ষমতায় তিনি যে খুব বিচক্ষণ, সে কথা বার বার বলে আমায় এমন বুঝালেন যে আমার না মেনে উপায় ছিল না। জেলার যিনি ছিলেন, তিনি যে কিছুই করতেন না, সবই তাঁকে করতে হ'ত। কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করলেই বুঝব, তাঁর তত্ত্বাবধানে জেলের কাজ আরও ভাল চলছে। তাঁর অসাধারণ সংযম শক্তির কথাও হাত মুখ নেড়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। অনুক্ষণ কাশীর নস্য নহিলে তাঁর চলত না, সেই নেশা তিনি এক দিনের প্রতিজ্ঞায় ত্যাগ করেছেন। সত্যই অদ্ভুত বলাতে, দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে হিন্দুধর্মের গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করলেন যাতে আমি বিস্ময়ে অভিভূত রহিলাম ও মেনে নিলাম তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। আসনে হিন্দুরা বসত কেন? আমায় নিরুত্তর দেখে চীৎকার করে উঠলেন, ইলেকটি সিটী মশায়

ইলেকট্রিসিটী! কথায় কথায় বিজ্ঞানে এম, এস, সি পড়া শেষ করেছি শুনে, বলে উঠলেন, ওই ত আজকাল বিজ্ঞান পড়ার দোষ, আপনারা সায়ান্সে কি বুঝবেন? এ সব বুঝত আমাদের আর্যঋষিরা। আঙ্গুলে হিন্দুরা খায় কেন? ইলেকট্রিসিটী! উত্তর দিকে মাথা রেখে শোয় না কেন? ইলেকট্রিসিটি। আমাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত দেখে খুব খুসী হলেন ও এক দিনেরই আলাপে বললেন, আমার মত ভাল লোক জগতে বিরল। সেই থেকে প্রতিদিনই তাঁর অফিসে গিয়ে বক্তৃতা শুনতে হ'ত ও আমার যত্নের ক্রুটী হত না। যা হোক, আমার ধৈর্যের সীমা ভাঙ্গবার পূর্বেই তিনি অন্য জেলে বদলী হয়ে গেলেন। যোগেনদার সহিত আমার সেল বদল হ'ল। একটী ক্ষুদ্র ইয়ার্ডের মধ্যে ঢালু ফাঁসি ভূমি ও তারই পাশে তিনটী সেল, পূর্বে বোধ করি প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের রাখা হ'ত। মধ্যের সেলটী আমাদের স্নানাগারে পরিণত করা হয়েছিল, আর তুটীতে রহিলাম, আমি ও অনন্ত। পিছনে উচ্চে জানালা থাকায় সেলগুলি প্রেসিডেন্সি জেলের সেলের মত হাওয়াবিহীন বীভৎস নয়, ও বিশেষ করে পরস্পর মেলামেশায় আপত্তি করত না ও রাত্রি ব্যতিত বন্ধ রাখত না বলে, অসুবিধা হ'ত কম। প্রথম যেদিন বদলি জেলার এলেন, তাঁর সুবৃহৎ ভুঁড়ির তুপাশে আমি ও অনন্ত দাঁড়ালাম। পূর্বে তিনি মেদিনীপুর জেলে ছিলেন, সেখানে রাজবন্দীদের ব্যবস্থা জঘন্য, পরস্পর কথা কহা নিষিদ্ধ ও তুপুরে

তাদের সেলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হ'ত বলে, এখানে আমাদের মেলামেশা তাঁর অসহ্য লাগল। তিনি একবার অনন্তের পানে, একবার আমার পানে চেয়ে, বলতে লাগলেন, অতটা কাছাকাছি আসবেন না, অত মেলামেশা করবেন না। হাসতে হাসতে বললাম, আমরা এপারে ও ওপারে, মধ্যে আপনার সুবৃহৎ উদর, কি করে কথা কহি? দেখলাম তিনি অদ্ভুত সৃষ্টি! মান অপমান তুল্য জ্ঞান করেন, গালাগালি করলেও হাসতে থাকেন। ক্রূর স্বভাবের লোকের মুখে এরকম বীভৎস হাসি কখনও বা দেখা যায়।

পূর্বদিকে পাহাড় উঠে গেছে বট্যানিক্যাল বাগানে। সমুখে উত্তরে দার্জিলিঙ পাহাড় ঘুরে গেছে। বামে অর্থাৎ পশ্চিমে উপত্যকায় কোন গভীর অতলে নেমে গিয়ে আবার উঠেছে পাহাড়ে পাহাড়ে ঢেউ খেলে নেপালের সীমানায়। বিচিত্র রঙের বাড়ী পাহাড়ের গায়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। রাতে পথের ও বাড়ীগুলীর বিজলী আলো জ্বলে উঠলে শোভা হয় যেন দীপালী উৎসবের। উপরে নীল আকাশে দেখতাম, মেষশাবকের মত স্ফীতকায় শুভ্র মেঘ ভেসে যেতে, কখনও কুয়াশার মেঘে আকাশ মাটী সব ঢেকে যেত। কোনও প্রভাতে দেখতাম, একরাশ ধোনা তুলার মত মেঘের রাশি উপত্যকায় শুয়ে আছে। সূর্যোদয়ের পরে উপরে উঠতে থাকে। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকতে ঔদাসিন্যে অন্তরটিকে ঢেকে ফেলেছিল, দার্জিলিঙ জেলে এসে

সে আবরণ, প্রকৃতিব সৌন্দর্য স্পর্শে গলে গেল, রবিকরে তুষার যেমন গলে যায় ঝরণায়। প্রাণায়াম সোহহং জপতপ আদি বন্ধ হয়ে অন্তব আবার সরস, পল্লবিত, হয়ে উঠল শীতেব পবে বসন্তে বৃক্ষলতা যেমন মুকুলিত হয়ে জেগে ওঠে। আমি প্রাণ ভরে সে সৌন্দর্য উপভোগ করে নিতাম ক্ষুধার্তেব ভোজেব মত, কৃপণেব সঞ্চয়ের মত, কি জানি আবার কোনও অন্ধকূপে সরকারী হুকুমে বন্দী হয়ে ভগবানের এই আশীর্বাদ ও অজস্র ঐশ্বর্যে বঞ্চিত হই। প্রাতে পায়চাবী করতে করতে দেখতাম, প্রভাত সূর্যের বক্তিম আলো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ছড়িয়ে পড়ে কেমন স্বর্ণচূড়ার সৃষ্টি করে। কখনও বা পাহাড় ও আকাশের গায়ে বিচিত্র সাতরঙা রামধনু দেখা দিত। মধ্যাহ্নে সেলের সমুখে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিব উপর কোম্বল বিছিয়ে শয়ন করে রৌদ্র সেবন করতাম। সূর্যের কিবণে যেন সারা দেহটীতে আরামেব আবেশ লাগত।

সন্ধ্যায় যখন ম্লান ছায়ায় সব ঢেকে যেত, প্রান্তসীমার পর্বতগাত্রে মেঘেব বিচিত্র আলপনায় বিশ্ব শিল্পীর অপরূপ খেয়াল দেখতাম. কত রঙ লাগান হচ্ছে, নিমেষে নিমেষে ছায়াছবির মত পরিবর্তন চলেছে, আবার নূতন রঙে, নূতন ছবি ফুটে উঠেছে, সবই সুন্দর, বিচিত্রতার যেন বিরাম নাই। প্রজাপতিগুলা উড়ে আসত, তাদের কোমল পাখায় সৌন্দর্যের কি অপরূপতা! ফুলের কত বিচিত্র রঙের ছড়াছড়ি। মনে হত, এমন সৌন্দর্য যে শিল্পীর সৃষ্টি তিনি নিজে কত সুন্দর

সন্ধ্যাব পর বুড়া জমাদ্দাব, বাহাদুব, একটু হেসে সেলাম করত। তাব তালা বন্ধের কাজের মধ্যেও অন্যান্য স্থানের তুলনায় যেন অনেক পার্থক্য। কর্তব্যের রূঢ়তা যেন শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের সংমিশ্রণে কোমল হয়ে আছে।

অশিক্ষিত পাহাড়ী প্রহরীদের অনেকের মধ্যে দেখতাম, সরল সহজ আমোদপ্রিয় জীবন। তারা অনুক্ষণ সস্তার সিগারেট খেত, মাঝে মাঝে পচাই খেয়ে নেশা করত, হিন্দুস্থানীদেব মত গম্ভীব প্রকৃতি নয়, দিনগুলা একটু স্ফূর্তি করে হাল্কা ভাবে কাটাতে চায়। জীবনে ত দুঃখ আছেই। কিন্তু সেই দুঃখগুলাকে সহজ ভাবে নেওয়া ভাল নয় কি ?

মাঝে মাঝে বই পড়তাম বা গান গাহিতাম। আমার সেলের সংলগ্ন স্ত্রী ওয়ার্ড ছিল। মধ্যে ছিল উচ্চ প্রাচীর। সেখানে একটি পাগলী পাহাড়ী নারী প্রায় গান গাহিত। তাকে চোখে দেখবার উপায় ছিল না কিন্তু সুললিত কণ্ঠের গান বড় ভাল লাগত। আমি আমার নির্জন সেলের উচু জানালায় বসে। ঝমঝম. ঝমঝম, বৃষ্টি পড়ছে। হিমালয়ের নীরব নিশীথে অদেখা সেই পাহাড়ী নাবীর গান শ্রাবন ধারার ঐক্যতানে আমাকে কারাগারের বন্ধন থেকে কোন্ সুরলোকে বহন করে নিয়ে যেত জানি না।

প্রাচীরের এধারে আমি ও অনন্ত সময় কাটাবার জন্য একটা টেনিস বল নিয়ে লোফালুফি খেলা করতাম। মধ্যে মধ্যে বলটা প্রাচীরের ওধারে মেয়েদের ওয়ার্ডে পড়ে গেলে

গুর্খা প্রহরী "এ ময়াদি, এ দিদি, গোলি ফেকনু" বলে হাঁক দিত ও সঙ্গে সঙ্গে বল এ দিকে এসে পড়ত। ময়া হ'ল একটী পাহাড়ী মেট কয়েদিনী। নারী ওয়ার্ডে শিশুর কান্না শুনতে পেতাম। মধ্যে মধ্যে ঠক ঠক করে প্রাচীরের গায়ে শব্দ হ'ত, প্রত্যুত্তরে এদিকে শব্দ করায় শুনলাম খয়াদি প্রসূতির জন্য কিছু খাবার চায়। আমরাও কিছু মাখন রুটী প্রাচীরের ওধারে ফেলে দিতাম ও এই সাহায্যদানে তৃপ্তি পেতাম। একদিন স্ত্রী ওয়ার্ডের জমাদারণীর সামনেই ভুল করে খাবার পড়ায় সে জমাদারকে বলে দিল। বুড়া গুর্খা আমাদের সাবধান করে দিয়ে বললে, বাবুজি, জেলার জানলে আপনাদের একটু মিষ্টী গান বা সুর, একটু সুন্দর রূপ, দরদ, আন্তরিক ব্যবহার, বন্দী জীবনে তার মুল্য যে কত, মুক্ত জীবনে বোঝা দুঃসাধ্য। বাহিরে যে এগুলা, শুধু আমাদের ভোগের জন্য পথ চেয়ে থাকে, তাই পায় প্রাচুর্য্যের অবহেলা। বন্দী জীবনে এ সব ভাল লাগে, যখন তাদের পাওয়া যায় সামান্য ও ক্ষণিকের জন্য।

দার্জিলিঙ জেলে দিনগুলা মন্দ কটেতে লাগল না। ঘানিঘরের পাহাড়ী কয়েদী সর্দার আগগণের সঙ্গে ভাব হল। উলবোনা কাঠের কাজ, লোহার কাজ, এমন কাজ নাই যা সে জানত না। একদিন ঘানিঘরে গিয়ে তেল পিষে এলাম, মনে মনে ভাবলাম খণ্ডে রাখা যাক! আর আলস্যে দিন কাটিয়ে অত পুষ্টীকর খাদ্য হজম হত না। আমাদের ত কিছু কাজ ছিল না। বাঁকুড়া জেলে কবিতা রচনা করতাম, এখানে এসে দৃশ্য দেখে দেখেই

* নামে ভীষণ বদনাম দেবে।

দিন কাটত, প্রাণভরে শুধু দেখতাম। লেখবার আগ্রহ আসত না। কুতুবদিয়ার সাগর তীরেও ঠিক এই রকম অবস্থা ছিল। তাই মনে ভাবি, শিল্পীর কল্পনা জাগে শুধু প্রাচুর্যে নয়, অভাবে, কেবল মিলনে নয়, বিরহে, বেদনাব মধ্যে। পাওয়া না পাওয়ার ছন্দ না থাকলে জীবনের আনন্দ কোথা ?

আমায় যে খাবার দিত, সে ছিল একটী নেপালী বালক, নাম হিমনারায়ণ। শুনলাম, পল্টনে প্রহরী অবস্থায় ঘুমানব জন্য তার সাজা। সে আমায় বিছানা করে দিত, ব্যথা করলে মাথা টিপে দিত, তার বাড়ীর কথা গল্প কবত। তাব কাছে নেপালী ভাষা শিখলাম ও তাকে কিছু ইংবাজী শেখালাম। খাদ্যের ভাগ দিতাম, সেও আমার ছোট ভায়ের মত একান্ত অনুগত হয়ে পড়ল। জেলেব মধ্যে যেন একটু স্নেহ মায়ার বন্ধন অনুভব করলাম। যখন বাড়ীর কথা, মায়ের কথা বলতে বলতে তার চোখ ছল ছল করত, এক পুত্র শোকাতুরা পার্বতী জননীর কল্পিত ছবি আমার মানস চোখে ভেসে উঠত। যখন সে অন্য কাজে বদলী হয়ে গেল, মনটা আমার ফাঁকা লাগল।

কি এক অপরাধে তার সাজা হয়েছিল, দেখতাম ডাণ্ডাবেরী অবস্থায সে চলেছে, মনে কষ্ট হ'ত। শেষে একদিন সে হাসিমুখে সেলাম করে বললে, বাবুজী আজ আমার মুক্তির দিন। বাহিরে চললাম, কিন্তু আপনার মেহেরবানী কখনও ভুলবো না

দেখলাম, পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে কখনও দৃষ্টিপথে,

কখনও অন্তরালে, সে উঠে গেল কারাগারের প্রাচীরের বাহিরে মুক্ত পৃথিবীতে, মানুষের সমাজের মধ্যে। হয়ত তার মায়ের শূন্য ক্রোড়ে সে পুনরায় আশ্রয় পাবে। এ কত সুখের, কত আনন্দের কথা। তবু মনটা কেন শূন্য বোধ হয়। দূরে আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে স্তব্ধ উদাস ভাবে শুয়ে আছে ওই হিমালয়, চারিদিক শূন্য ম্লান মৌন- আমি যেন নিস্তেজ সূর্যের পানে চেয়ে, একা দাঁড়িয়ে আছি, হিম শীতল ধরিত্রীর বুকে।

দিনের পর দিন চলেছে, অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে। বাড়ী থেকে চিঠি পেলাম, বড়দা মুক্তি পেয়েছে, তবে প্রফেসরী নিষিদ্ধ। বেশ হ'ল, বড়দা শিক্ষকতা করতে পারবে না, আমি পারব না ছাত্র হতে। যা হোক, বাবার উদ্বেগ কিছু কম হবে। শুনলাম, বাংলার গভর্ণর লর্ড রোলাণ্ডসে জেলে আমাদের দেখতে আসছেন। ভাবলাম, বাঙ্গালী বিপ্লবী কি অদ্ভূত জীব, তাই দেখবার তাঁর সাধ হয়েছে। জেল রঙ হতে লাগল। কয়েদীদের কাপড় জামা সব পরিষ্কার হল। নালাগুলায় চুন পড়ল, জেলার ব্যতিব্যস্ত, ভয়ে সন্ত্রস্ত। প্রাতে সাড়ে নটায় গভর্ণর এসে প্রথম যোগেনদা পরে অনন্ত ও শেষে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমার নামের ফাইলে, কি কি অপরাধে আমার অবরোধ, তার তালিকা ছিল। ভীষণ ভীষণ অপরাধের মধ্যে এ কথাও লেখা ছিল যে প্রফেসরকে প্রহারে লিপ্ত থাকার ও আর এক প্রফেসরকে এক্স, ওয়াই, জেড নাম দিয়ে অপমান করার জন্য আমি অপরাধী। প্রথমটা একেবারে মিথ্যা ও দ্বিতীয়টী কি করে ভীষণ অপরাধ হ'ল, আমার

বুদ্ধির অগম্য। যা হউক, তিনি হেসে বললেন, এক্স, ওয়াই, জেড্‌। লেখাপড়া বা কাজ কি করি জিজ্ঞাসা করায় বললাম বই দেয় না, কাজও পাই না।

সেলটী প্রেসিডেন্সি চুয়াল্লিশ ডিগ্রি বা বাঁকুড়া জেলের সেল অপেক্ষা সামান্য বড় ও পিছনের দিকে জানালা থাকা সত্বেও, গভর্ণরেব মতে, অতি ক্ষুদ্র ও আলো হাওয়ার অভাব। যা হোক ব্যায়াম ও ড্রিল করার ও ছুতাবের কাজ করবার ব্যবস্থা হুকুম হ'ল। আমাদেব এতে ভালই মনে হ'ল। কেন ধৃত হয়েছি, জিজ্ঞাসা কবায়, অনারেবল্ ষ্টীফেনসনকে দেখিয়ে বললাম, ওকেই জিজ্ঞাসা করো। জিজ্ঞাসা করলেন, বিজ্ঞানের বই পড়তে চাই কি না, দার্জ্জিলিঙ্গে সাধারণ পাঠাগার থেকে বই আনার ব্যবস্থা কবে দেবে শুনে মনে হ'ল, সব কথাই যে ঠিক অফিসিয়েল ভাবে কহিলেন, তা নাও হতে পারে, হয়ত ব্যবহারে সৌজন্য ও ভদ্রতার স্পর্শ আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত যত ভালই লোক হোক না কেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরাট যন্ত্রের অংশ হলেই মনুষ্যত্বের কিছুই অবশেষ থাকে না, যদি না কেউ প্রবল স্বাধীনচেতা হয়। কিন্তু সে রকম লোক ত গভর্ণর হয় না। অন্য জেলের তুলনায় দার্জ্জিলিঙ জেলে আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা সত্বেও তিন নম্বর রেগুলেশনের রাজবন্দীদের যেভাবে রাখার নির্দেশ আইনে আছে, সে হিসাবে গভর্ণমেণ্ট যে ভীষণ বেআইনী কাজ করছে, এটা মনে মনে যে কোনও রাজকর্ম্মচারীর বুঝতে দেরী হওয়া উচিত নয়। সাম্রাজ্যবাদ ত এক অতিকায়

রাষ্ট্রযন্ত্রের দানব, তার মধ্যে মানবত্তা পিষে ফেলা হয়।

হজম শক্তি হ্রাস পেতেছিল। এখন কাঠের কাজ করতে রাঁদা বাটালী চালিয়ে, ড্রিল ও ব্যায়ামে শরীরে একটু শক্তি ফিরে এল। 'বুক' কাঠ এল, আরাম চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি প্রস্তুত করতে লাগলাম। নিজ হাতের তৈরী বলে সেগুলি ব্যবহার করতে বেশী ভাল লাগত। কেনা জিনিষে এ আনন্দ পাওয়া যায় না। অনন্ত ব্যায়ামের জন্য মুগুর চাহিল। কিন্তু জেলর বেচারার দারুণ ভয় হল, ওই মুগুর তার মাথা ভাঙ্গবার জন্য সদ্ব্যবহার হতে পারে ভেবে। কাঠের কাজের জন্য বাটালী আদি দিতেও তার ওই রকম আপত্তি। কিন্তু গভর্ণরের নির্দেশ, কাজেই সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কড়া হুকুম হল সব দিতে। বন্দী হয়ে এত জিনিষের অপচয় করবো, এ জেলরের প্রাণে সহ্য হত না। ফ্ল্যানেলের সার্ট পরে জুতা পায়ে আমরা যখন হাবিলদারের কাছে ড্রিল করতে সজোরে হাত ছুড়তাম ও সশব্দে পা ফেলতাম, অফিস ঘরে কাজের মধ্যেও জেলারের কানে সে শব্দ প্রবেশ করে মরমে বাজত ও প্রায়ই তিনি বাহিরে এসে কাষ্ঠ হেসে বলতেন, মশায় অমন করে মার্ক টাইম করলে জুতা টিকবে কেন, অমনভাবে হাত ছুড়লে জামা কাপড় যে ছিঁড়ে যাবে।

নূতন সহকারী জেলার এলেন, নাম জিতেন ব্যানার্জি, নানা গল্প করতেন ও মাঝে মাঝে কাজ পিছিয়ে পড়লে আমাদের সাহার্য নিতেন। দিল খোলা বন্ধু। তাঁর চার বৎসরের

ছেলেকে এনে দিয়ে বললেন, 'খোকা, এঁরা তোমার কাকা'। ব্যাস আর দেখে কে, সেদিন থেকে খোকা তার তাজা কচি প্রাণের স্পর্শে আমাদের মাতিয়ে দিলে। যখন তখন সে ছুটে আসত ও দূর থেকে লাফ দিয়ে বুকে ঝাপিয়ে পড়ত। বয়স্ক বলে আমাদের গ্রাহ্য করত না ও তার খেলায় যোগ দিতে বাধ্য করত আর তার সাথে না খেললে অভিমানের কান্নায় আমাদের পাগল করত। আমাদের শূন্য কারাজীবনে কোথা থেকে এই খোকা এসে তার আব্দার উপদ্রবে বেশ একটু ঘুর্ণি মাতন সৃষ্টি করলে। সে কাছে এলেই কবির গান মনে আসত,

"ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা॥"

প্রায়ই সে তার দিদিমার কাছ থেকে মিষ্টি আনত ও এমন দিন যেত না, যেদিন খোকার কাকার পাতে খাওয়া না হ'ত। জেলর বা সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট এলে সে লেপের মধ্যে লুকিয়ে চুপটী করে থাকত, যেন কেউ নাই। শেষ এমন হ'ল, অসুখ করে খোকা না এলে আমাদের যেন দিন কাটতে চাহিত না। যেখানেই যাই, পুলিশের লোক হোক, জেলেরই লোক হোক, অনেক অমানুষ দেখছি তেমনি মাঝে মাঝে জিতেনবাবুর মত সত্যকারের ভাল মানুষ দেখতে পেতাম। তাই মনে করি, মানব সমাজের বাঁচবার আশা শেষ হয়নি। মানুষ শৈশবে কিছু

জানে না কিন্তু যেমন বড় হয়, তাব ভাল বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষগুণের উপর। যারা যৌবনে ভাল লোক হয়ে উঠে, জেল বা পুলিশে গেলেও তারা সকলে মন্দ হয়ে যায় না। তাই ত জিতেনবাবুর মত এসিষ্ট্যাণ্ট জেলর পেয়েছিলাম। কতটুকু বা চেনাশুনা হয়েছিল। তবু ওইতেই কত আন্তরিকতার আভাষ পাওয়া যায়। অন্তর বলি, আত্মা বলি, দরদী মন হলে পরস্পর পরিচয়ের বিলম্ব হয় না।

আবার কলিকাতায় চক্ষু চিকিৎসার্থে

চক্ষু পীড়ায় ভুগছিলাম। সিভিল সার্জন হুকুম দিলেন, মেডিক্যাল কলেজের বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার মেনার্ডের কাছে কলিকাতায় যেতে হবে। কয়েকদিন পরে গুর্খা মিলিটারী হাবিলদার ও তুইটী সশস্ত্র প্রহরী সমেত জেল গেটের বাইরে এলাম। জেলের কয়েদী ও প্রহরীরা, অনেকেই আমার অনুগত ছিল। তারা জানত দেশ উদ্ধারের প্রচেষ্টার জন্য আমি বন্দী, আমায় শ্রদ্ধা জানিয়ে অভিবাদন দিলে। আঁকা বাঁকা পথে উঠে চলেছি, সহকারী জেলারের বাসার কাছ থেকে 'কাকা কাকা' আহ্বান এল। খোকা ছুটে এসে আমায় তাদের ঘরে ধরে নিয়ে এল। খোকার দিদিমা, 'এস বাবা এস' বলে চিবুক স্পর্শ করে মাথায় হাত বুলিয়ে বসালেন। স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিতে তাঁর পায়ের কাছে মাথা নত হয়ে গেল, যে মাথা কারুর কাছে

হেঁট হতে চায় না। তিনি চোখ মুছে বলতে লাগলেন, "তোমাদের জন্য খোকা ত অস্থির, দিন রাত কাকা, কাকা করে পাগল, এমন কি ওর দিদিমাকেও ভুলবার জোগাড় করেছে।

আশ্চর্য মানুষটী! যেন বাংলা মায়ের আনন্দময়ী মূর্তি, কোথাকার ছেলে আমি, সম্পর্ক নাই, পরিচয় নাই, তবু কি গভীর মাতৃ স্নেহ, কত অগাধ করুণা! কাছেই জীতেনবাবুর স্ত্রী ঈষৎ অবগুণ্ঠনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকেও বৌদি বলে নমস্কার করলাম। স্নেহের অনুরোধে কিছু মিষ্টি খেয়ে যখন উঠে আসছি, খোকার দিদিমা বলতে লাগলেন, 'তোমার মা নাই বাবা, থাকলে, এত বড় দুঃখের আঘাত কি করে তিনি সইতেন জানি না। বললাম "কে বলে আমার মা নাই, এই ত আপনি রয়েছেন।" ভাবলাম, এমন মাতৃস্নেহের আস্বাদ কতদিন পাইনি! শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে আবার বলতে লাগলেন, "কতকাল তোমাদের বন্দী থাকতে হবে, জানি না, ভগবান করুন. শীঘ্র ঘরের ছেলে, তোমার বাবার কাছে, ঘরে ফিরে যাও", চক্ষু মুদ্রিত করে মাথায় হাত দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন। বেরিয়ে আসছি, খোকা কান্না জুড়লে, বলে 'কাকা' তোমার সঙ্গে যাব'। পাঁচ বৎসরের খোকাকে কি বোঝাই, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার আমার উপায় নাই, আমি বন্দী! বিদায় নিয়ে প্রহরীদের সাথে বাগানের পথে উঠে আসছি, খোকার কান্না কানে আসে, আর আসে তার মা ও দিদিমার সান্ত্বনা, 'কাকা তোমার বেড়াতে যাচ্ছে, আবার দেখা হবে।' সে দেখা আর হয়নি।

মনেব মধ্যে কবির কথা উদয় হ'ল,

"তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হ'ল।"

আজ যদি হঠাৎ কোনও বিয়াল্লিস বৎসবের প্রৌঢ়েব সহিত দেখা হয় আর তিনি যদি হন সেই খোকা, পরস্পব চেনা কি সম্ভব ?

দার্জিলিঙ ষ্টেশন থেকে পাহাড়ী ছোট বেলগাড়ী ছাড়ল। ঘুবে ঘুরে উঠতে লাগল ঘুম ষ্টেশনের দিকে। দূবে প্রান্তসীমানায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চির তুষারাচ্ছন্ন শুভ্র শৈলচুড়া শ্রেণী ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টীগোচর হতে লাগল। মাঝে মাঝে রক্ষী মিলিটারী পুলিশ প্রহরীদের সঙ্গে গুর্খা ভাষায় গল্প করতে লাগলাম। একে স্বদেশী বাবু, বৃটিশেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ আয়োজন করার অপবাধে রাজবন্দী, তার উপব তাদের পাহাড়ী ভাষায় কথা কহিতে শুনে প্রহরীদের মন গেল গলে। এমনি বারে বারে দেখেছি, সাধারণ পুলিশ বা মিলিটারী প্রহরীর সঙ্গে সত্যকার সহানুভূতি দিয়ে কথা কথা কহিলে তাদের অনেকেরই বাহিরের আবরণের কাঠিন্য গলে যায় ও মন বেরিয়ে আসতে বিলম্ব হয় না। তারা আমায় খাতির করলে প্রচুর ও তাদের ঘরের সুখ দুঃখের অনেক কথা বলতে লাগল। অধিকাংশই অতি দরিদ্র বা দুটা অন্নের জন্য তারা আসে ও চাকরী নকরী বজায় রাখতেই প্রাণান্ত হয়। সব সময়ই তাদের মনে জেগে থাকে দেশের ঘরের কয়েকটি ক্ষুধার্ত্ত প্রিয় মুখ।

বর্ষা তখন শেষ হয়ে এসেছে। সর্বত্র প্রগাঢ় শ্যামলতা। তারই মাঝে মাঝে সুউচ্চ গাছের শাখায় টকটকে লাল রোজনে নতুন ফুল ফুটে রয়েছে। ঝরণাগুলি যৌবন চঞ্চলা ফেনিল উল্লাসে নেচে চলেছে, আকাশে ও হিমালয়েব বুকে বহু স্থানে মেঘ ছড়িয়ে আছে, দার্জিলিঙ সহর ক্ষণে দৃষ্টীপথে, ক্ষণে আড়ালে লুকাচরী খেলে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে শেষ বিদায় নিলে। গাড়ী ক্রমে কারসিংএ নেমে এল। ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগছিল, হোটেলে বসে রুটী সমেত চা পান করলাম। রক্ষীরা দ্বারের নিকট দাঁড়িয়ে রহিল সসম্মানে। যেন দেহরক্ষী। কারুর বুঝবার উপায় ছিল না, আমি বন্দী! হাবিলদাব বিল চকিয়ে দিল। গাড়ী নেমে চলল এঁকে বেঁকে সমতল ভূমির পানে। হওয়া ক্রমে ভারী হয়ে এল, পাশের জঙ্গল ক্রমে হল গভীরতর, গাছগুলি হল উচ্চতর। ক্রমে সমতল, সোজা রেল লাইনে শিলিগুরী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

একখানি ইণ্টার ক্লাস গাড়াতে প্রহরী সমেত উঠে কামরার খোলা জানালার ধারে বসে বসে দূরে উত্তরে হিমালয়ের পানে উদাস চোখে চোখে দেখতে লাগলাম। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আঁধারে হিমালয়, তার বিরাট দিগন্ত জুড়ে শুয়ে আছে, তার বুকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। বিজলির চমকানি। চাহিতে চাহিতে মনে করুণ মায়া জেগে উঠল। মনে হল, ওই হিমালয় এই নির্বাসিত পথিককে অতিথির মত কত আদরে বুকে স্থান দিয়েছে, বিগত নিঃসঙ্গ সেল বাসের বেদনা ক্লান্ত মনে স্নেহের সান্তনার প্রলেপ

দিয়ে সুস্থ করেছে, অর্দ্ধমৃত মনে পুনর্জীবনের সাড়া জাগিয়েছে। হিমালয়, কত বিরাট, মহান, আমি কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ মানব সন্তান, তবু যেন কত অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা।

মনে পড়তে লাগল, পাহাড়ী বালক হিমনারায়ণকে, যে আপন ভায়ের মত কত সেবাশুশ্রূষা করেছে, অদেখা পাহাড়ী তরুণী পাগলীর গানের মন গলান করুণ সুর, সে খয়াদি, কানে যেন বাজছে খোকার কাকা কাকা ধ্বনি, তার দিদিমায়ের কথা. মনে হল ওরা যেন আমার কাছে বিদায় নিয়েছে। ট্রেণের দোলানীতে প্রগাঢ় নিদ্রায় রাত কেটে গেল। ঘুম ভেঙ্গে দেখি দুপাশে দিগন্তে সমতল প্রান্তর আকাশে মিশেছে। সবুজ ধানের উপর বাতাস ঢেউ খেলে যাচ্ছে। রক্তিম পূর্ব আকাশে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ সূর্যের উদয় হচ্ছে। প্রণামে হাত কপালে এসে ঠেকল। মনে বললাম হে সবিতৃ দেব, তোমার অসীম তেজের আমি অতি ক্ষুদ্রতম বিকাশ, তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি। ক্রমে গাড়ী এল সান্তাহার ষ্টেশনে।

সারা ট্রেনটীতে একটী ইউরোপীয় রিসার্ভ কামরা ব্যতীত আর কোন ইণ্টার ক্লাসে স্থান ছিল না। সেইটীতে উঠে দখল নিলাম। প্রহরীরা সকলে মিলিটারী ইউমিফরমে সজ্জিত ছিল, শুধু আমি ছিলাম ধুতী পাঞ্জাবী পরে। কয়েকটী ফিরিঙ্গি বেশ-ধারী বাঙ্গালী বাঁকা গলায় বলল, নেটিভ লোক আমরা ইউরোপীয় কামরায় কেন, এখনই যেন অন্যত্র যাই। গুর্খা হাবিলদার তার খাপ থেকে কুকরী খুলে. যাব না বলে, হুমকী দিয়ে উঠল।

তখন তারা ফিরিঙ্গী গার্ড ডেকে এনে আমাদের নামিয়ে দিতে চেষ্টা করলে। নিরুপায় হয়ে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, এই গাড়ীতে একটু স্থান নিলে আমার অসুবিধা হবে কিনা। আমি দুঃখের সহিত বললাম, অসুবিধা কি ? যে টুকু জায়গা খালি আছে, বসুন না আপনারা, কিন্তু ফিরিঙ্গির ছদ্মবেশে অন্যায় সুবিধা ভোগ করতে আপনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। তাদের একজন বলে উঠল, সুবিধাটা ছাড়াই কি সুবুদ্ধি? মনে ভাবি, শুধু বেশ নয়,ভাষা ও কৃষ্টীর মধ্য দিয়ে ইংরাজ এই যে অনুকরণকারী ইঙ্গ বঙ্গ সমাজ সৃষ্টি করেছে, আজও মনে করে, এরা সাধারণের উর্দ্ধে যেন এক উচ্চতর পৃথক জাতি, যেন প্রায় শাষক জাতি বা তাদের উত্তরাধিকারী। তাই আজও স্বাধীন ভারতে, ইংরাজ গেছে কিন্তু শিক্ষার নামে বৈষম্য ও বিশেষ সুবিধার কায়েমীস্বার্থ বজায় রাখতে, ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের বহু লোকের চেষ্টার ত্রুটী নাই। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট বৈজ্ঞানিক বা প্রফেসর থেকে উকিল ডেপুটী ব্যবসায়ী কেরাণী পর্য্যন্ত কোনও স্তরের লোকের মধ্যে এর ব্যতিক্রম নাই। তারাও নেকটাই এঁটে সাহেব সেজে বাকা ঠোঁটে ইংরাজী বলে সাধারণের উপর প্রভুত্ব চালাতে চায়। তাদের উপর রাগ করব কি ! লজ্জায় ধিক্কারে আমার অন্তর যেন মাটীতে মিশে গেল। আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে বাইরের পানে চেয়ে বসে রহিলাম। ষ্টেশনে কুলীরা মাথায় ভারী ভারী বোঝা বইছে, পদ্মাতীরের শরতকালের হাওয়াতেও তাদের সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে, নারীযাত্রীরা কাঁখে ছেলে, হাতে পুঁটলী নিয়ে উদ্বিগ্ন

মুখে গাড়ীতে স্থান পাবার চেষ্টা করছে, চাষীরা নগ্ন গায়ে খালি পায়ে হাঁটু অবধি ময়লা ছোট কাপড় পরে সবজির বোঝা নিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ীতে একটু স্থান পেতে, তাদের অধিকাংশের শীর্ণ দেহে অতি পরিশ্রমের ও খাদ্যে পুষ্টির অভাবের ফলে, দড়ির মত পাকান পেশী, পেটগুলা পিঠে যেন লেগে গেছে, চোখে মুখে হতাশা। গার্ড হুইসল দিল, গাড়ী ছাড়ল, ইউরোপীয় বেশধারীরা সিগারেট ধরালে, বাহিরে থেকে ইঞ্জিনের ধোঁয়া আসছে, ভিতরে সিগারেটের ধোঁয়ায় কামরার বায়ু তখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

শিয়ালদহ পৌঁছিলাম। বাড়ীতে দেখা করে যেতে চাই বলায়, প্রহরী গুর্খারা আপত্তি করলে না, বিশেষ যখন শুনলে আমার বাড়ী ষ্টেশন থেকে অতি নিকটে ও পথেই পড়ে। বাবার দেখা পেলাম না। কলিকাতায় আসছি শুনে পলিটিক্যাল সেক্রেটারীর কাছে আমার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি নিতে রাইটাস বিল্ডিংএ গেছেন। ভাইবোনেরা আমার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল দেখে একটু আস্বস্ত হ'ল, পূর্ব্বে ভীষণ রোগা হয়ে গেছলাম। আমার বিচ্ছেদ তাদেরও তখন খানিকটা সহে গেছে। প্রহরীদের খাইয়ে ও ভাইবোনেদের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। ক্রমে ধর্মতলা এসপ্ল্যানেড পেরিয়ে ময়দানের পথে চলেছি। সবুজ ধরণীকে বুকে নিতে যেন শেষ শরতের আকাশ মেঘে মেঘে নেমে আসছে। শ্যামল তৃণগুলি যেন তাতে সাড়া দিয়ে আনন্দে আত্মহারা বুকে শারদ লক্ষ্মীর চরণ-পাতের

প্রত্যাশায়। ইচ্ছা হতে লাগল, ওই মাঠের বুকে ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে থাকি, আমিও যদি বুকের মাঝে ওই কোমল স্পর্শ পাই,কানে যদি শুনতে পাই সে চরণ ধ্বনী। পল্লীতে পল্লীতে নিশ্চয় এত দিনে শারদীয়া আগমনীর সুর বাজছে, স্কুল কলেজের ছুটি হয়ে গেছে, যে যার ঘর পানে চলেছে, মেয়েদের জন্য নূতন বাহারী শাড়ী ও ছেলেদের জন্য রঙ্গিন জামা নিয়ে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে, আর আমি চলেছি কারাগারে। রেড রোডে গাড়ীর চাকা ঘুরতে ঘুরতে সে দিকে এগিয়ে চলেছে আমোঘ গতিতে। জেল ফটক খুলে বন্ধ হল, কারাগার আমায় তার দানবীয় জঠরে গ্রাস করে ফেলল, জানিনা কত দিনের জন্য। বাহির্ জগত সম্পর্কে আমি মৃত, অবলুপ্ত। গুর্খা হাবিলদার ও সঙ্গী প্রহরী দুজন আমাকে সৈনিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বাহিরে চলে গেল। ইউরোপীয় ওয়ার্ডার কে সেলাম না করে আমাকে সম্মান দেওয়ার জন্য সার্জেনের মুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। নিয়ে এল আবার সেই পূর্ব পরিচিত বীভৎস চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে। দেহে ও মনে কারাবাস অনেকটা তখন সহজ হয়ে এসেছে। প্রাতে আটটায় কুখ্যাত সুপারিটেণ্ডেণ্ট এল জেল-সিপহীরা দমক দিয়ে বলে উঠল 'সরকার সেলাম'। হাত নিচু ছিল বলে, জেলার দু-হাত তুলতে বললে। আমি তার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সুপারিটেণ্ডেণ্টোকে বললাম, দার্জিলিং জেলে ভাল ছিলাম, উত্তম খাদ্য বস্ত্রাদি পেতাম, এখানে এসে শরীর অসুস্থ বোধ করছি, সেজন্য প্রত্যহ কিছু দুগ্ধ পান করতে

চাই। তিনি কাষ্ঠ হেসে বললেন, আমি মোটা হয়েছি, আমার দেহের চর্বি কমান প্রয়োজন। পাল্টা উত্তর দিলাম, যখন তোমার হাতে পড়েছি, আমার দেহের সমস্ত চর্বি তুমি শোষন করে নেবে, সে আমি জানি, তবে ধন্যবাদ দোবো যদি তোমার সুতত্বা-বধান থেকে শীঘ্র আমায় অব্যাহতি দিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দাও। ক্রূর হেসে সে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে ওয়ার্ডাব আমাকে সেই জেল থেকে চুয়াল্লিশ ডিগ্রির নির্জনতর অংশে আর একটা সেলে নিয়ে গেল। হয়ত ভাবলে, দার্জিলিং জেলের ব্যাবস্থার কথা পাছে অন্য রাজ বন্দীর মধ্যে প্রচার হয়ে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। চুয়াল্লিশ ডিগ্রির সে অংশে কোন বন্দী ছিল না। সমুখে জেলের সরু পথ ও উচ্চ প্রাচীর, ওপারে একটা আধমরা গাছ, শুকনা ডাল গুলা নিয়ে কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে, তাতে বসে ক্বচিৎ একটা কাক তার কর্কষ ডাকে, নিস্তব্ধতার মধে ক্ষনিকেব তরে তরঙ্গ তোলে, না পেতাম একটা কথা কহিতে, না পেতাম কারুর মুখ দেখতে, শুধু লক্ষ্য করতাম সার্জন্টা দূরে বসে আমাব দিকে তাকিয়ে আছে। আব দেখতাম মেথর যখন টুকরি সাফ করতে আসত, আর আসত খাবার পরিবেশকেরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুচার মিনিটেব জন্য। দিনের পর রাত, রাতের পব দিন, আসে, একটা বই নাই, একটা খাতা পেন্সিল নাই, একটা মানুষ নাই, মনে শুধু চিন্তা, চিন্তা, আর চিন্তা। কত চিন্তা করতে পারি? দুদিন পবে দুটি হিন্দুস্থান বন্দুকধারী প্রহরী সমেত জেল ফটকের বাহিরে এসে মেডিকাল কলেজে চললাম। চক্ষু পরীক্ষা করতে হবে। গাড়ী যখন

ময়দানের রাস্তায় চলেছিল, প্রভাতের আলোকে মাঠের উজ্জ্বল শ্যামল-শ্রী। প্রত্যেক তৃণ-কণাটী আমার পরিচিত, এক বিশ্ব-পিতার সম্পর্কে তারা যেন আমার ছোট মূক ভাই, নীরব ঈঙ্গিতে তারা যেন আমায় বারে বারে তাদের মধ্যে ডাকে। ওয়েলিংটন ষ্ট্রিটে গগনদাকে ইসারা করলাম, বাড়ীতে খবর দিতে। তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না, কোথা, চলেছি। শুধু হাত নেড়ে জানালেন, আমায় দেখতে পেয়েছেন। চক্ষু পরীক্ষার ঘরে দেখি বেশ ভিড়। অনেকে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে দুটী ফিরিঙ্গি ছেলে, বড়টীব বয়স বার ও ছোটটীর দশ হবে। তখনকার মনের অবস্থায় ফিরিঙ্গি দেখলেই রাগ হত, তা সে বালক হলেও। ভাবলাম, ওবা সব সাপেব বাচ্চা, এই দেশেই জন্ম, এই দেশের খেয়ে মানুষ হয়ে, এই দেশকেই ঘৃণা করে। আমরা চাই দেশ স্বাধীন হোক, ওরা চায় দেশ থাক ইংরেজের অধীনে। এই রূপ তীব্র চিন্তায় আমার শবীর ও মন জ্বালা করছিল—হঠাৎ দেখি দুটী-বলকের মুখ, নম্র সুন্দব, তাদের নীল স্বচ্ছ নয়ন, সজল হয়ে আমার মুখের পানে বিস্ময়ে চেয়ে আছে। পরিধানে পরিষ্কার কিন্তু তালি লাগান পোষাক। নিশ্চয়ই গরীব, নহিলে হাসপাতালে আসবে কেন? এরা এমন ভাবে আমাকে দেখছে কেন? প্রথম আশ্চর্য লাগল, পরক্ষণেই বুঝলাম, আমার দুপাশে সঙ্গীন ধারী প্রহরী আছে বলে, ওরা ভেবে পাচ্ছে না, আমি কে? বড়টী একটু সাহস করে এগিয়ে এসে ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করলে, আপনি কে মশায় আপনার সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী কেন? মুস্কিল! আমি এদের কি

বলি ? অল্প কথায় বুঝান যায় অথচ পদমর্য্যদার লাঘব না হয়, তাই উত্তর দিলাম, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আয়োজনের অপরাধে আমরা রাজবন্দী। বালকটী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় আপনাকে রেখেছে মশায় ?' উত্তর করলাম 'জেলে।' 'জেল ! প্রিজন্, চারি দিকে যার উচ্চ প্রাচীরেঘেরা !' বলে শিউরে উঠে আবার বললে, 'কতদিন এমন রেখেছে, কতকাল এমন রাখবে?' 'রেখেছে দু বৎসর হ'ল, রাখবে কতদিন জানিনা।' তাদের মুখের পানে চেয়ে কথাগুলি ধীরে ধীরে বললাম। ছোটটী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, ছল ছল চোখে সে এবার বলতে লাগল, 'নিশ্চয় তোমার খুব কষ্ট হয়, তুমি ভদ্রলোক, তোমাকে প্রিজনের ভিতর রেখেছে, আহা !' ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আয়োজন, এত বড় ভয়ানক একটা কথা তারা কানেই তুললে না। কিন্তু প্রিজনের ভয়াবহ জঠরে আমার মত একজনের বন্দী থাকা, কিছুতেই তারা কল্পনায় আনতে পারছিল না। জানিনা স্কুল মাষ্টারের নিকট বা পুস্তকে কারাগার সম্বন্ধে তারা একটা অস্পষ্ট বীভৎস ধারণা পেয়েছিল' যার জন্য আমার মত এক জন অনাত্মীয় অপরিচিত বিজাতীয়েরও বাস, মনে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হচ্ছে। আমি যে একজন 'ইংরাজ নয়, ফিরিঙ্গী নয়' একেবারে একজন বাঙ্গালী আমি জেলে থাকি, বাহিরে থাকি, তার ত কিছু এসে যাওয়া উচিত নয়, বরং সে জন্য খুশী হওয়া উচিত। সেই রকম শিক্ষাতেই ত তাদের গড়ে তোলা হয়। কিন্তু তাদের বালক মন এখনও ত ফিরিঙ্গী মন হয়ে ওঠেনি- তাই এই সমবেদনার অশ্রু

মনে বললাম, ভগবান, তুমি মন্দিরে, গির্জায়, মসজিদে আছ কিনা জানি না, কিন্তু তুমি যদি এই মানব অন্তরের সমবেদনার মধ্যে না থাক তবে আরে কোথাও তোমার স্থান আছে কিনা বলা দুঃসাধ্য। চক্ষু পরীক্ষা হয়ে গেল। দুপাশে দুই প্রহরী সমেত হাসপাতালের বাইরে চলে আসছি, ছেলে দুটী আমার কাছে ছুটে এল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, ভীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আপনাকে ওরা কোথায় নিয়ে চলেছে মশায়? ম্লান হেসে উত্তর করলাম, 'পুনরায় চলেছি প্রিজনে। হ্যাঁ! উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা প্রিজনে আবার আপনাকে বদ্ধ থাকতে হবে?' বলতে বলতে ঠোট দুটী কেঁপে তার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, ছোটটীর চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরছে, বড়টী অনেক কষ্টে সামলাচ্ছে। তারা যেন তাদের ব্যাগ্র বাহু দিয়ে প্রহরীদের কবল থেকে আমায় উদ্ধার করতে চায়। কিছুতেই সেই মরণের মত অন্ধকার বিভীষিকাময় প্রিজনের জঠরে ছেড়ে দিতে তাদের মন চায় না। ঘর ঘর শব্দ করে আমার গাড়ী যেন অমোঘ গতিতে ছুটে চলল কারাগারের পানে।

রেড রোডে গাড়ী চলেছে, দুপাশে ময়দানের বুক শ্যামল তৃণে ভরা, উপরে আকাশ সজল নীল চোখের আকুল দৃষ্টিতে, যেন ওই দুটী বালকের মত আমার দিকে চাহিছে। ইচ্ছা নয় আমি প্রিজনের মধ্যে আবার ফিরে গিয়ে আবদ্ধ হই।

রাত্রে নির্জন সেলের অন্ধকারে নিদ্রার জন্য যখন শুনলাম, মনে আর ফিরিঙ্গি বা কোনও জাতিরই উপর ঘৃণা করতে পারলাম না। আমার অন্তরাত্মার নিকট শুধু এই

প্রার্থনা জানালাম, কোনও দিনই যেন না ভুলি, মানুষ, মানুষ। তারই মধ্যে যেন দেখতে পাই আমার পরমাত্মীয়কে।

এট্রোপিনের ফলে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, কেউ নাই একটা কথা বলি, ওয়ার্ডার প্রহরী পর্যন্ত, কাউকে কাছে পাই না। কয়েদী একবার চা ও দুবার ভাত রুটী দিয়ে যায়, মেথর দিনে তিনবার টুকরীর ময়লা সাফ করতে আসে, ইচ্ছা হত ওদের সাথেও দুটা কথা বলি, আলাপ করি, নইলে মনে হত, বোবা বা পাগল হয়ে যাব। কিন্তু শাস্তির ভয়ে ওরাও কথা বলতে পারে না। সাড়া নাই, শব্দ নেই, দিনরাত চুপ চাপ, সময় আর কাটে না। সকালের রৌদ্র এন্টিসেলের প্রাচীরের গায়ে আসে, বেলা বাড়ে, রৌদ্র মেঝের উপর এসে পড়ে, বিকালে ওপাশের দেওয়ালে ছায়া উঠতে থাকে। না দেখতে পাই সূর্যোদয়, না সূর্যাস্ত। সেলের মধ্যে তালা বন্ধ করে দেয়, রাতে আঁধার নামে, লৌহ গরাদের ফাঁক দিয়ে আকাশের খানিকটা দেখা যায়, তারা গুলা মিট মিট করে জ্বলে, যেন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, কোনও রাতে চাঁদের আলোয় প্রাচীর ঘেরা স্থানটা দেখায় গোরস্থানের মত। কোনও রাতে ঘুম ভেঙ্গে বসে থাকি, কুতুবদিয়ার তীরে তরঙ্গ দোদুল সাগরের কথা মনে আনতে চেষ্টা করি, দার্জলিঙের, হিমালয়ের কল্পনা করবার প্রয়াস পাই, তবু সময় কাটে না, কোনও উপায় পাই না। চোখ বুজে ভগবানের ধ্যান, আত্মপ্রবঞ্চনার মত মনে হয়। সৃষ্টির বাইরে, যাকে দেখতে পাই না, জানতে পারি না,

সেই অসীমের ধ্যান কেমন করে করব বুঝি না। সময় সংক্ষেপের জন্য মানুষ সাইকল, রেল, মোটর গাড়ী, প্লেন আদি কত দ্রুত-গামী যানবাহনের উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু আমার অনেক সময়, কাটে না, আবার ভাবি কেটেই বা কি হবে, সময় ত অফুরন্ত, চলে যায় কিন্তু ফুরায় না। ভবিষ্যত তখনই এগিয়ে আসে বর্তমানে। জানি, আমার এই দুর্বহ বর্তমান অতি তুচ্ছ। অনাদি কালস্রোতে মুহূর্তে মুহূর্তে অতীতে লীন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যাবার পথে সুখে, দুঃখে, কর্মে, অবসরে, ক্লান্তি ও বিশ্রামে যেটুকু দোলা দিয়ে যায়, তা থেকে আমি বঞ্চিত। বর্তমানের

কাছে আমি যেন মৃত।

পুনরায় দার্জলিং জেল

"কল্পনার অনুমানে ধরিত্রীর মহা এক তান,
কতনা নিঃস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষার গিরি, অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বার বার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার॥" রবীন্দ্রনাথ

পুনরায় দার্জলিঙ রওনা হলাম। অন্তর আবার হল হাল্কা, মনে পুনরায় লাগল প্রাণের রঙ। রেল পথে ভ্রমনের সুখে সময় কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, বুঝতেই পারলাম না। জেলে যখন এলাম, সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে। ফটকে প্রবেশ

করতেই কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলের তুলনায়, মনে হল. যেন আপন আবাসে ফিরে এসেছি। বুড়া গুর্খা জমাদার হাসি মুখে সেলাম করল, সানন্দে অভিবাদন জানাল, প্রবাস থেকে স্বগৃহে ফিরলে আত্মীয় স্বজনেরা যেমন জানায়।

শরৎ হেমন্ত গেল, দার্জিলিঙ্গে শীত এসে পড়ল। সারা আকাশ হ'ল মেঘশূন্য গভীব নীল। প্রান্তসীমার ধূসর পর্বত শিখর গুলি শুভ্র তুষারে ঢেকে যেতে লাগল। বাগানের পথে কোনও পথিকের আর দেখা পাওয়া যায় না। জীবনের চাঞ্চল্য আর নাই। সর্বত্র যেন ঘুমের ঘোর লেগেছে। ভোরে তুষার শীতল জলে মুখ ধুতে কষ্ট হ'ত, তবু সে দৈহিক কষ্টের মধ্যে আনন্দের অভাব ছিল না। নিস্তব্ধ দুপুরের রৌদ্রে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে বই পড়তাম, সন্ধ্যায় হিমালয়ের সে বিরাট প্রশান্ত মূর্তিব পানে চেয়ে চেয়ে পায়চারী করতাম। কুতুবদিয়ায় থাকতে সাগরের রূপ. দেখতাম চির-উচ্ছ্বসিত, তরঙ্গে তরঙ্গে অনুক্ষণ দোদুল্যমান। হিমালয় যেন স্তব্ধ মহাতরঙ্গ। হয়ত কোন আদি কালে মহা ভূমিকম্পে ঢেউ খেলে উঠে সংকুচিত ধরিত্রী হঠাৎ স্থির কঠীন হয়ে গেছে। পরে কত যুগ যুগান্ত অতীতে চলে গেছে, সে উত্তপ্ত পৃথিবী শীতল হয়ে জীবের আবাসে পরিণত হয়েছে, কত অনুর্বর মরু প্রাণের অভিযানের কাছে হার মেনে তৃণে, গুল্মে, অরণ্যে, বৃক্ষে, স্নিগ্ধ শ্যামলতায় ভরে গেছে, শিখর গুলি তুষারে ঢেকেছে, ঝরণাগুলি নেচে নেচে নেমে চলেছে,

সমতল ভূমি দিয়ে, বয়ে যেতে সাগরের আহ্বানে। হিমালয়কে যতই দেখতাম, মন হত বিস্ময়ে স্তম্ভিত।

দার্জিলিঙ জেলে কয়েদীদের সঙ্গে মেলামেশার কিছু সুযোগ হয়েছিল। সন্‌মন্‌ ছিল রুটীখানার সর্দার। সে জীবনে তেরবার জেলে এসেছে, বাইরে গেলেই কিছু চুরি করত শুধু জেলে ফিরে আসার জন্য। তার গলার মধ্যে খপর অর্থাৎ এক অদ্ভুত গর্ত ছিল। শুনেছি চুন ও বিট নুনের ডেলা দিয়ে বহু কষ্টে কোনও কোনও কয়েদী এই গর্ত সৃষ্টি করে নেয়। তার মধ্য থেকে সে একদিন পনেরখানা গিনি বার করল, দেখে অবাক হলাম। জলাপাহাড় ও কাটাপাহাড়ের সৈন্য নিবাসে রুটী সরবরাহে বহু টাকা চুরি হয়ে ভাগ হত, এতে সৈন্য ও জেল কর্তৃপক্ষেরও অংশ কম থাকত না। সন্‌মন বলত, বাইরে তার সৎরূপে জীবন ধারণের উপায় নাই, কিন্তু জেলে সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। তার কাছে কেক, রুটী প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী শিখেছিলাম, নানা কাজে তার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল।

একদিন একটী বার বৎসরের বালককে জেলে ধরে আনলে। সুন্দর সুকুমার চেহারা, দেখলে মায়া করে। তার অপরাধ, সরকারী জমিতে ঘাস কেটেছে, বাড়ীর ভেড়াকে খাওয়াতে। সরকারী নিয়ম, তরুণ বন্দীদের পৃথক জেলে নিয়ে যাওয়া। সে জেল ছিল রাজসাহীতে। কিন্তু এক সপ্তাহের সাজার জন্য অতদূরে যাওয়ার অসুবিধা বলে, ঘাগী কয়েদীদের

সঙ্গে তাকে অন্যায় ভাবে রাখা হল। অনেকের এইভাবে সংশোধনের পরিবর্তে চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়।

কয়েদীদের মধ্যে কতক ছিল গুর্খা চাষী, তাদের অপরাধ, সৈন্যের প্রয়োজনে সংগৃহীত হবার পর তারা ছাউনি থেকে পালিয়েছিল। তাদের ঘরের কথা শুনতাম, তারা এত গরীব, ধারণায় আনা যায় না। একজনের এক পায়ের আঙ্গুল ছিল না, বললে, শীতকালে জুতার অভাবে বরফের মধ্যে চলতে আঙ্গুল অসাড় হয়ে খসে গেছে। অনেককে দেখতাম, অত্যন্ত ভাল মানুষ। তাদের চরিত্রে এমন কিছু মন্দ ছিল না, যার সংশোধনের জন্য কারাবাসের প্রয়োজন।

প্রহরীদেব অধিকাংশ আমাদের শ্রদ্ধা করত, জেলাবকে শুধু নিয়মমাফিক সম্মান দেখাত। কয়েদীদের পরিশ্রমে জেলখানাব সংলগ্ন সব্জি বাগানের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে যে আয় হত তা থেকে জেলব চুরি কবত। যোগেনদা এ বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জানালেন। অবশ্য প্রমাণ অভাবে সাজা না হলেও চুরি কিছু দিনেব জন্য কমল। একবার জেলর আমার বিরুদ্ধে তাকে অপমানসূচক কথা বলার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ, জানালেন। এতে গুর্খা প্রহরী আমাব স্বপক্ষে স্পষ্ট সাক্ষী দিলে, বললে, জেলরই মিথ্যা বলেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট চলে যাবার পর, জানালে নকরীর জন্য ঝুটা বাত বলতে পারে না।

সহকারী জেলার জিতেনবাবুর সঙ্গে প্রায় গল্প হ'ত। এক সন্ধ্যায় বটানিক্যাল বাগানের পথের দিকে দেখিয়ে তিনি

বললেন, সতীশবাবু, ওই গাছতলায় একটি তরুণী মেয়ে বসে আছে দেখছেন, ওর কথা শুনুন।

মালচুরীর অপরাধে রেলওয়ে গ্যাং কেসের আসামীদের ভিতর কালীচরণ বলে একজন কেরাণী আছে, ওটি হল তার রক্ষিতা। প্রতি সন্ধ্যায় ওই গাছের তলায় ও অমন ভাবে অনেক্ষণ বসে থাকে। শুনে মনটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল, বললাম, তা অমন করে বসে বসে ও কি করবে, বিয়ে করা বউ ত নয়, বাইরে আর কাউকে জুটিয়ে নিতে ত পারে! পর দিন জিতেনবাবু আবার তাকে দেখিয়ে বললেন, ও সকালে আমার বাসায় এসেছিল, পা জড়িয়ে ধরে বললে, বাবুজি, কালীবাবুর জন্য খাবার এনেছি, জেলের মকাই সিদ্ধ খেতে ওর বড় কষ্ট হবে, খাবারটা যদি ওকে পাঠিয়ে দেন, তবে আপনার দয়া জীবনে ভুলব না।

তখন তার দু চোখ বেয়ে জল পড়ছে। শুনে মনটায় বড় কষ্ট হ'ল। এই যে প্রিয়তমের জন্য স্বহস্তে প্রস্তুত খাদ্য দিতে না পারায় আকুল কান্না, এই যে মিনতি, এ কি নোংরা বলে উড়িয়ে দিতে পারা যায়! বিবাহের কটা মন্ত্র পড়েনি বলেই কি এই আন্তরিক প্রেম, আত্মনিবেদন, সব মিথ্যা, অশুদ্ধ হয়ে গেল! খোকার মা সমস্ত শুনে সজল চোখে মৃদু হেসে বললে, 'আহা! দাও না খাবারটা পাঠিয়ে'। ঠাট্টা করে বললাম, 'তোমারও সহানুভূতি আছে না কি'? কালী বাবুকে খাবারটা পাঠিয়ে দিয়ে মনের উপর থেকে সংকোচের বোঝা নামিয়ে ফেললাম। মেয়েটী

পরে হেসে, কেঁদে, গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের পথে উঠে গেল। শুনেছি, তার সর্বস্ব বেচে কালীবাবুর নিষ্কৃতির জন্য মকদ্দমার ব্যয় জোগাচ্ছে। পরে জেলের মধ্যে বাবুটীকে দেখে দুর্ভাগা বলে মনে হল না। এক নারী অন্তরের গভীর প্রেম লোকটার চারিদিকে যেন রক্ষা কবচে বেষ্টন করে আছে। নিত্য সন্ধ্যায় দেখতাম বৃক্ষতলে উপবিষ্টা মহাদেবের ধ্যানমগ্না যেন সে কোন পার্বতী। ক্রমে আঁধার ঘনিয়ে আসতে, হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতে সর্বত্র প্রাণের চাঞ্চল্য লোপ পেত, কারাগারে বন্দীরা তালা বন্ধ হত, হয়ত তখন তার দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে নৈশ বায়ুতে মিলে যেত, সে ফিরে যেত তার প্রিয়বিহীন শূন্য কুটীরে। আমাদের মন সংস্কারে আচ্ছন্ন।

কপালের নিচে আমাদের দুচোখ আছে বটে কিন্তু অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়েছে কিনা জানা নাই। মৈমনসিংহের হেমেন্দ্র আচার্য চৌধুরী এলেন। শুনলাম, আলিপুর জেলে যে সব রাজবন্দীগণ প্রায়োপবেশন করেছিলেন, তাঁদের, এক জোট ভাঙ্গতে, বিভিন্ন জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁদের নেতা। আমাদের সংখ্যা তিন হতে চার হল। আলিপুরের ঘটনার সংবাদ শুনলাম। তিনি জমিদার বংশের বলে, জেলার তাঁকে বিশেষ খাতির করতে আরম্ভ করলে। একদিন তাঁকে আপ্যায়িত করতে, বলে বসল, দেখুন, আপনার শ্বশুর বাড়ী ত আমার দেশে, সে হিসাবে আপনি আমার জামাই হন। 'তা ত বটেই, জামাই হতে আপত্তি কি' বলে তিনি

এমন হেসে উঠলেন, বিশেষ আমরাও সে হাসিতে যোগ দেওয়ায়, জেলার ভাবলে কোনও বেকুবী কথা বলে ফেলেছে কিনা। কর্তৃপক্ষের নিকট সব প্রায়োপবেশনকারীই উপবাস ভেঙ্গেছে শুনে হেমেন্দ্র বাবু খেতে আরম্ভ করলেন। হাঁপানি রোগে তিনি একটু অসুস্থ ছিলেন। চেহারা ছিল যেমন লম্বা চওড়া গলা ছিল গম্ভীর ও মনও ছিল তেমনি উদার। বয়ঃজ্যেষ্ঠ বলে আমাদের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করতেন। একটা হাস্যকর ঘটনা ঘটল, চিঠি নিয়ে। হেমেন্দ্র বাবু পত্র দিয়েছেন তাঁর বিরহকাতরা স্ত্রীকে আর অনন্ত চিঠি লিখলে তার মাকে। কিন্তু সেন্সর অফিসে খাম পালটে যাওয়ায় হেমেন্দ্র বাবুর স্ত্রী স্বামীর নিকট মাতৃ সম্বোধনের চিঠী ও অনন্তের মা সন্তানের কাছ থেকে বিপরীত পত্র পেয়ে, দুজনেই হয়ত ভেবেছিলেন স্বামী ও সন্তানের জেলে থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

একদিন ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্ এলেন। তাঁর নাম বোকাণণ, যেমন নাম তেমনি চেহারা। শিক্ষকের মত বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে লাগলেন. বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে কিছু করতে যাওয়া কতদূর বোকামী! থাবার মত মোটা হাতে পাথরের দেওয়ালে সজোরে একটা ঘুসি মেরে বললেন, দেখ, দেওয়াল ভাঙ্গেনি কিন্তু আমার হাতে লেগেছে। বৃটিশ হল পাথরের প্রাচীরের মত। তোমাদের নিষ্ফল চেষ্টায় বৃটিশ রাজের কিছুই হ'ল না কিন্তু তোমাদেরই ক্ষতি হল প্রচুর। তোমরা শিক্ষিত মানুষ ও সমাজের গণ্যমান্য হতে পারতে

দেশের কত উপকারে আসতে, কিন্তু জেলে বন্দী রয়েছ। উত্তরে যখন বললাম, মশায়, তোমার দেশ যদি পরাধীন হ'ত, তুমি কি করতে? 'বৃটীশ জাত কখনও পরাধীন হতে পারে?' বলে হেসে সে তখনই আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে চলে গেল।

একটা ছোট বল নিয়ে অনন্ত ও আমি লোফালুফি খেলতাম। জেনানা ওয়ার্ডে পড়লে অদেখা খয়াদিকে ডাক দিতে হ'ত। গুর্খাদের মধ্যে কান্ছী দিদি ডাক বেশ মিষ্টি লাগে। ছোট মেয়ে হলেই, বহিনি, একটু বড় হলে দিদি, তার বড়দের নানি, বজু বলে।

পূর্বে মুক্ত অবস্থায় দার্জলিঙ বেড়াতে এসে দেখেছি, ভাই ফোঁটার প্রাতে পথে বাজারে ছেলেরা গাঁদাফুলের মালা পরে সেজে চলেছে আর সুসজ্জিতা মেয়েরা, পথে যাকে পাচ্ছে দাজু, ভাই বলে কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে একটা নমস্কার করছে। সে সময় পরিচয় বা অপরিচয়ের বিশেষ কিছু কথা নাই, সব ছেলেরাই দাজুভাই, সব মেয়েরাই বহিনী বা দিদি। ফুলের শোভার মত মুখের হাসি দেখলেই মনে ভাবি, দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাদের জীবনে হালকা আনন্দটুকু শুষ্ক হয়ে যায় নি। তুলনায় মনে হয়, বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েরা অল্প বয়সে গম্ভীর, এক একটী যেন ক্ষুদে দার্শনিক। হাসি, বিধাতার অপূর্ব দান, মানুষ ব্যতীত আর কোনও জীব জন্তু এ ক্ষমতা পেয়েছে কিনা জানি না। আনন্দের হাসি একটা জাতির প্রাণ শক্তির পরিচয় বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সন্ধ্যার পর ঘরের চিমনিতে

আগুন দিয়ে যায়, দু এক ঘণ্টা জ্বলে নিভে যায়। দুর্জয় শীতে, শয্যায় পা মেলা, একটা কঠিন পরীক্ষার কাজ। অনন্ত টিনে করে কাঠকয়লার কিছু আগুন বিছানার খাটের নিচে রাখত।

হুকুম এল, কলকাতা হয়ে অন্য কোথা যেতে হবে! বিদায় কালে ওয়ার্ডাররা বেশ কেমন মন মরা হয়ে গেল, যেন আমরা তাদের আত্মীয়। বুড়া সর্দারের প্রায় কাঁদ কাঁদ ভাব। হাবিলদার, যে আমাদের ড্রিল করাত, সে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করলে। জিতেন বাবুকে আলিঙ্গন ও নমস্কার করে খোকাকে কোলে নিয়ে চুমুখেয়ে যোগেনদা, অনন্ত ও আমি, জেল ফটকের বাইরে বাগানের পথে উঠে চললাম।

ডিসেম্বর মাস। বেশ শীত। প্রহরী সমেত তিন বন্ধু মিলে, ওভার কোট গায়ে পাহাড়ী ছোট্ট রেল গাড়ীতে ক্রমে দার্জিলিঙ ছেড়ে চললাম। চোখেব দৃষ্টি থেকে পরিচিত পথেব যা কিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, জীবনে তার দেখা আর নাও পেতে পারি। পাহাড়, প্রান্তর গাছপালা, চিরদিন আমার প্রিয়। প্রকৃতির সংস্পর্শ না পেলে, মনের ক্ষুধা মেটে না। তাই ত আমরা তার সঙ্গে নাড়ীর যোগ অনুভব করি। গাছের পাতাব মর্মরে, ঝরণার জলধারার শব্দে, নদীর কুলুধ্বনিতে, বায়ুব হিল্লোলে, যেন কোন বিস্মৃত জীবনের ভাষার আভাষ পাই। প্রকৃতির রূপে ডুব দিয়ে মাতৃক্রোড়ের অনুভূতি আসে। হিমালয়ের আঁকা বাঁকা রেল পথে, গাড়ী যেমন নেমে চলেছে, বিচ্ছেদের করুণ মায়ায় মন উদাস হয়ে যাচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে বড় লাইনের গাড়ী

যখন ছাড়ল, দেখলাম দূর আকাশের গায়ে বিশাল হিমালয় অস্পষ্ট আঁধারে শুয়ে আছে। দু পাশে প্রসারিত প্রান্তর চাঁদের ক্ষীণ আলোকে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়লাম. মানস চোখে ভেসে এল, হিমালয়ের বিদায় মৌন মূর্তি। মনে পড়ল, জেলের সেই সব কয়েদীদের মুখগুলা যারা আমায় কত শ্রদ্ধা করত, মনে এল দুরন্ত খোকার কচি মুখ, তার কাকা ডাক, চলে আসবার সময় তার ছাড়তে না চাওয়া, কোথাকার কার ছেলে, কদিনে গভীর মায়া বসিয়ে দিলে, অদেখা খয়াদির কথা, বরষার রাতে পাগলীর মিষ্টি কণ্ঠের করুণ গানের সুর, সে পার্বতী নারী, যার প্রেমের কাহিনী শুনেছিলাম, সকলে বিদায় নিয়ে মিশে গেল অতীতে, চিরকালের জন্য।

প্রেসিডেন্সি জেলে চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে আবার আমায় নিয়ে এল, কিন্তু এসে দেখি সেখানের অবস্থা যেন বদলে গেছে। প্রত্যেকটি সেলে আমার মত একটী করে রাজবন্দী, তালাবন্ধের গর্তে পা রেখে এণ্টিসেলের প্রাচীরের উপব মাথা তুলে বেপরোয়া উচ্চস্বরে আলাপ করছে, কতকালের পরে অনেকের পরস্পর দেখা, কত সংবাদের আদান প্রদান চলল। তার মধ্যে অনেকে ছিল খ্যাত দেশসেবক, সাহসে, বিদ্যায়, চরিত্রে মহৎ, আমেরিকা, জার্মানি আদি বিদেশে বিপ্লবের কাজ করে এসেছে, যাদের নাম শুনেছি, এমন অনেককে সেদিন চাক্ষুষ দেখলাম, কানে তাদেব মুখের কথাও শুনলাম, আলাপ করতে পেলাম, এতে নিজেকে ধন্য মনে হ'ল। তাদের মধ্যে এমন

লোক ছিল, শুনেছি যাদের বিদেশ যাত্রাকালে জাহাজ ভাড়ার অর্থও জোটেনি, খালাসীর চাকরী বা এমনি সামান্য কাজ নিয়ে যেতে হয়েছিল, আশা ছিল, বিদেশ থেকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য জুটবে ও তাই দিয়ে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হবে। কত মহান ছিল তাদের নিষ্ঠা ও আশা. দেশ স্বাধীন করবে বলে।

ইংরেজ ও ফরাসীদের অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হয়ে এসেছিল। জার্মানরা বিগ্‌বেন কামান দিয়ে প্যারীতে গোলাবর্ষণ করছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দর নগর প্যারী ধ্বংস হচ্ছে, শুনতাম ও ফরাসীদের জন্য একটু যে দুঃখ হ'ত না তা নয়। এই ফরাসীজাত জগতের জনসাধারণকে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী শুনাল যেমন ভারতের বাণী, মানুষ অমৃতের পুত্র। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী আমাদের মানুষের মত বাঁচবার প্রেরণা দিয়েছে। সাধারণ মানুষ, পার্থিব জীবন বোঝে, কিন্তু অমৃত বা আত্মা তার নিকট দুর্বোধ্য। সুস্থ সবল সাহসী না হলে অমৃতের উপলব্ধি কেমন করে সম্ভব·হবে, বোঝা যায় না। উন্নত মানব জীবনে দেহাতীতের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ধরিত্রীর সন্তান হয়ে আমরা পার্থিব জীবন অবহেলা করেছি, তাই অধ্যাত্ম জীবন আমাদের অনেকের শুধু মুখের কথা হয়ে আছে, অন্তরের সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। নইলে ত্রিশকোটী ভারতবাসী মুষ্টিমেয় বিদেশীর অধীনে পরাধীনতা ও দাসত্ব মেনে নিয়ে নিশ্চিন্তে, শত শত বৎসর কাটালে কেমন করে, বুঝে উঠতে পারি না।

ব্যাষ্টাইল পতনের কথা ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে লিখিত আছে। সাম্রাজ্য লিপ্সায় ফরাসী জাতি ইংরেজের মতই দোষী, কিন্তু তবু জগতে তার দান তুচ্ছ নয়।

সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও মানব সভ্যতার অগ্রগমনে ফরাসীর কত কীর্তি রয়েছে, কিন্তু তারা আজ ইংরেজের মিত্র অতএব তাদেরও পবাজয় আমাদের কাম্য হয়েছে। লণ্ডনে জার্মানীর আকাশ জাহাজ জেপলিন গিয়ে বড় বড় বোমা বর্ষণ করে আসছে, নরনারীব সঙ্গে শিশুরাও মরছে। মিলটন, বায়রণ, সেক্সপিয়রের দেশ ধ্বংস হচ্ছে, ভাবতে দুঃখ লাগে।

বাংলার হেন অংশ নাই, যেখানের বিপ্লবী সেখানে ছিলনা। তাদের শারীরিক গঠন, ভাষা বিদ্যাবুদ্ধি সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। তাদের কেউ বা ছিল সনাতনী, অধ্যাত্মবাদী, গভীর ভগবদ্‌বিশ্বাসী, কেউ ঘোর নাস্তিক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদী। স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ সকলের সুস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু অন্তঃসলীলা নদীর মত যে একই ভাব স্রোত তাদের সকলের মনে বয়ে যেত, সে হ'ল ইংরেজ তাড়িয়ে জাতির মুক্তি আনতে হবে। সবার মনে একই বিদ্বেষ ছিল ইংরেজের উপর, সে আমাদের পরাধীন রেখেছে বলে, তাই আমাদের সকলের ছিল একই কামনা, ইংরেজেব পরাজয় ঘটুক, এমন ভাবে, যাতে সে ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। পূর্বে বাইরেও কথা প্রসঙ্গে দেখেছি, শ্রদ্ধেয় আশুতোষ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিও অনেকে অন্তরে কেউ ইংরেজের বন্ধু ছিলেন না। তাঁরা জার্মানীর জয়

কামনা করতেন। এটা উচিত কি অনুচিত জানি না কিন্তু এইটাই স্বাভাবিক, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

সন্ধ্যায় ডাল রুটী খাইয়ে সেলে সেলে তালা বন্ধ করে দিল। বন্দীদের উচ্চালাপ ক্রমে নীরব হল ও কানে বাজতে লাগল শুধু মশার ভনভনানি ও প্রহরীদের ভারী বুটের একঘেয়ে শব্দ। শীতের আকাশ, ম্লান, ধুসর, অল্প কতগুকলি তারা আকাশের গায়ে কাঁপছে। সারাদিনের উত্তেজনার পর মনে এল একটু অবসাদ, কতকাল পরে কলকাতায় ফিরলাম, বাড়ীর কেউ জানে না, কারুর দেখা পেলাম না! সকলে কে কেমন আছে, দেশের অবস্থা কি হচ্ছে, বাহিরে যারা আছে, বিপ্লব আয়োজন কেমন চালাচ্ছে, আমাদের এবার কি করবে, ফাঁসি দেবে, গুলি করে মারবে, যাবজ্জীবন আটক রাখবে, না কিছুকাল পরে খালাস পাব, ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে পরিশ্রান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঠেলাঠেলি ও ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি আলোর লণ্ঠন নিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকছে, ওয়ার্ডার ক্লারিক! নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে হতবুদ্ধিভাবে জিজ্ঞাসা করলাম এত গভীররাতে আমায় ডাকছে কেন? সে গম্ভীর ভাবে বললে, ফাঁসি দেবে বা পোর্টব্লেয়রে নির্বাসনে পাঠাবে, সঠিক সে জানে না। 'ফাঁসি দেয়ত ভোরে আর জাহাজও ছাড়ে ভোরে, এত রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডাক কেন' বলে বিছানা গুটিয়ে বগলে নিয়ে তার সঙ্গে অজ্ঞাত যাত্রার পথ অনুসরণ করে, অলিগলি পেরিয়ে এসে পড়লাম তীব্র আলোকোজ্জ্বল জেল ফটকে।

যেন ভূতের রাজ্যে এসেছি। দুইটি ভীষণাকার কালো রঙের কয়েদী ·গাড়ী সেখানে দাঁড়িয়ে, তার দুপাশে সারবন্দী সশস্ত্র প্রহরী, মধ্যে রাজবন্দীগণ। এতক্ষণ অজ্ঞাত আশঙ্কায় মন ছমছম করছিল, ক্রমে সাথীদের মুখ দেখে সে ভাব কেটে গেল। যেখানেই যেতে হোক, পথে বন্ধু, সঙ্গী পাওয়া, একি কম কথা !

একে একে আমাদের গাড়ীর ভিতর পুরে পিছনের দরজা বন্ধ করে দিলে। এমন গভীর রাতে, এত পুলিশ প্রহরী নিয়ে, এমন আড়ম্বর করে, এ সব কাণ্ড কেন যে করলে, কিছু বুঝতে পারলাম না ! কোথায় নিয়ে চলেছে ? গাড়ীর মধ্যে স্থানাভাবে যে যেমন পারলাম, বসে পড়লাম, চেনা অচেনা বন্ধুদের দেহ সংস্পর্শে। কতকাল মানুষের অঙ্গ স্পর্শ পাইনি। অন্তরের কানায় কানায় আনন্দ উপচে পড়ছে। পূর্ব পরিচয়ের প্রয়োজন সেখানে ছিল না, সকলেই যে রাজবন্দী ভ্রাতা, এক বিপ্লবের পথের বন্ধু, সাথী ! গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে যখন জেল ফটকের বাইরে এল, আমরা উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে বললাম, "বন্দেমাতরম্" গভীর রজনী, নিকষঘন অন্ধকার, সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি আমাদের সর্বাঙ্গে, শিরায়, রক্তের প্রতিবিন্দুতে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে আলিপুরের নৈশ আকাশে মিশে গেল। অতগুলি দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর একান্ত মিলনে চলন্ত গাড়ীর জমাট আঁধার যেন সজীব হয়ে উঠল। গাড়ী চলেছে, কোথায় জানি না। সুকণ্ঠ নলিনীদা গান ধরলেন,

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি!
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।'

মৃদু শব্দে গাড়ী চলেছে, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু গানের সুরে সোনার বাংলার করুণ মাতৃমূর্তিখানি তার ধেনু চরা মাঠে, তার ছায়াঢাকা পল্লীবাটে, বিদায়ের চাহনিতে, মানস নয়নপটে ফুঠে উঠল। দেশমায়ের কোল ছেড়ে আমরা সব দুষ্টু পাগল ছেলে চলেছি কোথায়? গানের কথার সুরে আমাদের অন্তর ডুবে আছে, মা যেন সস্নেহে আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। গাড়ী এসে থামল, তখনও নলিনীদা গাইছেন,

"ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষি।"

দরজা খুলতে দেখি হাওড়া ষ্টেশন। কিন্তু রেলের কোন কুলী বা জনমানব নাই, আছে শুধু সার্জন ও সশস্ত্র প্রহরী, দুই সারিতে দাঁড়িয়ে, আর তার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হল ট্রেণের কামরায়। সে ট্রেণে সাধারণ যাত্রীর একটীও নাই। আমার কামরায়, হরিদা, অমরদা ও একজন আই বি পুলিশের বাঙ্গালী। মাথা ধরে অসুস্থ বোধ হতে লাগল, শুয়ে পড়লাম।

ভোরে হাজারীবাগ রোড ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াল। ইতিমধ্যে শুনেছি, হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেলে তিন নম্বরের রেগুলেশনের

রাজনৈতিক বন্দীদের রাখবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। বাইরে ভাল বন্দোবস্তটা অজুহাত, আসলে, দূরে এমন স্থানে রাখতে চায় যেখান হতে কোনও সংবাদ বাহিরে পাঠান দুরূহ হয়। বমি বমি ভাব লাগছিল বলে আই বি পুলিসের ভদ্রলোক আমার জন্য সোডার জোগাড়ে গেলেন। ইতিমধ্যে সকলকে একটা বড় গাড়ীতে বসে মিষ্টান্নের সদব্যবহার করতে দেখে আমার খিদে পেয়ে গেল ও তাদের সঙ্গে আহারে যোগ দিলাম। ভদ্রলোক সোডা হাতে ফিরে, কামরায় না পেয়ে, আমাকে অন্বেষণ করছিলেন। তখন মুখে পান্তুয়া দেখে হেসে বল্লেন, ও কি মশায়, দলে এসে আপনার অসুখ সেরে গেল! একেবারে সোডার পরিবর্তে পান্তুয়া! উত্তর দেবার অনুরূপ মৌখিক অবস্থা তখন আমার ছিল না, অস্পষ্ট স্বরে বল্লাম, "সোডাটা আপনিই খান, কিন্তু আপনার এই কষ্ট স্বীকারের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।"

হাজারীবাগ জেল

শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান সঙ্গীত, ছুটেছে সে নির্ভিক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।" রবীন্দ্রনাথ

চাংড়ীপোতার শ্রীহরিকুমার চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা সিমলা ব্যায়াম সমিতির শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু

অসমতল পথে উঠে নেমে লালচে ধুলা উড়িয়ে বাস চলেছে, দুধারে জঙ্গল। আমরা দুজন করে মধ্যে বসেছি, দুই পাশে সশস্ত্র প্রহরী, চলেছি যেন যুদ্ধযাত্রায়। সমুখের সারীতে প্রভাসদা ও যোগেনদা, যেন দুই অধিনায়ক। মনে আশা ছিল, স্বাধীনতার যুদ্ধে এমনিভাবে যাব, আজ চলেছি বন্দীরূপে কারাগারে! বিশ্বযুদ্ধের গতির উপর দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে অনেকখানি। ইংরেজ যদি জেতে তবে পরাধীনতার বন্ধন হয়ত আরও সুদৃঢ় হবে, মনে ছিল এই আশংকা। তবে জেতা বা বিজেতা, সব শক্তিশালি জাতিই এই যুদ্ধের ফলে একান্ত দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। সে সময় যদি প্রাণপণ করে বিপ্লব চেষ্টা হয়, হয়ত দেশ স্বাধীন হতে পারে! বহুদিন জেলের মধ্যে আলস্যে দিন যাপনের পর দার্জলিঙ থেকে এই যে ক্রমান্বয় ভ্রমন চলেছে, তাতে মনের অবসাদ কেটে গেছল। প্রভাত আলোকে প্রান্তসীমায় স্থানে স্থানে ধূসর পাহাড়গুলি দেখাচ্ছিল যেন ধ্যান গম্ভীর স্তব্ধ মূর্তি। সমতল প্রান্তরের মাঝে মাঝে সবুজ গাছে ঢাকা গ্রাম। হিমালয়ের সে সৌন্দর্য্যের বিরাট ঐশ্বর্য্য নাই, এখানে বাংলার সে শ্যামল স্নিগ্ধ শ্রীর অভাব, এ যেন রুক্ষকেশী ধরিত্রীর গৈরিক বসনা উদাসিনী মূর্তি।

হাজারীবাগ জেলে যখন পৌঁছিলাম, তখন সকাল দশটা বেজে গেছে। ইউরোপীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল, পূর্বে সে ছিল, মিলিটারী অফিসার, সে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিল, তার সার মর্ম হল, হাজারীবাগ জঙ্গল দেশ, এখানে খাবার জিনিষ

বিশেষ পাওয়া যায় না. তবে তিনি সাধ্যমত আমাদের সুখে বাখতে ত্রুটী করবেন না ও আমরাও যেন চেষ্টা করি সুখে ও শান্তিতে থাকতে। এ বিষয়ে পরস্পর সহযোগিতার প্রয়োজন। লোকটাকে মন্দ মনে হ'ল না, বিশেষতঃ যখন দেখলাম, সে আমাদের অবাধ মেলামেশায় বা কথাবার্তায় কিছু আপত্তি করলে না। •

হাজাবীবাগ কেন্দ্রীয় জেলটী ছিল খুব বড়, তার চারিদিক অতি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টন করা। সেই প্রাচীরের স্থানে স্থানে দিন রাত্রি সশস্ত্র পাহারার জন্য আছে অনেকগুলি গুমটী। এই বাহির প্রাচীরেব চারিদিকে বেষ্টন করে আছে জল ভর্তি পরিখা। এর মধ্যে তৃতীয় বেষ্টনের কেন্দ্রস্থানে আছে প্রহরীদের একটি বৃহৎ কেন্দ্র গুমটী ও রাষ্ট্রবন্দীদের জন্য অনেকগুলি প্রাচীর ঘেরা ওয়ার্ড। সাধারণ কয়েদীদের অপেক্ষা রাষ্ট্র বন্দীদের বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা।

আমাদের চল্লিশ জনকে দুটী ওয়ার্ডে ভাগ করে দিলে। সেলের আকৃতি প্রেসিডেন্সি জেলের চুয়াল্লিশ ডিগ্রি অপেক্ষা কিছু বড়। এণ্টি সেল নাই, সমুখে বারান্দা, তারই সঙ্গে রাঙা মাটির বৃহৎ প্রাঙ্গণ। প্রেসিডেন্সি জেলের মত এখানে দুপুরে সেলে বন্ধ হলাম না, শুধু রাতে আবদ্ধ থাকতে হত। জলের একটা সরু চৌবাচ্চা, তাতে স্নান করলাম। বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলনে তখন অনেকে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। তারা কত বিপদে প্রাণ হাতে করে বিপ্লবের

পথে পরস্পরের সাথী হয়েছে। সে সাথীত্ব ছিল এমন যা মৃত্যুঞ্জয়ীদের পক্ষেই সম্ভব।

শুনেছি এমন ঘটনা! পুলিশ কর্মচারীকে গুলি করে দুই বন্ধু দ্রুত চলে যাচ্ছে, পিছনে পুলিশ ধাওয়া করেছে, যখন দেখেছে, দুজনের পালান অসম্ভব, সঙ্গীকে বলেছে, তুই চলে যা, আমি পুলিশকে রুখছি। রিভলভারের শেষ গুলিটী নিঃশেষ হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে লড়েছে ও পরে ধৃত হয়ে ফাঁসীর মঞ্চে বন্দেমাতরম বলে আত্ম প্রাণ বলি দিয়েছে কিন্তু সঙ্গীকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে দেয় নি। এই কথা কল্পনা নয়, সত্য কাহিনী। এ মহান ত্যাগের ও বীরত্বের তুলনা পৃথিবীতে মানব ইতিহাসে কোথাও বেশী মেলে না। বাংলার সে বিপ্লব যুগে এমন সব কত ঘটনা অজ্ঞাত থেকে গেছে, ইতিহাসে যা হয়ত অলিখিতই থেকে যাবে। সে সব নীরব বিপ্লবী বীরের পরিচয় কেউ জানবে না। টেগার্টের মত আমাদের অত বড় শত্রুও তাই বালেশ্বরে রণক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বলেছিল, এমন বীর ইউরোপে জন্মালে সারা পৃথিবী গর্ব অনুভব করত।

পংক্তি ভোজনে বসে লুচি ও মাংস খাওয়া গেল। কয় দিন যাবৎ ট্রেনে ট্রেনে ভ্রমণের পর দুপুরে ভাত পেলেই ভাল লাগত। শক্ত লুচি গিলে খাওয়া শেষ করে সেলের মধ্যে বিছানায় শুয়ে ঘুমালাম। বৈকালে প্রাঙ্গনে বেড়ালাম। সন্ধ্যার পর যখন সেলে চাবি দিয়ে গেল, লোহার গরাদের

পিছনে দরজার সামনে চেয়ার নিয়ে বাহির পানে চেয়ে বসে
ইলাম। সমুখে প্রাঙ্গণে জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে।
াচিলের উপর দিয়ে দূরে গাছপালা শূন্য একটা নেড়া
াহাড়ের চুড়ার খানিকটা দেখা যাচ্ছে, পাশের সেলে কাঙ্গালদা
াশের বাঁশি বাজিয়ে নিস্তব্ধ আকাশে সুরের লহরী তুললে।
খনও উচ্চ গ্রামে উঠছে, কখনও করুণায় গলে নেমে যাচ্ছে।
াষা নাই, অর্থ নাই, শুধু শব্দেরই পরে সুরের তরঙ্গ, তার
ক আশ্চর্য্য প্রভাব মানব অন্তরে, অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ
রে নাড়া দিয়ে, সাড়া জাগিয়ে তোলে অতি সুক্ষ্ম আনন্দের
নুভূতি। মন উধাও হয়ে গেল, ক্ষণিকের জন্যও ভুলে
গলাম, আমি বন্দী, অনির্দিষ্ট কালের জন্য আছি কারাগারে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল। তখন
৯১৮ সাল শেষ হয়ে এসেছে। পরস্পর মেলামেশার জন্য
ন মন্দ কাটত না। সকালে ব্যায়াম করতে লাগলাম।
পুরে বই পড়তাম বা কারুর ঘরে গল্প, আলোচনায মেতে
কতাম। দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য সকল বিষয়েই
মাদের আলোচনা হত! শ্রদ্ধেয় ও বয়সে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ
বিনাশ চক্রবর্ত্তি মহাশয় আমাদের গীতা উপনিষদ পড়াতেন।
তীন শেঠের কাছে শিক্ষা হ'ত বিজ্ঞান, প্রভাসদার কাছে
তিহাস আর মধুদার কাছে দর্শন। আমাদের মধ্যে কেউ না
উ এক এক বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। জেল কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের
াওয়া পরার ব্যয়বরাদ্দ অর্থ থেকে কিছু চূরী করে খুসী

থাকত, আমরাও মিলে মিশে থাকতে পেতাম বলে কর্তৃপক্ষের সহিত কোনও বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টী করতাম না। কিছু দিন গেল হটাৎ আমাদের এক একটি প্রাঙ্গণের সেল সারিতে পাঁচজন করে ভাগ করে দিলে কেন, বুঝলাম না। হুকুম হ'ল এক একটী ইয়ার্ডের লোক অন্য ইয়ার্ডের লোকের সহিত কথা কহিতে পারে না। ফলে অনেকেরই মনে, বন্ধুদের সহিত মিশতে না পারাতে অসন্তোষ জমতে লাগল। আত্মীয় স্বজন ছেড়ে বিনা বিচারে আইনের নামে বেআইনীতে বহুকাল কারাগারে কেটে গেল, আরও কতকাল এমনি কাটাতে হবে জানা নাই, বন্ধুদের পরস্পর একটু মেলামেশার মধ্যে পুলিশ যে কি দেখেছিল জানি না। বরং মনে একটু সন্তুষ্ট থাকলে, কর্তৃপক্ষের সহিত বাদানুবাদ হয় কম। কিন্তু সরকারী বুদ্ধি চলে অনেক সময়ই বিপরীত পথে, ধারণা, যত অত্যাচার করবে, কষ্টে রাখবে ততই, লোকে রাজভক্ত হয়ে উঠবে! যে সব মানুষ মহৎ আদর্শের জন্য স্বেচ্ছায় নির্যাতন, দুঃখ বরণ করেছে, তাদের মনুষ্যত্ব অত্যাচারে নষ্ট হয় না, যেমন হয় অতিভোগে বিলাসিতায়। বৈদিক দেবতারা মর্তের কোন মানবের সাধনার আতিশয্য দেখে যখন সন্ত্রস্ত হতেন, তাঁরা তার কাছে পাঠাতেন লালসার উপকরণ।. তাঁরা এ বিষয়ে ছিলেন অতি বুদ্ধিমান।

জ্ঞান বুদ্ধির অনুশীলন ও আলোচনা ক্লাশ আর বসল না। হস্তলিখিত সাপ্তাহিক বার করা হ'ত, সেটী বন্ধ হল, ব্যায়াম, খেলা আর সম্ভব হল না। সকলেরই মনে বিদ্রোহ জাগতে লাগল,

কেন আমাদের এমন ভাবে রাখবে! পূর্বে নিঃসঙ্গ ছিলাম বটে, কিন্তু কিছুদিন বন্ধুদের সঙ্গ পেয়ে আর একা থাকতে পারতাম না।

হাজারীবাগ জেলে বন্ধুদের মধ্যে দীনেশ ছিল সুকণ্ঠ গায়ক। তার তাল মাত্রা জ্ঞান খুব নিখুঁত ছিল কিনা জানি না। কিন্তু সুললিত কণ্ঠের মাধুর্য্য ছিল অভিনব। তার মাথা একটু খাবাপ হয়। একদিন সে উলঙ্গ হয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, সোহং সেই আমি। এমন সোহং জ্ঞান অল্পবিস্তর অনেকের মধ্যেই জেলে থাকতে হয়েছিল।

আর এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর কথা বলতে চাই। তিনি ছিলেন বড় একজন বিপ্লবী, বোমা তৈরী করতে আর বেহালা বাজাতে, দু কাজেই ছিলেন উঁচুদরের ওস্তাদ। একদিন তিনি একমনে বেহালা বাজাচ্ছিলেন, হঠাৎ ছড়িটা ফেলে বললেন, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। কেমন করে তাঁর এ রোগ হ'ল, তিনি বলতে লাগলেন।

"পূর্বে আমার সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেলে থাকতে ও চাকিতে গম পিষতে হ'ত। একদিন সব কাজ শেষ করে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভীষণ চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে দেখি জমাদার অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছে, অপরাধ ঘুমিয়ে পড়েছি। অসময়ে নিদ্রা, জেলে অপরাধ। মনে রাগ হ'ল, বললাম, তুমি গালি দেবে কেন? কাজ সব ত শেষ করেছি।

প্রতিবাদে এমন ভাবে জবাব শোনা, জেল জমাদারে
অভ্যাসের বাইরে, তাই বিনা বাক্যব্যয়ে ছুটী কয়েদী দি
বস্তাবন্ধ করে বেঁধে, আমাকে ভীষণ মারতে লাগল
ঘাড়টা ধরে এমন মোচড় দিলে, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম
যখন জ্ঞান হল, সেলের মধ্যে পড়ে আছি, মাথায় ভীষ
যন্ত্রণা। সকালে ইংরেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে, আমার অবস্থা
দেখে, কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে। পাশে সেই জমাদা
আমার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কেন জানি না, মনে হল, ি
হবে বলে, জমাদার সেপাহী ত ওদের যন্ত্র, কর্তাদের কা
অনুচরের নামে নালিশ জানিয়ে লাভ কি? যারা আম
দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে, যারা আমার দেশকে শ্ম
শ্মশান করে দিচ্ছে, তাদের বলতে হবে, সুবিচার কর! শু
বল্লাম, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। হাঁসপাতালে নিয়ে গেল।

জীবন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কয়েকদিন কেটেছে। অত্য
দুর্বল কিন্তু মাথা পরিষ্কার বোধ করছি। প্রভাতের আলো
জানালা দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছে। আকাশের দিকে
চেয়ে আছি, ছেলেবেলার কত কথা মনের উপর হাল্কা মেঘের
মত ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ কার ডাক শুনলাম, বাবু
চেয়ে দেখি সেই জমাদার, কিন্তু তার মুখ, তার স্বর, সব
বদলে গেছে।

তার সেই রোষ-কষায়িত রক্ত লোচন আর নাই, বরং দুটী চোখ জলে ভেজা। ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লাম, 'কি বলছ জমাদার!' সে উত্তর দিলে, 'বাবু আমি ফকিরি নিয়ে চলে যাচ্ছি, এ নোকরি আর করব না। এতে মানুষ বড় জানোয়ার বনে যায়। নইলে, আপনার মত সজ্জন লোককে কেমন করে মারতে পারলাম! মাফ করবেন বাবু, সেলাম।' সে যেতে ভাবলাম, নোকরীর মায়া সে ছাড়তে পারবে না, ক্ষণিকের এই ভাবটা তার কেটে যাবে। কিন্তু কি বলব ভাই, আশ্চর্য্য, সত্যই লোকটা চাকরী ছেড়ে ফকির হয়ে চলে গেল।" বলতে বলতে সে পাগল বন্ধু আবার হেসে উঠল। মানুষ ত পাহাড়ের উচ্চতা মেপেছে, সমুদ্রের গভীরতাও মাপে। কিন্তু মানুষের মনের পরিমাপ সম্ভব কি?

নলিনীদার কাছে আমরা কয়েকজন মিলে গান শিখতে লাগলাম। সুর তাল মান লয় ইত্যাদি প্রাথমিক শিক্ষার মত কিছু কিছু পেয়ে ছিলাম। জেল-কর্তৃপক্ষের সম্মতি আদায় করা হ'ল সরস্বতী পূজার। ছোট একখানি বাণী মূর্তি আনা হ'ল। আমি একখানা গান রচনা করে ফেললাম, প্রথম লাইনটা মনে আছে,

"নমো মা ভারতী বাণী"

নলিনীদার সুর সংযোজনে ও বন্দী ভক্তদের সে সমবেত সঙ্গীত, হয়েছিল এমনই অপূর্ব, যে মা সরস্বতীর সাধ্য কি, না

শুনে থাকতে পারেন! বাঙ্গালীর ছেলে লক্ষ্মীছাড়া হতে পারি, কিন্তু সরস্বতী ছাড়া, সে ভাবতে পারি না।

আমাদের ইয়ার্ডের একদিকে ছয়জন মৌলবী বন্দী ছিল, খিলাফত আন্দোলনে বৃটিশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করছিল বলে, তারা বন্দী হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার কথা তারা কোনও দিন ভাবেনি। তাদের মধ্যে ইসমাইল ছিল আমার সমবয়সী। সে মাথায় দিত একটা ঝুঁটীওলা লাল তুরকী ফেজ। নরেন ভট্টাচার্যও ছিল সমবয়সী ও সনাতনী, তার মাথায় প্রকাণ্ড টিকি। একদিন দুইজনকে পিঠাপিঠি বসিয়ে, কি রকম বৈদ্যুতিক স্পার্ক দেয় দেখবে, বলে মুসলিম ফেজের ঝুঁটী আর সনাতনী হিন্দু টিকি, যেই ঠেকিয়েছি, নরেন বুঝতে পেরে লাফিয়ে আমায় মারতে আসে। স্পার্ক হল কিনা জানি না, কিন্তু উত্তাপের মাত্রা যে ভীষণ বেড়ে গেল, সে বিষয়ে সন্দেহের কিছু অবকাশ রইল না।

অবিনাশ রায় সন্ধ্যায় বন্ধ সেলের মধ্যে যোগ করতে ভীষণ ভাবে নাক টিপছেন, হঠাৎ তাঁর পৃষ্ঠে ঈষদুষ্ণ জলের ছিটা অনুভব করলেন। যোগ-ভঙ্গ হয়ে পিছু ফিরে দেখেন, বিড়ালটা পালাচ্ছে, তখনও তার ল্যাজটা উঁচু রয়েছে। নির্বুদ্ধি জীব হয়ত যোগের মর্ম হৃদয়ঙ্গম না করে, অবিনাশদাকে একটা স্থানু পদার্থ ভেবে, মুত্র ত্যাগ করার উপযুক্ত স্থান মনে করেছিল। পরে জীবিত মানুষ দেখে, অপরাধের গুরুত্ব বুঝে, পলায়ন করল। অবিনাশদা খড়মটা তুলে বিড়ালটার দিকে সজোরে

ছুঁড়লেন, বিড়াল অনাহত ভাবেই, বোধ করি, তার বাসায় চলে গেল, কিন্তু অবিনাশদার খড়মের আঘাতে ঢাকা খাবারটা সব মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। রাত্রে তাঁর খাওয়া হল না।

একদিন পূর্ব পরিচিত এক শ্রদ্ধেয় নেতার সঙ্গে থালা বদল হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড যোগী। তাঁর ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না কুণ্ডলিনীতে সদা জাগ্রত। এই এনামেলের থালার মধ্য দিয়ে বহু যোগাভ্যাসে উন্নত স্তর থেকে হঠাৎ স্খলিত হয়ে পড়তে পারেন, তাঁর আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটতে পারে, এই ভয়ে তিনি যে কি ভীষণ বিচলিত হলেন, তা ছিল আমার কল্পনা ও বুদ্ধির অতীত। পরে তিনি সেই থালা শোধণ করে নিয়েছিলেন কিনা, জানি না। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রহীন পড়ছি শুনে, তাঁর নেতৃত্বের ও অভিভাবকত্বের অধিকার বোধে, আমাকে তীব্র তিরস্কারে সতর্ক করে দিলেন, এতে আমার চরিত্রের অধঃপতন হতে পারে এবং তিনি থাকতে এ কখনও সম্ভব হতে দিতে পারেন না, কেননা আমি ছিলাম তাঁর আত্মোন্নতি সমিতির ছেলে। সিমলা ব্যায়াম সমিতির অমরদাকে পেয়েছিলাম। সে ছিল কুস্তিগীর। তার বাবা অতীনবাবুও স্বদেশীতে জেল খেটেছেন ও আমি তাঁকেও বলি অতীনদা। অসুখ করলে, অনুমতি নিয়ে রাতে আমার সেলে থেকে মাথা টিপে দিত, আর কি ভালই বাসত। চাংড়িপোতার হরিকুমার চক্রবর্তীকে বলতাম ঠাকুরদা। অসুখে তাঁর সেবা ছিল অতুলনীয়। দেহটী ছিল শক্ত যেন পাথরে খোদাই, মন ছিল তেমনি স্নেহে

ভালবাসায় কোমল, যাকে বলে, 'বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি।' ইনফ্লুয়েঞ্জায় যখন অনেকেই শয্যাশায়ী, তাঁর সেবা পরিচর্যা ছিল অবিশ্রাম, অক্লান্ত। বালেশ্বর যুদ্ধে, বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্র মুখার্জ্জি, সহিদ মনোরঞ্জন, নীরেন, চিত্তপ্রিয়, ও দ্বীপান্তরিত জ্যোতিষ পালের তিনি ছিলেন যুদ্ধ আয়োজন কাজে সহকর্মী ও জার্মান অস্ত্র আমদানীর প্রচেষ্টার সময় তিনিই 'হ্যারি এণ্ড সনস্' নামে বালেশ্বরে দোকান সাজিয়ে বসেছিলেন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য অর্থাৎ মানবেন্দ্র রায়ের তিনি ছিলেন সহচর। ১৯১৯ সালের শেষে জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পরের একটী ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ না করে পারলাম না। ঘটনাটী এমন কিছু নয়, কিন্তু আমি তাতে হরিদার বিপ্লবী স্বচ্ছ মনের পরিচয় পাই।

নিমন্ত্রিত আমরা অনেক জেল ফেরৎ কর্মী, হরিদার চাংড়িপোতার বাড়ীতে দুপুরে পংক্তি ভোজনে ভাত খেতে বসেছি। পরিবেশনে আমাদের দিক থেকে সুরু হতে, অপর দিকে গ্রামের উচ্চবর্ণের নিমন্ত্রিত কয়েকজন প্রতিবাদ করে উঠল, এটা অসামাজিক। আরও আপত্তি জানাল, গ্রামের ছেলেরা কয়েকজন জাতি বর্ণনির্বিশেষে আমাদের দলে খেতে বসেছে কেন, বিশেষতঃ যা তা খাদ্য নয় একেবারে ভাত, অন্ন। এমন অধর্ম তাঁরা হতে দিতে পারেন না। গ্রাম্য সমাজে, তখনকার দিনে এটা সামান্য ব্যাপার নয়। স্মিত হাস্যে হরিদা তাঁদের প্রতি বিনীত নিবেদন করলেন, বাইরে থেকে এই গ্রামে যাঁরা এসেছেন, সকলেই আপনাদের অতিথি, অতএব পূজ্য। তাঁদের প্রথম

পরিবেশনে অন্যায় হতে পারে না, না করলেই অন্যায় হত। আর জাতি নির্বিশেষে যাঁরা একত্র বসেছেন, তাঁরা স্বদেশী দলের অর্থাৎ ভ্রাতৃত্বে এক জাতি। অনেকে একথা মেনে নিল। কেউ কেউ রাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু হরিদা অটল। কত ঝড় তাঁর জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, কিন্তু আজও দেখি সে বিপ্লবী মন অনঢ় অবিচলিত। অবশ্য কজনের বা কতটুকু প[illegible]! কতজনের আর্থিক কষ্টে দিন কাটছে, তাও দেখেছি। কি[illegible]জস্ব মহিমায় তাঁদের অনেকে আজও উন্নত, অটল, যা দেখলে সম্ভ্রমে মাথা আপনি নত হয়ে আসে।

অন্য রকমের আর একজন একদিন হাজারীবাগ জেলে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। যত ডাকাডাকি করি, তার চোখ আর খোলে না। কপালে জলের ছিটে দিতে লাগলাম। বিড় বিড় করে বাণী দিতে লাগলেন, 'আমিই ত্রেতা যুগে এসেছিলাম সেই রাম অবতারে, আমিই এ যুগে এসেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে, এবার আবার এসেছি রামচন্দ্র রূপে'। এমন মহৎ সঙ্গ পেয়েও জীবনে কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারলাম না, এর জন্য কতক দায়ী আমার বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র ও অনাধ্যাত্মিক বিপিন দা, যে দুজনের সান্নিধ্য জীবনে পেয়েছিলাম আর রবীন্দ্রনাথ যাঁর রাশি রাশি রচনার মধ্যে কখনও এমন একটীও ছত্র দেখলাম না, যাতে অবোধ্য মিষ্টিসিস্মের ইঙ্গিত আছে।

সুরেন ঘোষ অর্থাৎ মধুদার তখনই দেখতাম, দর্শন ও ধর্মের দিকে ঝোঁক। আমাদের সকলের ভাল থাকার জন্য তার দরদী অন্তরে ছিল বড় একটা দায়িত্ববোধ। সমবয়সী হলেও তাকে নেতার মত মেনে চলতাম। যারা জগতে মানুষ বলে পরিচয় দিতে চায়, নিজের জন্য কাজ করেও তাদের কিছুটা অন্তত পরের জন্য করে। নইলে মানুষ, মানুষ কেন ? উন্নত চরিত্রের মানুষ, যাদের নিজেদের অপেক্ষা পরের জন্য অধিকতর আত্মনিয়োগ কববার আন্তরিক ঔদার্য আছে, সেই সঙ্গে যদি থাকে শক্তি ও বুদ্ধি, এরূপ নেতারাই করে দেশের ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রন।

অরুণ, অমর, মনোরঞ্জনদা, এরা খুব বেশী লেখাপড়া নিয়ে থাকত। অরুণ হল আমাদের সেদিনের একমাত্র বন্ধু, যে স্বাধীন ভারতে মন্ত্রী হতে পারলে। তার সারল্যটুকু দেখবার মত। ঠিক সেই আগেকার মানুষটি দেশের সেবায় বিনা আড়ম্বরে লেগে আছে !

১৯১৬ সালে শেষের দিকে ডেপুটী কমিশনর বসন্ত চ্যাটার্জীর হত্যার পর পুলিশ বন্দীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, তার জন্য ভারত—প্রেমী শ্রদ্ধেয় আইরিশ মহিলা অ্যানি বেসান্তের প্রচেষ্টায় একটী অনুসন্ধান কমিটি বসেছিল। শুনেছি, ভারতীয় ও ইউরোপীয় আই, বি, পুলিশের জনকয়েক অনেক ভীষণ ভীষণ অত্যাচার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। অন্ধকার খুপরিতে পুরে রাখা, খাবার, বা তেষ্টার জল না দেওয়া। এ সব তুলনায় কিছুই নয়। হাতে হাতকড়া লাগিয়ে প্রচণ্ড

ধাক্কা দিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে, রক্তপাত করে দিত। হাত পা বেঁধে জমির উপর ফেলে সবুট পদাঘাত চালাত। মাথার চুলগুলা টেনে টেনে ছিঁড়ে দিত। নোখের মধ্যে ছুচ ফোটাত, বৈদ্যুতিক চার্জ লাগাত, অঙ্গ বিশেষের উপর বুট দিয়ে দলত তার উপর অকথ্য গালি গালাজ আর সঙ্গীদের নাম বলবার জন্য ধমক দিত।

কমিটীতে এমন সব দেশের গণ্যমান্য স্তম্ভ স্বরূপ লোকদের নেওয়া হয়েছিল, যারা দেশভক্তদের অপেক্ষা পুলিশের কথাই বেশী বিশ্বাস করল! এমন কি, যে টেগার্ট নিজে মেরেছিল, সে সাক্ষী দিলে, কাউকে মারা হয়নি। অরুণ ও অমর দুজনেই অত্যাচারিতের প্রতিনিধিরূপে সাক্ষ্য দিতে গেছল। কিন্তু সেদিনের পরাধীন ভারতে তাদের কথা কমিটির সভ্যদের কাছে ছিল অবিশ্বাস্য।

নরেশ চৌধুরীর শরীর ভাল ছিল না। জেলে মাঝে মাঝে ভিজিটর আসত। এক ইউরোপীয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, কি খেতে চাও! উত্তরে নরেশ বাবু বললেন, পরিপাক হয় না, তিনি জীবিত মৎস্য খেতে চান। অনেকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভিজিটর হাঁ করে আঙ্গুল দুটা মুখের কাছে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, জীবিত মৎস্য কি করে খায়!

হাজারীবাগ জেলের সেকালের এমনি কত কথা মনে আসে। দেশ স্বাধীন করবার জন্য ইংরেজ রাজত্ব অচল করে তার অবসান করার উদ্দেশ্যে, এ বিষয়ে, সকলেরই মনের গভীর মিল ছিল।

কিন্তু প্রকৃতিতে তারা সবাই একরূপ, ছিল না, তাদের মধ্যে কেউ ছিল সংকীর্ণ গোঁড়া, অধিকাংশ ছিল উদার অন্তঃকরণ, যাঁরা সাধারণের কল্যানে আত্মত্যাগে কুণ্ঠিত হত না ও বিপদে সকলের আগে দাঁড়িয়ে সকল আঘাত বুক পেতে নিত। পূর্বে জেলে প্রায় একক থাকতে হয়েছিল বা দু একজনের সঙ্গ পেয়েছিলাম, তাও গোপনে. কিন্তু হাজারীবাগ জেলে যাদের দেখেছি, তাদের স্মৃতি মুছে যাবাব নয়—ও আজও জীবনের সম্বল বলে মনে কবি।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় বড় হয়েছি ও সকল প্রশ্ন বা নিয়মকে বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতাম। ভগবান মানা না মানাব প্রশ্ন আসত না। বেদান্ত উপনিষদে যে বিশ্বের বড় মহাবিশ্বেব অবাঙ্‌মনসংগোচরের আভাষ আছে, বৈজ্ঞানিক মনেব সহিত সে ভাবের কিছু অসামঞ্জস্য পেতাম না। কিন্তু ধর্ম যদি মানুষকে ভালবাসাব প্রেরণা না জোগায়, তবে সে ধর্মের সার্থকতা কি? সর্ব মানবে, সর্ব জীবে, বিশ্ব সৃষ্টিতে, প্রকৃতির রূপে রসে গন্ধে যে ভগবান, মানুষের সকল সদ্ গুণে সকল প্রেমে, কল্যানে, যে ঈশ্বরের কল্পনা, তাই ছিল আমার কাছে সত্যের সন্ধান। আংশিক হলেও তা সত্যেরই অংশ। ভগবানকে বলতাম,

"তুমি কত বেশে, নিমিষে নিমিষে নিতুই নব।"

ভাবতাম এই যেন ধর্মের সার কথা। মনে হ'ত, মানব কল্যাণে কর্ম করে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ভগবানের পানে এগুনো যায়,

অন্য পথ হয়ত বিপথ। তবু মধ্যে মধ্যে খেয়াল চাপত, যোগাভ্যাসে যদি কিছুর সন্ধান মেলে, চেষ্টা করে দেখতে। গেরুয়া রঙে ছোপান একটী কাপড় লুঙি করে পরতে সুরু করলাম, চুল কামিয়ে মাথা নেড়া হলাম। সে সময় বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক সেক্রেটারী মিষ্টার ষ্টিফেনসন একদিন, আমায় এমন অবস্থায় দেখে, ঠাট্টা করে বললে, 'সতীশ তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গেলে নাকি?' হেসে উত্তর দিলাম, 'সংসার ত করতে দিলে না, সন্ন্যাস ছাড়া উপায় কি?'

খাতা কলম পেয়ে ছিলাম। মনের ভাব উজাড় করে কবিতার পর কবিতা লিখে যেতাম। গুণগ্রাহী উৎসাহ দাতাদের মধ্যে মনে পড়ে যোগীনদা ও অরুণকে। অধিকাংশ কবিতায় থাকত, ভগবানের উপর অভিমানের ভাব, কেন তিনি আমায় ত্যাগ করে দূরে রয়েছেন! সেগুলির ভাব ও ভাষা রবীন্দ্র প্রভাবে পূর্ণ, অজ্ঞাত অপহরণ ও বলা যায়। খাতাগুলো শেষে বাড়ী এনেছিলাম, সব কোথায় হারিয়ে গেছে। থাকলে এই বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের সেই লেখাগুলি পড়ে দেখতাম, হাসবার ও অনেককে হাসাবার খোরাক পেতাম।

সকলের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন অবিনাশ চক্রবর্তী মহাশয়। শান্ত সমাহিত মানুষ। জেল কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ জানান অসম্মানজনক মনে করতেন। পূর্বে ধনী ও মুনসেফ ছিলেন। দেশ উদ্ধার ব্রতে সবই ত্যাগ করেছেন। অভাবের জীবনে কোনও কালে অভ্যস্থ ছিলেন না। কিন্তু কারাবাসের অসুবিধাগুলি

কত অনায়াসে সহ্য করে দিন কাটাতেন। আমরা তাঁর স্নেহের পাত্র ছিলাম ও সুবিধা হলেই তাঁর নিকট গীতা উপনিষদ পাঠ করতাম। এক সন্ধ্যায় দুটী বেলফুল নিয়ে তাঁকে দিতে গেলাম, অতি ধীর ভাবে বললেন, 'দেখ সতীশ, রাত্রি টুকুই ওই ফুলগুলির জীবনের আনন্দ, সন্ধ্যায় তুললে কেন? শিশুদের সুন্দর মুখগুলি গলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যদি কেউ ফুলদানিতে সাজায়, ভাল লাগে কি?'

কিরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের সবার কিরণদা। রুক্ষ, শুষ্ক মানুষ, সনাতন ব্রহ্মচর্যের আদর্শে দেশ শুদ্ধ ছেলেদের গড়ে তুলতে চান। উল্টা তর্ক করলেই, শুষ্ক কঠিন হাতের কিল মেরে 'দুষ্ট' বলে তিরস্কার করতেন। পেটে অম্বলের ব্যথায় কিরণদার অসুখ করল। যন্ত্রনায় দেহখানা আড়ষ্ট হয়ে ধনুকের মত হয়ে যেত। কর্ণেল বাবাজীবন সিং তাঁকে শুধু তরল খাদ্যের উপর রেখে সুস্থ করলেন। মাস খানেক পরে দেখা গেল, কিরণদা মধুদার ঘরে আখরোট চুরী করে খাচ্ছেন। ধরা পড়ে বললেন, কি করব ভাই, মাড় খেয়ে খেয়ে, মুখে অরুচি হয়ে গেছে। আখরোট দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। এমনি সব এক একটী প্রকৃতির চরিত্র ছিল। অনেকের আদর্শ ছিল, কঠোর ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জীবনের সকল কিছু নিয়োগ করা দেশের মুক্তির সাধনায়। যুগের পরিবর্তনে এ রকম চরিত্রের পুনরাবির্ভাব নাও হতে পারে, নূতন নূতন স্বরূপের চরিত্রের বিকাশ সম্ভব। কিন্তু দেশ বা জাতির জন্য মহত্ত্বে ও

ত্যাগে তরুণের প্রাণ একালের তেমনি দুঃসাহসী, তেমনি উদার দেখা যায়। আজও তাদের অন্তরে আমাদের পুরাতন প্রাণের প্রতিচ্ছবি নবরূপে দেখতে পাই।

জেল কর্তৃপক্ষের চুরীর অতিশয্যে আমাদের খাদ্যাদির ব্যবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হতে লাগল। অধিকন্তু আমাদের চার পাঁচ জন করে বিভিন্ন ইয়ার্ডে ভাগ করে দিলে, তাতে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব খুব বেশী হয়েছিল, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। আবার হুকুম হ'ল, এক ইয়ার্ডের লোক অন্য ইয়ার্ডের লোকের সহিত কথা কহিতে পাবে না। বিহারী প্রহরীরা ছিল আমাদের অনুগত। তারা চিঠি চালাচালি করে দিত। আমাদের তারা শ্রদ্ধা করত। জেলর ভাতুযা সিং বদলী হয়ে অন্যত্র চলে গেল, এক ইউরোপীয় জেলর এল। তার দেহ ও বুদ্ধি দুইই ছিল নিরেট। সে ব্যবহারে খুব কঠোরতা দেখিয়ে আমাদের বশ করবে ভাবলে। তার বিশ্বাস, ভারতবাসীকে দাবিয়ে রাখার জন্য দরকার, খুব কড়া শাসন। বিবাদ ঘনিয়ে উঠল ও আমরা প্রায়োপবেশন সুরু করলাম।

যাঁরা নেতৃত্ব নিলেন, তাঁদের মধ্যে অবিনাশ বাবু, নলিনীদা, প্রভাসদা মনোরঞ্জনদা ও মধুদা। ছোটনাগপুরের কমিশনর আমাদের সঙ্গে যখন দেখা করতে এলেন, প্রভাসদা তাঁকে সরকারী জুলুম ও বেআইনী দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা দিলেন। তিনি ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। যখন তিনি বললেন Your

Honourable Mr. Comming, your Hon'ble Mr. Stephenson, they are liers' মনে পড়ে তাঁর উন্নত দেহ, প্রশস্ত ললাট, বৃহৎ চক্ষু দুটীতে যেন অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত। বজ্র গম্ভীর স্বরে যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন, মনে পড়ল মার্ক এণ্টনির স্পীচ্। ঝানু সিভিলিয়ন চুপ করে সব শুনলেন। কিছু উত্তর করলেন না। পরের দিন প্রভাসদাকে বদলী করে অন্য জেলে নিয়ে গেল। সেখানে একা থাকতে হবে। খাবার সময় ক্ষুধার উদ্রেক হল, কিন্তু মনের বলে তা গ্রাহ্য করলাম না। শুধু জল পান করতাম। এমনি ভাবে, অনশনে চারদিন চার রাত্রি কেটে গেল। পঞ্চমদিনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের অভাব অভিযোগ সমস্ত মেটাবার প্রতিশ্রুতি দিতে, অনশন ভঙ্গ করা হল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে গভীর রাতে ভীষণ চীৎকার ধ্বনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। গুমটী থেকে ঘন ঘন বিপদ সঙ্কেত এলারমধ্বনি ও দুম দুম বন্দুকের শব্দ শুনতে পেলাম। প্রহরীরা আতঙ্কিত অবস্থায় ছুটাছুটী করতে লাগল।

তাদের নিকট সংবাদ পেলাম, "পাঞ্জাবী লোক ভাগা" আমাদের সমুখে চার নম্বর ইয়ার্ডে রাজনৈতিক পাঞ্জাবী কয়েদীরা থাকত। শুনেছিলাম, তাদের অনেকে কামাগাটা মারুর বা আমেরিকা প্রত্যাগত, কেউ কেউ ছিল লাহোর রাজনৈতিক মামলাব কয়েদী, অধিকাংশের ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

সেলে বাতাস যাতায়াতের জন্য ছাদের কাছে সামনের দিকে একটু জায়গা রেখে ছিল, তার মধ্যে যে লোহার গরাদে ছিল, তার একটাতে ছিল ফাঁক। দরজা বেয়ে উঠে তার মধ্য দিয়ে গভীর রাতে একজন কয়েদী বাহিরে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। প্রহরী ছিল বাহিরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। বন্দীটী পিছন থেকে হঠাৎ চেপে ধরে তার পোষাক খুলে নিয়ে মুখের মধ্যে কাঁকড় পুরে হাত পা মুখ সব বেঁধে ফেলে রাখে ও নিজে তার উর্দি পরে প্রহরী সেজে টহল দিতে থাকে। রাত্রি তিনটায় প্রহরীর বদলীর সময় জমাদার আসে। তাকেও চেপে ধরে ওভার কোট ও পাগড়ী কেড়ে নিয়ে বেঁধে ফেলে ও তার কাছ থেকে চাবির গোছা হস্তগত করে। তখন বারটী সেল খুলে সকলেই বেরিয়ে পড়ে, তার মধ্যে দুজন প্রহরী ও জমাদারের পোষাকে সজ্জিত। পরস্পরের কাঁধে কাঁধে চড়ে তারা প্রাচীর লঙ্ঘন করে। শুধু শেষ দুজন, যারা নীচে থেকে কাঁধ দিয়েছিল, তারা রয়ে গেল। এমনিভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাচীর বেষ্টনী লঙ্ঘন করে তারা খালের জলে ঝাঁপ দেয় ও সাঁতরে কারাগারের বাইরে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে।

সকালে প্রহরী ও সৈনিক দিয়ে জঙ্গল ঘেরাও করে তাদের ধরবার চেষ্টা চলল। ঘন ঘন বন্দুকের ফায়ারিং এর শব্দ আমাদের কানে আসতে লাগল। উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাই, তারা যেন ধরা না পড়ে। চারিদিকে বহু সশস্ত্র সৈনিক, তার মধ্যে নিরস্ত্র মুষ্টিমেয় তারা।

পাথর টুকরা ছাড়া অন্য কিছু নাই যাতে আক্রমন প্রতিরোধ করতে পারে। যে দুজন প্রহরীর উর্দি পরা ছিল, তারা ব্যতীত অধিকাংশই ধরা পড়ল। শুনেছি, জঙ্গল অতিক্রম করে যারা গ্রামের মধ্যে ঢুকতে সক্ষম হয়েছিল, তারা যখন গ্রামবাসীদের নিকট তৃষ্ণার জল চেয়েছে, উন্নত দেহ, দীর্ঘ কেশ, শ্মশ্রু, ও কয়েদী সাজ দেখে, ডাকাত বলে, লোকেরা পুলিশে খবর দিয়ে তাদের ধরিয়ে দিয়েছে। বাংলা দেশে স্বদেশীদের প্রতি যেমন সাধারন লোকের মনে অল্প সহানুভূতি জেগে ছিল, বিহারে তখনও সেরূপ কিছু মনোভাবের সৃষ্টি হয়নি। বিপ্লবে জনমনে দেশাত্ম বোধের কত যে প্রয়োজন, সেকালে আমরা তেমন উপলব্ধি করিনি। জন হিতৈষীরূপে তাদের কিছু উপকারী সাজতাম, সাধারন লোকদের মধ্যের একজন হয়ে দেশ প্রীতি জাগিয়ে তোলবার সম্যক চেষ্টা তখন ছিল না। এ কাজ কিছু হয়েছিল, পরে, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে, এখনও বহু বাকী। কারাগারের বন্ধ প্রাঙ্গনের লোহার দরজার ফাঁকে দেখলাম, আহত রক্তাক্ত লোকদের, একদিকে শুধু চুলের মুঠি ও অপর দিকে পা দুটা ধরে হত জন্তুর মত ঝুলিয়ে আনছে, দেহের আর কোনও স্থানে ধরবার প্রয়োজন বোধ করেনি। তারই উপর জমাদার সবুট পদাঘাত করছে, থুক ফেলছে, তার কয়েদী পালিয়েছিল, নোকরীর খাতায় কালা দাগ পড়বে, তাই তার আজ অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। সেই থেকে পাঞ্জাবী রাজ-নৈতিক বন্দীদের উপর সুরু হল ভীষণ অত্যাচার যা মধ্য যুগে

ছাড়া হওয়া সম্ভব বলে কল্পনা করতে পারতাম না। মানুষ যে মানুষের উপর এমন অত্যাচার করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না, দিন রাত্রি সকল সময় তাদের হাতে পায়ে কোমরে ভারী ভারী দাণ্ডা বেড়ী লাগান থাকত। দেওয়ালে লাগান হাতকড়া দিয়ে বেঁধে রৌদ্রে সারাদিন দাঁড় করিয়ে রাখত, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটলেও এক ফোঁটা জল দিত না। তেকোনায় তাদের বেঁধে পিঠে বেত লাগাত। রক্ত ঝরে যখন মৃত প্রায় অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে যেত, তখন ডাক্তার দিয়ে সজ্ঞান করে পুনরায় বেত্রাঘাত চালাত। মানুষের বসতি থেকে দূরে, অরণ্য পরিবেষ্টিত কারাগারের এই সব নৃশংস অত্যাচারের সংবাদ লোকালয়ে পৌঁছিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্যই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করেছিল।

ক্ষমতার সঙ্গে কত মানুষ মনে করে, তার অত্যাচারেব কথা কেউ জানবে না ও প্রতিবিধানের কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু তারা ভুলে যায়, কোনও কোনও মানুষের মনে যেমন এই নিষ্ঠুরতা আসে, তেমনই মানুষের মনে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আসে প্রতিক্রিয়া, নির্য্যাতীতের প্রতি জাগে, করুণা, সহানুভূতি। তাই দেখলাম, নোকরী অন্ত প্রাণ হিন্দুস্থানী প্রহরীদের কয়েকজন, শাস্তি বা কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা তুচ্ছ করে ও নিজ ব্যয়ে, ডাক টিকিট সমেত খাম এনে দিল ও আমাদের লিখিত চিঠিতে কলকাতায় জাতীয় নেতাদের নিকট সংবাদ পৌঁছে গেল।

এইরূপ সহায়তা না পেলে কি হ'ত জানি না। কিন্তু মানুষের অন্তর দিয়ে ভগবান পথ সৃষ্টি করে দেন।

ধনী ভাবে তার চতুর্দিকে নির্ধন থাক যাতে সবার উপর প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে, যাতে দারিদ্রের নিষ্পেষণে, শুধু বাঁচবার জন্য, সকলে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে বশ্যতা স্বীকার করে। প্রবল চায় আর সকলে দুর্বল থাক যাতে নির্বিঘ্নে অত্যাচার শাষণ ও শোষণের সুযোগ থাকে। তাদের ধারণা, ভীতি প্রদর্শনে ও অত্যাচারে বশে আনা যায় না, এমন মানুষ দুনিয়ায় নাই। তারা ভুলে যায়, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রবল বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যারা দাঁড়ায়, তারা পশুবলের কাছে শির নত করে না। নহিলে তারা উচ্চপদ ভোগ সম্পদ আদি আত্মস্বার্থ বিসর্জন করে সর্বস্বান্ত হতে দেশের কাজে এ পথে আসত না। শাস্তির ভয়ে সৎপথে থাকে, এমন লোকের অভাব নাই, কিন্তু স্বভাব জাত সততায় সমাজের জন্য ত্যাগ করে, এমন লোকও বিরল নয়। বিদেশী সরকার ভেবেছিল, অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করলেই দেশের স্বাধীনতার চেষ্টা বিলুপ্ত হবে, সেটা যে স্বাধীনতা প্রেমিকের পক্ষে কতবড় ভুল তা ইংরেজের মত বুদ্ধিমান জাতি কেন যে বোঝেনি, আশ্চর্য্য লাগে।

বাংলা থেকে পাঞ্জাব কত দূর। কিন্তু পাঞ্জাবী বন্দীরাও দেশের জন্য আমাদেরই মত কারাগারে নির্য্যাতিত। বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র আদি বিভিন্ন প্রদেশ বাসীর মধ্যে ভারতীয়

এক জাতিত্ব মনোভাবের কিছু সৃষ্টি হয়েছিল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

প্রহরীদের সহায়তায় গোপনে সংবাদ পত্র পেতাম। পড়লাম, জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা, নিরস্ত্র জনসভায় সৈন্যরা মেসিনগান চালনে অসংখ্য হিন্দু, শিখ, মুসলমানদের হত্যা করে মিলিত ভারতীয় রক্তস্রোত বহিয়ে দিলে। ভাবলাম, যে বন্দুক ও গুলিতে তাদের হত্যা করা হ'ল, সেগুলি আমাদেরই দেশবাসীর করদত্ত অর্থে ক্রীত, যে সৈন্যেরা মেসিনগান চালাল, তারা আমাদেরই দেশের লোক ও আমাদেরই অর্থে তাদের পোষণ করা হচ্ছে। শুধু তাদের হুকুম করছে বিদেশী ডায়ার ও হত্যা, অত্যাচার, অপমানের নির্দেশ দিচ্ছে পাঞ্জাবের তদনীন্তন গভর্ণর ওডায়ার, নিয়মানুগ রাজ্য শাসনের নামে। স্ত্রী, পুরুষ, মরেছে বহুজন, একমাত্র সরু যে গেট ছিল, সেখান থেকে সৈন্যেরা গুলি চালাচ্ছিল, তাদের বেরুবার কোনও পথ ছিল না। গুলির আঘাত থেকে আত্মরক্ষার্থে যারা কূপে ঝাঁপ দিয়েছিল, তাদের রক্তাক্ত মৃত দেহে কূপ পূর্ণ হয়ে গেছল। সন্তান ক্রোড়ে কত জননী, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধার প্রাণ গেছল। এই হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, ভারতবাসীদের উচিত মত শিক্ষা দেবার জন্য, যাতে স্বদেশী আন্দোলন করতে সাহস না পায়। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের বুকে স্যাণ্ডার্স নামে ইউরোপীয় পুলিশ অফিসার মারাত্মক আঘাত করেছিল, সেই আঘাতে বৃদ্ধ লালাজী রুগ্ন হয়ে কয়েক

বৎসরের, মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হন। পাঞ্জাবী যুবক ভগত্ সিং, রাজগুরু ইত্যাদি দেশ প্রেমিকগণ স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করে ও ফাঁসীর মঞ্চে আত্মপ্রাণ বলি দিয়ে, জীবনের জয় গান গেয়ে, বলে গেল, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, বিপ্লব হোক চিরজীবি।

ভাবতাম, বিপ্লব সর্বমুখী ও সর্বজয়ী হোক, রাজনৈতিক পরাধীনতা, সমাজ ও ধর্মের কুসংস্কার, আর্থিক বৈসম্য, যত কিছু অন্যায়, অবিচার ও আবর্জনা, বিপ্লবের আগুনে পুড়ে যাক, নব জাতি নূতন জীবনে বেঁচে উঠুক, তরুণ প্রাণের দহনে।

বাংলা দেশ থেকে স্বাধীনতার বাণী সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" এই সরল সুন্দর ভাষায় ১৯০৫ সালে কবি রঙ্গলাল যে গান গেয়েছিলেন, তার বাণী ১৯১৯ সালের পরে ভারতবাসীর মনে পূর্ণতর রূপ নিয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে উদয় হয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত, নব-পথ দ্রষ্টা, অহিংস সত্যাশ্রয়ী গান্ধী, ভারতের আত্মার প্রতীক রূপে, নূতন বিপ্লব পন্থা নিয়ে। কারাগারের বহু বাধা বেষ্টনীর ফাঁকে ফাঁকে এ সকল সংবাদ, লোহা পাথর ভেদ করে আমাদের কানে আসত ও মনে আলোড়ন জাগাত। ভাবতাম, পৃথিবীতে ও ভারতে ঘুর্ণী হাওয়ায় সব ওলটপালট হচ্ছে, আর আমরা কারাগারে বদ্ধ সেলে অলস বন্দী! আবার মনে হত, বৃক্ষ যেমন বাইরে ধীর স্থির, কিন্তু তার মধ্যে অনুক্ষণ সৃষ্টির কর্ম নিঃশব্দে চলে, তেমনই কারাগারে আমাদের এই বন্দী থাকার মধ্য দিয়ে ভারত এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার পথে!

একটু অপরাধ স্বীকার, ক্ষমা ভিক্ষা 'সৎপথে' চলার প্রতিশ্রুতি দিলেই ত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পাই! আমাদের দৃঢ় চিত্তে দুঃখবরণ, তিল তিল করে জীবনের দিনগুলি আহুতি দান, এ সব কি নিরর্থক, বৃথা, হতে পারে! ভারত যতদিন না স্বাধীন হয়, দেশের কোটী কোটী লোক যতক্ষণ না মানুষের মত বাঁচবার অধিকাব লাভ কবে, ততদিন কি আমরা জীবনের সুখ শান্তি আরাম বিশ্রাম কামনা করতে পাবি? মনের যখন এরূপ অবস্থা, পুবাতন সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট চলে গেল, নূতন এল। সে আধা বুয়র আধা ইংরেজ, দুই জাতের, ভালোর নয়, মন্দের সংমিশ্রন। সে এসেই সকলকে অপমান সুরু করলে। প্রভু-জাতের বলে হয়ত তার দৃঢ় বিশ্বাস, দাস জাতিকে সায়েস্তা রাখতে শুধু ডাণ্ডার ব্যবস্থার প্রয়োজন, অপমান ও দুর্ব্যবহার যতই অমানুষিক হবে, আম্যদের প্রভু ভক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে, পাশবিক শক্তির কাছে নত হবে না, এমন লোক জগতে আছে নাকি, বিশেষতঃ ভারতের নেটিভদের মধ্যে!

হাজাবীবাগ জেলে দ্বিতীয় প্রায়োপবেশন

পাঁচটী ইয়ার্ডে আমাদের ভাগ করে রেখেছিল, প্রত্যেকটীতে ছিলাম প্রায় আটজন করে। অপমানের মাত্রা যখন সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল, কয়েকটী অনুগত কয়েদী ও প্রহরীদের সহায়তায়, পত্রের আদান প্রদানে পরস্পর পরামর্শ করে, আমাদের দ্বিতীয়বাবের প্রায়োপবেশন সুরু হ'ল। খিলাফতীদের

ছয়জন বন্দী আমাদের সঙ্গে যোগ দিল না, তাদের দৃষ্টিছিল ভারতের প্রতি নয়, তুর্কীর দিকে। যে দেশের ক্রোড়ে তারা জন্মাল, যে ভূমি মা তাদের অন্ন দিলে, পালন করলে, সে তাদের আপন মা হ'ল না।

আমরাও তাদের আপন ভাই বলে কাছে টানলাম না, মানুষের পক্ষে একতা বদ্ধ হওয়ার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এই ঐক্যের বন্ধনী শক্তি, দেশ, যেমন দেখা যায় ইউরোপে, আমেরিকায়, না ধর্ম যেমন মুসলমানদের, না শ্রম যেমন চেয়েছে রাশিয়ায়? আমার মনে হয়, সর্বজাতিক মানবতাব পথ হল জাতীয়তার ঐক্য সূত্র। ভবিষ্যতের গতি সর্ব মানবতার দিকে। প্রতিবেশীকে ভিন্ন ধর্মী বলে যে আপন করল না, জগৎবাসীকে আপন করা তার পক্ষে অসম্ভব।

এবারের প্রায়োপবেশন সহজে মিটবে না ভেবে, আমরা পূর্বেই কলকাতায় সংবাদ পাঠিয়ে ছিলাম। বাইরে আন্দোলন না হলে, আমরা মরে গেলেও কর্তৃপক্ষ জিদ্ বজায় বাখবে ও আমাদের মনোবল শেষ পর্য্যস্ত ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করবে। প্রত্যেক সেল খানা তল্লাসী করলে, যদি কোনও খাবার জিনিষ লুকানো থাকে। কোকোর একটা কৌটা ছিল, সেটা নিয়ে গেল, পাছে খাই ও সেই সঙ্গে শাষিয়ে গেল, এবার আমাদের এমন শিক্ষা দেবে, যাতে ভবিষ্যতে কখনও প্রায়োপবেশনের কথা ভাবতে সাহস না করি।

তেল মেখে স্নান করলাম ও জল পান করে শুয়ে রইলাম। কয়েদী পরিবেশন-কারীরা সময় মত খাদ্য আনলে, নিলাম না, ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় পরিবেশন-কারীদের চোখ ছল ছল করতে লাগল। আমাদের না খেয়ে থাকা তাদের প্রাণ স্পর্শ করে। সে সময় জিহ্বায় জল এল, ক্ষুধায় পাকস্থলী তীব্রভাবে চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু মনের বলে, দুর্বলতা দমন করলাম। সেই সময় মহামণীষী টলষ্টয়ের লেখা "রেজারেক্সন" বা পুণর্জীবনের ইংরাজী অনুবাদ বইখানি পেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিবিষ্ট মনে পাঠ করতে লাগলাম। টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, এঁদের মত মহামানব, জন্মভূমি নির্বিশেষে তাঁরা সর্ব দেশের মানুষ মাত্রেরই আপন, পরমাত্মীয়।

যে মহাজীবন তাঁরা যাপন করে গেছেন, দর্শন কবিতা ও সাহিত্যের যে মহাসম্পত্তি তাঁরা বিশ্বের মানব জাতিকে দান করে গেছেন, জাতি দেশ নির্বিশেষে আমরা সকলে তার উত্তরাধিকারী।

খাওয়া নাই, অফুরন্ত অবসর, সেই নির্জন নীরব সেলে শুয়ে, সারা মন প্রাণ ডুবিয়ে, পড়তে লাগলাম, সে করুণ কাহিনী! অপরাধের বিচার করতে বসে স্বয়ং জুরী বিচারক দেখেন, মূলতঃ স্বয়ং তিনিই প্রকৃত অপরাধী। যে নারী আজ হত্যাপরাধে বিচারার্থে সমুখে আনীত, তাকে তিনিই এক সময় ভাল বাসতেন, প্রথম যৌবন ঊষায় পবিত্র অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পের মত একটী সুন্দরী সরলা গ্রাম্য বালিকাকে প্রলুব্ধ করে উপভোগান্তে

আবর্জনা স্তূপে পরিত্যাগ করে গেছলেন। সেই বালিকা আজ চরিত্রহীনা, রূপ যৌবনের বেসাতি তার জীবিকা। বিচারের দণ্ড তার নিজেরই প্রাপ্য। আত্ম পরিচয় দান করে আসামীর নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও স্বার্থ শূন্য নিষ্কাম প্রেমেব দ্বারা সাইবিরিয়ার পথে তার পবিত্র জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

বইখানি পাঠ শেষ করে মনে হ'ল, ঋষি টলষ্টয় যেন বিশেষ করে আমারই মত বন্দীর জন্য বইখানি লিখেছিলেন, কারাগারে নিঃসঙ্গ সেলে, প্রায়োপবেশনে, এমনিভাবে মৃত্যুব সমুখে, শয্যাশায়ী হয়ে, পড়ব আর প্রাণে পাব অপূর্ব শান্তি।

একটী একটী করে বারোটী দিন ও রাত কাটল, রেজারেক-সন বইখানির পাঠ সাঙ্গ হয়ে গেছে। শরীবে শক্তি নাই, দৃষ্টি ক্ষীণ, দেহ, মস্তিষ্ক, সবই ফাঁকা মনে হয়। যেন অঙ্গের মধ্য থেকে সব পদার্থ কেউ বার করে নিয়েছে। মাঝে মাঝে পেটের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা লাগে, মনে হয় যেন কোনও জীব ধারাল দাড়ায় কুঁড়ে কুঁড়ে পাকস্থলীটাকে খাচ্ছে। হাত পা নাড়াবার শক্তি পাইনা, জল পান করি, ভাল লাগে না, বিস্বাদ লাগে, বমির উদ্রেক হয়। নির্জন সেলে একা শুয়ে থাকি।

জাগ্রত অবস্থাতেও মনে পুরাতন স্মৃতি ভেসে আসতে থাকে, ছেলেবেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, যাব বাহ্যিক মূল্য নাই, কিন্তু অন্তরে যে ছাপ পড়ে গেছে, যা মুছে যায়নি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, কবে মার কাছে কি খেয়েছিলাম. গরম রুটী পটল ভাজা সমেত. নূন বা মুগের ডাল, দিয়ে আলুরদম খেতে কেমন

লাগত। ঘুম ভেঙ্গে গেলে বুঝতাম, ঠোঁটটা জিভ দিয়ে ভিজিয়ে ফেলেছি। মনকে ধমক দিয়ে 'হুসিয়ার করে দিতাম, খাবার ইচ্ছায় ব্রত ভঙ্গ না করে ফেলি। তখনই ভাবতাম, আর সকল অনশনব্রতী সহবন্দীদের কথা, তারা যে যার সেলে শুয়ে আছে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের মত। আহারের কোনও লোভ বা ক্ষুধার তাড়না তাদের পণ ভাঙ্গাতে পারে না। আহার গ্রহণ করব, সকলেই এক সঙ্গে, এর মধ্যে কারুব যদি মৃত্যু হয়, উপায় নাই। চল্লিশজন অনশনব্রতী বিপ্লবীর আত্মা, হাজারী-বাগের জেলে যেন ব্যাপ্ত হয়ে আছে ও সকলের মিলিত মনোবল যেন প্রত্যেককে শক্তিমান, বিজয়ী বীর, করে তুলছে।

জেলের ডাক্তার বাঙ্গালী, আমাদের প্রতি আন্তরিক বন্ধুভাবা-পন্ন। নাড়ী পরীক্ষা করে বলেন, একটু দুধ খান, এমনভাবে জেলের মধ্যে আত্মহত্যায় লাভ কি! চুপি চুপি বলেন, আপনারা বেঁচে না থাকলে ইংরেজ তাড়াবে কে? নাড়ীর গতি ক্ষীণ, শ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হয়। অন্ধকার রাতে, নির্জন সেলে, হাতে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করলাম, কখন হয়ত জীবনের দীপশিখা নিভে যাবে, তখন যদি জ্ঞান হারাই, কেউ জানবে না, নিজেও টের পাবনা, মরে যাচ্ছি। ভাবতাম, পূর্ব জন্ম, পর জন্ম, বা জীবাত্মা বলে কিছু আছে কি? যাতে মরে গিয়েও মরব না, দেহ থেকে অদেহী হয়ে থাকব বা দেহান্তরে জন্ম নোবো! আবার এই প্রিয় পৃথিবীর রূপ, রসের আস্বাদ পাব! ডারউইনের ক্রম-বিকাশবাদ পড়ে মনে

হয়েছে, জীবাত্মা, জন্মান্তর ও সব কিছু নয়, শুধু মনকে ভোলাবার স্তোক মাত্র। মানুষ মরলে আর জন্মায় না, তার পূর্ব বা পর জন্ম নাই। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের যাত্রা পথে প্রকৃতি এগিয়ে চলেছে। তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষলতা জীব জন্তুর ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে আজ জীব শ্রেষ্ঠ মানব এসেছে, হয়ত কোনও মহামানবে পরিণতি পেতে। এ পথের আদি কেউ জানে না, অন্তও অজ্ঞাত। হয়ত পিতা, ঠাকুরদা আদি পূর্ব পুরুষ আমাদের পূর্ব জন্ম ও পুত্র পৌত্রাদি অনাগত মানুষ আমাদের পর জন্ম। এই বিচিত্র সৃষ্টির জীবন ধারার সম্যক সদুত্তর আজও কেউ দিতে পারে নি।

হৃদ স্পন্দন যদি হঠাৎ থেমে যায়, যদি মৃত্যু আসে, তবে এই যে আমি এখন আছি, আর থাকব না। অনাদি অনন্ত-কালের একটী অতি ক্ষুদ্র অংশ, জীবনের কয়েকটী বৎসরের বুদ্‌বুদ্, চিরকালের জন্য লীন হয়ে যাবো, নিশ্চিহ্নভাবে, অখণ্ড অরূপ এক সত্বায়। দুর্বল হলেও মস্তিষ্ক নির্মল। উঠতে গেলে শক্তি পাই না, মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। টলে পড়ে যাই। কিছু ধরে দাঁড়াতে বা ধীরে ধীরে ধীরে চলতে হয়।

সংজ্ঞা হরালাম, জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি, ডাক্তার দুধ খাইয়ে দিচ্ছেন, তাতে চিনি মিশ্রিত ও ব্র্যাণ্ডির গন্ধ। প্রায়োপ-বেশনের চৌদ্দ দিন কাটাবার পর ষ্ট্রেচারে শুইয়ে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। দেখি আমাদের মধুদাকেও পাশাপাশি

ষ্ট্রেচারে নিয়ে চলেছে, পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে হাসলাম। মধুদার দেহ শীর্ণ, তার উপর এই চৌদ্দদিনের উপবাসে তার শরীর এমন পাতলা হয়ে গেছে, যেন ষ্ট্রেচারের চাদরে মিলিয়ে আছে, শুধু বড় বড় চোখ দুটোতে উজ্জ্বল দৃষ্টি। মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'সতীশ, কেমন আছ ভাই।' অনশনে ক্ষীণ মৃত্যুপথ যাত্রীর পরস্পরের প্রতি কি সে গভীর স্নেহ, দরদ! ভাষা এখানে মূক। বিচিত্র কত সে অভিজ্ঞতা মনের উপর আঁকা রহে গেছে। কারাগারে এ সকল নিস্বার্থ বিপ্লবীদের যে সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল, বাহিরে তা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারাবাসের দুঃখে কষ্টে, আগুনে পুড়ে সোনার রঙ্ যেমন উজ্জ্বলতর হয়, তেমনি অনেকের অন্তর ও চরিত্রগুলি যেন নির্মল, দেশপ্রীতি ও বন্ধু প্রেমে সুন্দরতর হয়ে উঠেছিল। পরে ঐশ্বর্য ও ধন, মানের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় যখন আবার তাদের দেখেছি, সে পুরাতন বন্ধুদের আর খুজে পাইনি, অতীতের তারা অতীতেই মিলিয়ে গেছে।

হাসপাতালে খাটের সঙ্গে দুজনের হাত পা ও সর্বাঙ্গ এমন করে বাঁধলে, যেন নড়তে না পারি। তারপর মুখের মধ্যে গ্যাগ লাগিয়ে তার ছিদ্র পথের মধ্য দিয়ে নল ঢুকিয়ে, ফানেলের সাহায্যে চিনি ব্র্যাণ্ডি মিশ্রিত জোলো দুধ ঢেলে দিলে। জিভের ডগা দিয়ে নলের মুখ চেপে থাকায় পেটে দুধ গেল না। তখন নাকের মধ্য দিয়ে সরু রবারের নল পাকস্থলীর মধ্যে চালিয়ে দুধ ঢাললে। বাধা প্রদানের সকল রকম চেষ্টা ব্যর্থ হল। ভীষণ

কষ্ট হতে লাগল, বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। নল বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে গেল। ওপাশে দেখি মধুদাও বমি করছে। কিছুক্ষণ পরে কয়েদীরা, দুটা ষ্ট্রেচারে শুইয়ে, শবের মত আমাদের দুজনকে বহে নিয়ে গিয়ে, নিজ নিজ সেলে শুইয়ে দিলে। দুর্বল ও ক্লান্ত শরীরে অজ্ঞানের মত ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙ্গলে একটু সুস্থ বোধ হ'ল। যে অতি সামান্য দুধটুকু পেটে রয়ে গেছল, শরীরের অনশন অবস্থায় সে টুকুর পুষ্টি মূল্য কম নয়।

ষোল দিন কেটে গেল। আবার পেটে খিল ধরে, দেহ অবশ হয়ে যায়। তখন আমি শয্যাশায়ী মৃত-প্রায়। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উইলসন এসে রূঢ় ভাবে শুনিয়ে গেল, সরকারী নির্দেশ এসেছে, স্বধর্ম অনুযায়ী আমাদের শবদেহ সংকার করা হবে, অর্থাৎ তিনি ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী আমার মৃতদেহের সংকার হবে দাহ করে, গোর দেবে না, আত্মার সদ্গতির জন্য নির্ভাবনা হতে পারি। দাহ করা বা গোর দেওয়ার ওপর আমরা যেন কত নির্ভর করি!

আরও একদিন কেটে উপবাসের সতের দিন হ'ল! বুকের মধ্যে হৃদ্পিণ্ড মৃদুভাবে ধুক ধুক করে তখনও চলেছে, থামেনি। বেচারা মাতৃগর্ভের মধ্যে জীবনের প্রথম উন্মেষ থেকে, আজ পর্য্যন্ত অবিরাম দেহে রক্ত চলাচল রেখে, তার কাজ করে চলেছে। বিরাম মানেই মৃত্যু। পেট ও পিঠ প্রায় পরস্পর স্পর্শ করেছে।

দেহের যেখানে যা মেদ মাঁস ছিল. তার অনেকটা হজম করে ফেলেছি।

অষ্টাদশ দিনেব সকালে উইলসন এসে কাতর কণ্ঠে বললে, তার কন্যা পীড়িত, বাঁচবাব আশা কম, যা করলে প্রায়োপবেশন বন্ধ হয়, আমবা কি চাই, সে তাই করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। মধুদা, নলিনীদা ইত্যাদি কয়েকজনের উপর আমরা ভাব দিলাম, সর্ত ঠিক কবে মিটামাটের আলোচনা করতে। সর্তের কতকগুলি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল, বাকী কতকগুলি প্রতিশ্রুতিতে বহে গেল, বললে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টব ক্ষমতাব বহিবে, গভর্ণমেণ্টের উপর স্তবের হুকুম আনতে হবে ও তাব জন্য অনুমোদন কবে চিঠি যাবে।

অল্প ঘোল, চিনির সঙ্গে একটু গলা ভাত, আঠার দিন পরে, চামচ দিয়ে ধীবে ধীরে মুখে দিলাম। সে খাদ্যেব স্বাদ অমৃত! সারা দেহে যেন প্রাণেব সঞ্চাব আনল। কিন্তু সে পরিমাণ অত্যল্প হলেও, মনে হল যেন পাকস্থলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, বহুদিন না খাওয়ার জন্য তা' এমন সংকুচিত, ক্ষুদ্র হয়ে গেছল।

ধীরে ধীবে নূতন দেহ পুনর্গঠিত হতে লাগল। কমে যাওয়া ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে সুরু হল। একজনের বহুদিনের অসুখ ছিল, দেখলাম সেরে গেছে। আঠার দিন না খেয়ে থাকা, দুরূহ পরীক্ষার মত, তাতে উত্তীর্ণ হওয়ায় আনন্দ হ'ল। মনে ভাবলাম, তবে আমিও দুর্বল চিত্ত নহি, জীবনে পরীক্ষা ক্ষেত্রে কিছু করবার, উত্তীর্ণ হবার, শক্তি তবে আমারও আছে।

দেহ শীর্ণ মন অবসন্ন. দিন যায়, রাত্রি যায়। প্রাচীরের উপর দিয়ে কারাগারেও ঋতু পরিবর্তন আসে। দারুণ গ্রীষ্মের পর বরষা এল, এ বাংলার মহাসমারোহের বরষা নয়, বরষা এখানে যেন নিঃসম্বল উদাসী। তবু তাও মনে কিছু সাড়া জাগিয়ে চলে যায়। শরৎ এল, শীতের আমেজ ও স্বচ্ছ নীল আকাশ নিয়ে ছেলেবেলার ভুলে যাওয়া কত কথা স্মৃতিতে জাগিয়ে মন উদাস করে। স্কুলের পূজার ছুটীর কথা মনে আসে। দীর্ঘ কাল গৃহছাড়া হয়ে ঘরের ভাবনা প্রায় লোপ পেয়েছিল, মনে কতকটা নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম। তবু আশ্বিনের নূতন আলোক, অন্তরে শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যায়। প্রায়োপবেশনের সর্তানুযায়ী কতকগুলি বই কিনে লাইব্রেরী করা হয়েছিল। তার মধ্যে হার্বাট স্পেন্সসের 'সিনথেটিক ফিলসফি' বইখানি পড়তে সুরু করলাম। কলেজে ছাত্রাবস্থায় পদার্থ, রসায়ন ও-দেহ বিজ্ঞান পড়া ছিল, কিন্তু উদ্ভিদ্ ও জীব বিজ্ঞান পড়িনি। বাড়ী থেকে এই দুটী বিজ্ঞানের প্রাথমিক বই আনিয়ে পড়ে নিলাম, স্পেন্সারের বইখানি তখন বুঝতে কিছু সক্ষম হলাম। এ বিষয়ে যতীনদা (শ্রীযতীন শেঠ) আমাকে কিছু সাহায্য করে ছিলেন। বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরস্পর কথা কহা ক্রমে দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। নিষ্কর্ম দিনে চিন্তা করতাম, পড়তাম আর মাঝে মাঝে প্রবন্ধ কবিতা ও গল্প লিখতাম। সাগর কুলে কুতুবদিয়ার বা হিমালয়ে দার্জলিঙে থাকাকালে; মনে যে সকল ভাব জেগে উঠত, সে মনবীণার তন্ত্রীগুলা বেসুরা আলগা হয়ে গেছল,

পূর্বের সে সূক্ষ্ম অনুভূতির সুর আর জাগত না। বন্দী বিহঙ্গের প্রথম যন্ত্রণা, মুক্তির উদ্দাম বাসনা, সব স্তিমিত হয়ে গেছল। নিঃসঙ্গ থাকা যেন স্বাভাবিক অবস্থা। উন্মুক্ত বাহিরের পৃথিবী, স্বাধীন জীবন, এ সব যেন পূর্বজীবনের ভুলে যাওয়া স্বপ্ন। মন এখন অন্তরের ভগবানের কাছে আত্ম-নিবেদন করতে চায়। বারে বারে কবির গানে বলতাম,

"এবার বলো, আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।"

কিন্তু কাকে যে ধরতে চাই, সে কে ও কোথা, জানিনা। অভিমানের ভাবে মন ভেঙ্গে পড়ে, প্রাণের বেদনা কবিতায় প্রকাশের প্রয়াস পাই অকবির ভাষায় ও ছন্দে।

বৃক্ষলতার বাঁচতে গেলে সূর্য্যরশ্মির প্রয়োজন। মানুষের মনও তেমনি বাঁচে পরিপার্শ্ব থেকে অনুভূতি ও আনন্দের আদান প্রদানে। আকাশের নীলিমা, মেঘের মেলা, সূর্য্য, চন্দ্র, তারার দিকে তার মন ছুটে যায় আহরণের আশায়। নদীর স্রোতে, সুরে, গন্ধে, গানে প্রজাপতির পাখায়, ফুলের শোভায়, শিশুর মুখের হাসিতে, রূপে, রঙে, মায়ের স্নেহে, নরনারীর প্রেমে, মানব মনের আনন্দ। শৌর্য্যে, ত্যাগের মহত্বে, আত্মদানে, সাথীর বন্ধুত্বে সে আনন্দ অন্বেষণ করে, আনন্দ ব্যতীত মানুষের মন বাঁচতে পারে না। অনেকের দেহের মৃত্যু না হলেও মন একটা থাকে বটে, কিন্তু সেটা অবচেতন মন, পরিস্ফুট মানব মন নয়। আকাশবাণীর ঢেউএর মত, মানব মন দিক বিদিকে ছুটে যায়,

মৌমাছির মত আনন্দের মধু আরহণ করে অন্তরের মধুচক্রে ফিরে ফিরে আসে। শুধু আহার ভোগ ও বংশ বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট নয়। প্রসার লাভের জন্য সে প্রকৃতি ও মানবের সংস্পর্শ অন্বেষণ করে। কিন্তু কারাগারের পাথর ও লোহার মধ্যে এ সব কোথায় পাব। বন্দীর উপায় কি!

সুধীন থাকত পাশের সেলে, বয়সে সে আমার চেয়ে ছোট। কলিকাতায় আরপুলি লেনে সে নাকি এক সিআইডিকে গুলি করে মেরে পালাতে পেরেছিল। আমাদেব তুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল গভীর। সে আমার সেলে জিনিষ পত্র সব সুন্দর ভাবে গুছিয়ে দিত, অসুখে সেবা শুশ্রুষা কবত। তাব চুলটী থাকত সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছেদে সে পবিপাটী। অন্যান্য অনেকে জেল কর্তৃপক্ষের নিকট অভাব অভিযোগ জানাত, কিন্তু সুধীন সে বিষয়ে নির্বিকার। সে বলত, যারা আমার দেশ জাতি পরাধীন কবে রেখেছে, তাদেরই প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষুদ্র অভিযোগ নালিশ করব কি! বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনায় বহু সময় কাটত। সে বলত, শুধু রাষ্ট্র বিপ্লবে কি হবে যদি না ধর্মে অর্থ নীতিতে ও সমাজে বিপ্লব না আসে! তার উত্তরে আমি বলতাম, আগে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা আসুক, স্বরাজের সকল পথ উন্মুক্ত হোক, পরে সকল রকমে স্বাধীন হওয়া যাবে। তখন তার জন্য বিলম্ব হবে না। অসুখের সেবার জন্য কোনও কোনও রাত্রে আমার সেলে থাকবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি পেত। সারা রাত্রি আলোচনা

করে কাটাতাম। আমাদের কথা যেন ফুরোতে চায় না। কোনও কোনও রাত্রি, আলোচনা করতে করতে ভোর হয়ে যেত।

ধর্ম, জাতি, প্রদেশ, ভাষা ও অবস্থা ভেদে আমরা বহুরূপে বিভক্ত। বড় বড় দর্শন থাকলেই জাতি বাঁচে না যদি না তার এক জাতিত্ব বোধ থাকে, যদি না এক স্থানের আঘাত সারা ভারতের শিরায় প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার আনে! সেই মহাভাবত কি জীবনে দেখতে পাব?

সুধীন বলত, আমাদের দেশে বেদান্ত, উপনিষদের মত দর্শন সৃষ্টি হয়েছে। মানুষকে বলেছে অমৃতের পুত্র। এত বড় কথা কোনও দেশ বলেছে কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের এই তুর্ভাগা দেশে এক অমৃতের পুত্র অপর এক অমৃতেয় পুত্রকে স্পর্শ করতেও ঘৃণা করে। ছায়া মাড়ালেও পাপ মনে করে। জাতি ভেদের গণ্ডী দ্বারা নরনারীর ভালবাসার বিবাহে বাধা দেয়, ক্ষুদ্রতায় ভেদাভেদে, সারা জাতিকে পঙ্গু করে রাখে। "ওঠো, জাগো, কর্ম কর," গীতার পুরুষকারের এই মহত্তম বাণীর পরিবর্তে নিয়তি, পাঁজি, পুঁথি, ও ভাগ্য লিপিতে দেশের মন আফিঙের নেশায় ক্লৈব্য ও নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন করে রাখে। পরাধীনতা মেনে নিয়ে এ দেশের লোক বহুকাল আলস্যে ও নেশাচ্ছন্ন হয়ে কাটিয়েছে, এ সকল কথার সত্যই উত্তর খুঁজে পেতাম না। বাণীর মহত্ত্বে কি হবে যদি না সে বাণীতে কর্মে উদ্বুদ্ধ হই! মানুষের মত বাঁচতে চাই না।

অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য ক্লিষ্ট জাতি শুধু দর্শনে বাঁচেনা।

চণ্ডি ছিল আমাদের ইয়ার্ডের কয়েদী বেয়ারা। তার চেহেবাটী ছিল যেন কালো কষ্টি পাথরের খোদাই করা কৃষ্ট মূর্তি। আশ্চর্য্য হয়ে তার কয়েদ হল কেন জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, দেশে থাকলে পড়েছিল, গরীব চাষীদের ঘরে ধান ছিল না। তাই মহাজনের গোলায় ধান লুট করবার মতলব করে একটা ডাকাত দল তৈরী হল। তারা সবাই হল গরীব কৃষক, ডাকাত বলতে যা বোঝায়, তাদের কেউ সে রকম ছিল না। আমাকেও তারা জোর করে দলে টেনে নিল। ডরে কাঁপতে লগেলাম, ডাকাতি করব কি! তবু তারা ছাড়ে না, তাদের লোক কম। যে টুকু ধান পাওয়া গেছ্‌ল, পেট ভরল না, কয়েকদিন পরে পুলিশ এসে ঘরের জিনিষ পত্র ভেঙ্গে চুড়ে, ধান কেড়ে নিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গেল। মার পিট্ করলে, আর পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড পেলাম। ভাবলাম, লোকদের দুর্ভিক্ষের কবলে ঠেলে দিয়ে গোলাদার অতি পরিমাণে মানুষের অন্ন সঞ্চয় করে রাখে, অথচ যে মানুষগুলা ক্ষেতে লাঙল দিয়ে রৌদ্রে বৃষ্টিতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সেই ধান্যের চাষ করে ছিল, তারা আজ সপরিবারে বুবুক্ষু। যে উৎপাদন করল, তার ঘরে শস্যের কণাটী মাত্র নাই, অথচ যে মাটী স্পর্শ কবল না, তার প্রচুর শস্য! এমনি আমাদের অর্থনীতি, এমনই আইনের বিধান! আর আমাদের দেশের লোকের অসীম সহ্য শক্তি, অদ্ভুদ্ ধর্ম জ্ঞান, তারা না খেয়ে মরে

তবু লুট করে না। চণ্ডী লুট কবতে গেছল, তাই সে আজ কারাগারে। লুঠ করা মন্দ কাজ, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যার প্রচুর আছে, তাঁর কেড়ে না নিয়ে কারুর না খেয়ে মরা, চোখের সমুখে স্ত্রী পুত্রদের মরতে দেখা, এটা সত্যকার সাত্বিকতা না তামসিকতার পরিচয়, ভেবে সঠিক উত্তর পাই না। চণ্ডীর চেহারা, তার সেবাপরায়ণ স্বভাব দেখে, মনে হয়না সে ডাকাত হতে পারে! সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যের পানে চেয়ে চুপ করে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। ভাবি, ওই আধ অসভ্য নিরক্ষর মানুষটা, ওরও অন্তবে প্রকৃতির সৌন্দর্যের আকর্ষণ আছে কি! জিজ্ঞাসা করলাম, চণ্ডী, চুপ করে কি দেখিস, কি ভাবিস রে? মুখে লজ্জার আভাষে একটু ম্লান হেসে সে বললে, বাড়ীর জন্য মন কেমন করে দাদাবাবু! ছেলেমানুষ বৌটা, খেতে পাচ্ছে না, আমিই ত চাষ করতাম। বললাম, ভাবিস না, যিনি সকলকে দেখেন, সেই ভগবান দেখবেন। বলেই মনে সন্দেহ হল, হয়ত মিথ্যা স্তোক দিচ্ছি! কত মানুষ ভগবানদত্ত বুদ্ধিকে সৎপথে, মানব কল্যাণে না লাগিয়ে, অপরকে শোষণ করবার, তাদের বাঁচবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার কাজে লাগাচ্ছে, এত মিথ্যা নয়!

ধীরে ধীরে দিন কেটে যায়। সাংখ্যের কিছু পড়লাম। সৃষ্টির বিবর্তন তত্বে উদাসী মন ডুবে থাকে। বাবার চিঠি পেলাম, এবার আমায় ছেড়ে দেবে। সুখের কথা, কিন্তু মন তেমন আশানুরূপ উৎফুল্ল হয়ে উঠল না। কেমন যেন অবসন্ন

ভাব, নিস্তেজ হয়ে পড়েছি। বাহিরের ডাকে মনে আর তেমন সাড়া জাগে না। সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্বে মন মগ্ন। মনে সে 'পঞ্চমে স্বর' বেজে ওঠে না। 'বক্ষ এ ঘর' কাঁপে না। অন্তরের দুয়ারে আর কেউ 'কর হানে' না! ভাবি, জড়, শক্তি, চেতন, এর কোনটা আদি! এক না তিন! দার্শণিক নই, তবু অবস্থার ফেরে সেই রকম হয়ে গেছি। মুক্তি, বাড়ী, আত্মীয় বন্ধু, সব যেন ভুলে যাওয়া স্বপন।

বিকালে কারাগারের অফিসে নিয়ে গেল, এক আই বি পুলিশ দেখা করতে এসেছেন। শিষ্ট সম্ভাষণ করে বসালাম, তিনি যেন আমার অতিথি। আমার বাড়ীর সব কুশল সংবাদ দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, আমার মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান দেশভক্তের সহিত আলাপ করতে এসে, তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। এখন, পূর্বে যা কিছু করেছি, সব খোলসা করে স্বীকারোক্তি করলেই আমার মুক্তি। আমার অপরাধের সুদীর্ঘ তালিকার একটী চার্জসিট্ পড়তে দিলেন, তাতে অনেক কিছু ভীষণ ভীষণ অপরাধের কথা লেখাছিল, যথা, আমি বৃটিশ রাজের উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধায়োজন ও তার ষড়যন্ত্র করেছি, যে বৃটীশ রাজ্য আইন সঙ্গত ভাবে বৃটীশ ভারতে স্থাপিত হয়েছে। আমি বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি মারণাস্ত্র সংগ্রহ করেছি, বোমা আদি বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত ও সংগ্রহ করেছি, খুন করেছি, ডাকাতি করেছি ও তার জন্য ষড়যন্ত্র করেছি, প্রফেসরকে প্রহার করেছি ও অন্য এক প্রফেসরকে অপমান করেছি। এর

মধ্যে এমন অনেকগুলি অপরাধ এমন ভীষণ যে প্রমান হলে প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর হতে পারত। কিন্তু ভেবে পেলাম না, প্রফেসরকে প্রহার করাব অপবাধের কথা তালিকাভুক্ত হল কি করে! যেদিন প্রফেসর ওটেন মার খেয়েছিল, তখন আমি অন্ধ, শয্যাশায়ী। হেসে বললাম, প্রায় চার বৎসর পূর্বে যখন আমায় ধরে ছিল, মিষ্টার টেগার্ট আমায় এই রকমই কথা বলেছিল, স্বীকারোক্তি করলে আর বিপ্লবী সহকর্মীদের কথা সব প্রকাশ করলে অর্থাৎ নিজস্বার্থে সাথীদের ও দেশের সর্বনাশ করলেই, মুক্তি পাব। বড় গভর্ণমেণ্ট অফিসর হ'তে পারি এমন কি আমাকে বিলাত পর্যন্ত পাঠাতে পারে। এতকাল পরে আবার সেই কথা! বললাম, এই কথা বলতে যদি এসে থাকেন, তবে নমস্কার, আপনার আসা বৃথা। তখন তিনি পাদ্রী সাহেবের মত বোঝাতে লাগলেন, খৃষ্টানরা পুরোহিতদের কাছে তাদের গোপন পাপ স্বীকার করে যেমন শুদ্ধ, পবিত্র নির্মল হয়ে নবজীবনে প্রবেশ করে, আমারও উচিত পূর্বদিনের সকল অপরাধ স্বীকার করে মুক্ত জীবনে প্রবেশ করা। এ আমার পূণর্জীবন তূল্য হবে। গীতার কথা বললেন, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। যা কাজ করেছেন, প্রকাশ করে সত্য বলুন, ফলের পানে তাকাবেন না। দেশ, সমাজ, আমাদের পানে তাকিয়ে আছে, বাইরে গিয়ে দেশের জন্য, জাতির জন্য, কত কল্যাণকর কাজ করতে পারব! এ সুযোগ নেওয়া উচিত। দেশের বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা

বিষয়ে কত কাজ করতে পারব। আমার মত ভাল লোকের বন্দী থাকায় দেশ, সমাজ, কল্যাণ-মূলক কত কাজে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি কথা বলেন ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেন, আমার মনের উপর তাঁর কথায় কিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মনে হল, যেন ট্রেণিং স্কুলে তিনি এ সব বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছেন, কেমন করে মন গলিয়ে কথা বার করতে হয়। শুনেছি, বিখ্যাত পুলিশ সি আই ডি রামসদয়বাবু আলিপুর জেলে এমনি কথা কয়ে মাণিকতলা বোমা কেসের আসামীদের মুখ থেকে অনেক স্বীকারোক্তি আদায় করে নিয়েছিলেন। কিছুই না বলায় একটু রাগ দেখিয়ে 'থাকুন তবে জেলে' বলে শাষিয়ে তিনি চলে গেলেন। আমিও প্রহরী সমেত নিজ সেলে ফিরে এলাম।

১৯২০ সালে জেলের বাইরে আসার পর, লোকটীর সহিত এক করুণ অবস্থায় আবার দেখা হয়েছিল। সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না! দাদার এক বন্ধু, ভূজেন বাঁড়ুজ্যের বাড়ী, রাজসাহীতে বেড়াতে গেছলাম। ফিরে আসবার সময় মা অনুরোধ করলেন, তাঁর জামাতা, শিববাবু পুলিশের কর্মচারী, উদরী রোগে মরণাপন্ন, একটী বৃহৎ মানকচু দিয়ে আমায় বল্লেন, বাবা, এটী মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে জামায়ের বাড়ী পৌঁছে দিও। কবিরাজ পথ্য করতে বলেছে। পুলিশের লোক হলেও অসুস্থ রোগী বলে অস্বীকার করতে পারলাম না। ঠিকানা খুঁজে সেই বাড়ীতে পৌঁছে কড়া নাড়লাম। একটী তরুণী বালিকা দরজা খুলে

জিজ্ঞাসা করলে, আমি কাকে চাই। মামার বাড়ী থেকে তার বাবাকে দেখতে এসেছি শুনে আমায় উপরে দোতলায় একটী ঘরে নিয়ে গেল। দেখি, সত্যই মরণাপন্ন প্রৌঢ় একটী লোক শুয়ে আছে। গৌর বর্ণ মুখ, দাড়িতে ভরা। আমার নাম শুনে তখনই চিনতে পেরে ও বৃহৎ মানকচুটী তাঁর শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের কাছ থেকে এনেছি দেখে, দুটী জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলতে লাগলেন, "ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা সতীশবাবু, আমি আই বি পুলিশের লোক, আপনাদের মত স্বদেশী বিপ্লবীদের সর্বনাশ করতে ক্রুটী করিনি, জেলে পুরতে, কত চেষ্টা করেছি, আর আপনি নিজে আজ আমার পথ্য এনেছেন, রাজসাহী থেকে বয়ে, খেয়ে বাঁচব বলে!" দেখি তাঁর দু চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। তাঁর কন্যাটীও তখন বিস্ময়ে সাশ্রু চোখে আমার পানে চেয়ে দেখছে। দেখা মাত্র আমি চিনেছিলাম, ইনি সেই হাজারীবাগ জেলে আমার সহিত দেখা করে স্বীকারক্তির প্ররোচনা দিতে এসেছিলেন। 'অতীতের কথা ভুলে যান' বলে স্বান্তনা দিতে, বললেন, 'ভগবান ভোলবার সময় দিলেন কৈ?' সপ্তাহ পরে সংবাদ পেলাম, ভদ্রলোক ইহ জগতে আর নাই। আর একটী ঘটনা, শুনেছি বিপ্লবী বন্ধু শ্রীসতীশ চক্রবর্ত্তীর কাছে। মেদিনীপুরের দিকে 'কাজ' ছিল, চলন্ত ট্রেনে উঠে সতীশদা দেখেন, আই বি পুলিশ অফিসর সপরিবারে সেই একই কামরায় চলেছেন। কি করেন, দরজার বাহিরের দিকে বুক ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রহিলেন, যেন

কবি মানুষ, বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছেন। হঠাৎ একটী দুই বৎসরেব সন্তান জানালা গলে সতীশদার হাতের উপর পড়ল। তিনি ধরে ফেললেন, নইলে শিশুটী পড়ে যেত। তখন তাব মা ও বাবা তাঁকে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল।

কয়েক মাস পরে যেদিন মিষ্টার টেগার্ট বহু পুলিশ নিয়ে সদলে হিন্দু হোষ্টেলে মশার পিস্তল সন্ধান করতে আসে, সেই দিন সকালে সতীশদা যখন তাঁর ঘরে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলেন, হঠাৎ একঁ অপবিচিত লোক এসে জিজ্ঞাসা করলে, সতীশ চক্রবর্ত্তী বলে কেউ আছেন? পরিচয় দিতে সে লোকটী বললে, আপনিই কি, চলন্ত ট্রেনে একটী শিশু পড়ে যাচ্ছিল, সেটীকে রক্ষা করে ছিলেন? হাঁ, বাঁচিয়েছেন বলায়, টেগার্ট আসছে, মাল যদি থাকে সরিয়ে ফেলুন' বলেই তিনি চলে গেলেন। অবশ্য মাল সরান হল। তল্লাসী বিফল হয়েছিল। সতীশদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পুলিশের লোকও তাহলে কৃতজ্ঞ হয়! হেসে বললেন, সবাই হয় না, কিন্তু কেউ কেউ না হয়ে পারে না। সব মানুষই কি সকল সময় অন্তরটীকে তালা বন্ধ রাখতে পারে। লে মিসারেবলের জাভাতেব কথা কি ভুলে গেলে? মোহিণী গুহ থাকত জেলে আমাদের ইয়ার্ডে। বড় ভালো মানুষ। বাড়ী ফিরে আসবার কিছুদিন পরে, ১৯২০ সালে সকালে বৈঠকখানা ঘরে বসে আছি, হাজারীবাগ জেলের সেই বন্ধু মোহিণী গুহ এল, সঙ্গে এক বৃদ্ধ পণ্ডিত মানুষ, পরিধানে

জামা নাই, শুধু একখানা চাদরে গা ঢেকে রেখেছেন। সঙ্গে, অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা, এক তরুণী নারী। মোহিণী বললে, ভাই সতীশ. এঁর ছেলে প্রদ্যোত ভট্টাচার্য্য ফাঁসিব আসামী, বিচারে প্রাণদণ্ড দিয়েছে, আপিলে এ চরম দণ্ড নাকচ হয়নি। এখন একামাত্র উপায় যদি করুণা পায়, আর সে দিতে পারে গভর্ণর বা ভাইসরয়। তখন ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জী মুক্ত বন্দীদের জন্য দরদের সহিত খুব পরিশ্রম করছেন ও তাঁর সাথে আমার যথেষ্ট আলাপ ছিল। সেই বৃদ্ধ পিতা ও সেই নারীটীকে নিয়ে মিষ্টার চ্যাটার্জির বাড়ীতে দেখা করলাম। তিনি চেষ্টার ক্রটী করেন নি। কিন্তু দেশের বিপ্লবী প্রদ্যোতের প্রাণ. ফাঁসির রজ্জুতে, দিতে হল। যে দিন সব শেষ হয়ে গেল, সেই পিতা ও সদ্য পতি-হারা নারী হঠাৎ আমার বাড়ীতে দেখা করতে এল, আমার চেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে। বৃদ্ধের মুখে কথা বেরুলো না, শুধু দুচোখে জল পড়তে লাগল, নারীটীর মুখ ঘোমটা ঢাকা, দেহ কাঁপছিল। আমারও মুখে কথা বেরুল না, ঝাপসা চোখে বিদায় দিলাম। কম্পিত দেহে তারা ধীরে ধীরে চলে গেল।

প্রদ্যোতের বিয়ে হয়েছিল এক বৎসর আগে, আর সে ছিল পিতার একমাত্র সন্তান। ভাবলাম. প্রদ্যোত হয়ত মানুষ খুনই করেছিল ও বিদেশী বাজার বিচারালয়ে তাকে চরমদণ্ড নিতে হল। কিন্তু একটা খুনের পরিবর্তে একি শুধু প্রদ্যোতের প্রাণই গেল! ওই যে ছায়ার মত বৃদ্ধ পিতা ও সদ্য বিধবা পত্নী চলে যাচ্ছে,

ওদের ও কি চবম দণ্ড হ'ল না! বিচারপতি কি একবারও এদের দণ্ডের কথা ভেবেছিল। কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ বড় দুঃখেই বলে গেছেন, **What man has made of man !**

এমনি কত প্রদ্যোৎ গেছে, কত বৃদ্ধ বাপের বুক ভেঙ্গেছে, কত গৃহ শূন্য হয়েছে, কত নারীর দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভরেছে, মায়ের পরাধীনতার শৃঙ্খল কি মোচন হবে না! পরাধীনতার চেয়ে সর্বনাশা অভিশাপ কল্পনায় আসে না। মানুষের মানুষ হবার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, শুধু অমানুষ হবার ধ্বংসের পথ খোলা থাকে। তাই দেশকে, জাতিকে স্বাধীন করতে, প্রদ্যোতের মত কত বিপ্লবী জীবন বিসর্জন দিল পরাধীন জাতির কোটী কোটী অমানুষের মধ্যে এমনি মানুষের আবির্ভাব হ'ল, এক দুর্বোধ্য ঐতিহাসিক বিধানে, পূর্ব পুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। আবও এক মাস কেটে গেল। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, জিতে জিতেও শেষে জার্মানির হল পরাজয়। নিজ দেশের স্বাধীনতা অর্জন নিজেদেরই করতে হবে, সত্য। কিন্তু ইংরেজ হেরে গেলে সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যেত ও আমাদের সুবিধা হত, তাই একটু হতাশ হয়ে গেলাম। ইংলণ্ড পরাধীন হোক, এ আমাদের কামনার বাহিরে, পরাধীনতার হীনতা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি, কিন্তু তবু ইংরেজ হেরে গেলে খুসী হতাম।

খুব রোগা হয়ে গেছলাম। যারা পূর্বের বলিষ্ঠ দেহ দেখেছিল, তারা এখন দেখলে চিনবে কিনা সন্দেহ। ডেপুটি

ইন্সপেক্টর জেনারল মিষ্টার ডিকসন হাজারীবাগ জেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কুতুবদিয়ার নজরবন্দী ক্যাম্পে যাবার পূর্বে চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তখন তিনি ছিলেন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্। সাক্ষাৎকালে দু একটী কথার পর বললেন, তোমাব বাবা বড় ভাল লোক, তোমাদের পিতা-পুত্রের যে চিঠির আদানপ্রদান চলত, আমি পড়তাম ও ভাল লাগত। মনে পড়ে সে সব চিঠিতে আমি যা লিখতাম, তার মধ্যে এই কথাগুলি থাকত, 'ভেবো না, ভাল আছি, দেশের কাজে জীবনে দুর্ভোগ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছি, এতে কষ্ট পাইনা।' বাবার চিঠিতে থাকত, সৎকর্মে তিনি বাধা দেবেন না, ভগবানের আশিস্ যেন পাই, তাঁরই হস্তে আমায় দিয়েছেন, কল্যাণে অকল্যাণে, তিনিই বিধাতা। ভাবলাম, ডিকসন সাহেবের স্বদেশ ইংলণ্ড, যে দেশ জগতের বহু স্বাধীনতার সাধকদের আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু সেই লোকই সাম্রাজ্য স্বার্থে নিজের বিবেক বলি দিয়ে আত্ম-বিক্রয় করেছে। ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্ধন করে রাখতে সহায়তা করছে। কারা থেকে মুক্তির দিন আসন্ন, জেলের বাহিরে গেলে ইঞ্জিনিয়ার মেজদার সহকারীরূপে কাজ করব, সে কথাও বাবার সাথে হয়েছে। পাশের সেলের সমুখে সুধীন দাঁড়িয়ে ছিল। ডিকসন যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও, সুধীন বললে, আমি কিছু চাই না। অনুরূপ সময় সকলেই অভিযোগ আবেদন জানিয়ে কিছু সুবিধা করে নেয়। সুধীন জেল

কর্তৃপক্ষের নিকট কখনও কিছু চাইত না বলে, জেলার তার উপর খুসী ছিল, তাই তিনি ইঙ্গিত করে সুধীনকে বললেন, 'মুক্ত দিতে বলুন', ডিকসন বললেন, 'কিছুই চাওনা, মুক্তিও না? সুধীন বললে, 'না কিছুই না'। ডিকসন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সুখে আছ?' সুধীন বললে, 'আমার সুখ কেউ কাড়তে পারে না।' চুপ করে ডিকসন তার মুখের দিকে চেয়ে, পরের সেলে চলে গেলেন। সুযোগ হারানর জন্য সুধীনের দুঃখে জেলার আফশোষ করতে লাগলেন। সুধীন আমায় বললে, 'যারা আমার দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাদের কাছে ভিক্ষা করতে মন উঠবে না।' বয়সে কনিষ্ঠ সুধীনের প্রতি সম্ভ্রমে আমার অন্তর ভরে গেল ও নিজের মুক্তির সংবাদ সে সময় তুচ্ছ বোধ হল। প্রায়োবেশন মিটমাটের সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে সমস্ত সুবিধার অঙ্গীকার করেছিল, তা পালন না করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে। সমস্তই বিফল হয়ে আবার মনোমালিন্য ঘনিয়ে হাজারীবাগ জেলে তৃতীয় বার প্রায়োপবেশন সুরু হবার দিন, আমার কলিকাতায় আলিপুর জেলে বদলীর হুকুম এসে গেল। ওখান থেকে মুক্তি দেবে। ভাবলাম, যার সারা দেশ কারাগার, তার আবার মুক্তি! তবুও মনে হ'ল, জেলের বাইরে যাব, কর্মময় জীবন আবার সুরু হবে। আবার ভাবি, কর্ম কি? বাইরে জীবিকা উপার্জনে প্রতিদিন কাজে বেরুব, সেটা হবে কর্ম আর পরাধীন দেশের মুক্তির সাধনায় কারাগারে বন্দী থাকা, এটা কি নিষ্কর্ম! ওই যে মহীরুহ,

সূর্যের আলোকে সহস্র সহস্র পাতা মেলে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, তার কর্ম কি অনুক্ষণ চলছে না! কারাগারে বন্দী অবস্থার এই অলস দিনগুলি, কোথাও যাবার উপায় নাই, হাতের কোনও কাজ নাই, এটা কি দেশের কাজ নয়! এতে কি কর্মের কোনও মূল্য থাকবে না! আর বাইরের নিজ স্বার্থে পূর্ণ যাজে কাজগুলাই কর্ম বলে পরিগণিত হবে!

মানুষ নিজের জীবিকার জন্য কর্ম করে। কিন্তু ষোল আনা কর্ম যদি সে নিজ স্বার্থে করে, তবে সে মানুষ পশুর সমান। যে দেশ জগত সভায় বড় হয়েছে, সে দেশের প্রত্যেক মানুষ, সকল কাজে, তার জাতির দিকে দৃষ্টি রাখে। আমাদের দেশের আইনমানা 'ভালো' লোক, যারা শুধু নিজ স্বার্থে দিন কাটায়, দেশের জন্য এতটুকু ভাবে না, তাদের ভাল নয় বললে বোধ হয় ভুল হয় না।

আসবার পথে সেলগুলির সমুখে দাঁড়িয়ে বন্দী ভ্রাতাদের নিকট বিদায় নিলাম। প্রহরী আপত্তি করল না। তাদেরও অন্তরের সহানুভূতি, শত নিয়ম কানুনের লোহা পাথর ভেদ করে, বেরিয়ে আসত। বন্দী সাথীদের ভালবাসার দৃষ্টি মাথায় যেন আশীর্বাদ বর্ষণ করলে। কোমল প্রকৃতির ছিলাম বলে সকলের কাছে যেন বেশী করে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছিলাম। প্রহরীদের চোখে আত্মীয়তার ছায়া। চণ্ডী ত হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেললে, সাধারণ কয়েদীরা সেলাম করলে। বিপ্লবী ভায়েদেরও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। চলে এলাম।

হাজারীবাগ রোড্ ষ্টেশনের দিকে পথে লাল মাটীর ধূলি উড়িয়ে বাস চলল। দুই পাশে বিরাট প্রান্তরের উন্মুক্ততা, যেন কোন্ বৈরাগীর গৈরিক উত্তরীয়। উপরে মেঘশূন্য গভীর নীল আকাশের উদাস দৃষ্টি। মনের মধ্যের বৈরাগী আজ বিচলিত, তাকে, ঘরের মায়া সামনে ডাকে, পিছনের মায়ায় ডাকে বন্দী ভায়েরা।

চারিদিকের মালভূমি জনশূন্য, মধ্যে মধ্যে গাছগুলা নীরবে আকাশের পানে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তার মধ্যে বাসের গতির ও গাছের পাতার মর্মর শব্দ। কাল এমন সময় কলকাতা, বাবা নিশ্চয় আসবেন দেখা করতে, তবু মনে ভেসে ওঠে, ছেড়ে আসা বন্দী বিপ্লবী ভায়েদের মুখগুলি। যেন আমি অপরাধী, যেন আমি মুক্তি চুরি করে ভীরু কাপুরুষের মত তাদের ফেলে রেখে, পালিয়ে যাচ্ছি। হাজারীবাগ আসবার কালের সেই গভীর রাত্রে কয়েদী গাড়ীর মধ্যে নলিনীদা যে গান গেয়েছিলেন, মনে পড়ল,

'কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।'

মনকে বলি আমরা নির্মম বিপ্লবী, আমাদের কঠোর, নির্লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন। ভাবাবেগ আমাদের সাজে না। এসেছি আলিপুর নিউ সেণ্ট্রাল জেলে। মুক্তি নিশ্চিত আসন্ন জেনে ভবিষ্যতের কল্পনা ভোগ করতে সুরু করলাম। শেষে তা এসে

গেল। আলিপুর জেলের সদা পরিচিত বন্দী বন্ধুদের বুকে আলিঙ্গন করে সার্জনের সঙ্গে জেল ফটকে চললাম।

কারাগারের বাইরে চলে আসবার সময় ভাবলাম মানবাত্মার প্রতি প্রণাম নিবেদন করে যাই। মনে মনে বললাম, ভগবান, তুমি বিশ্বপ্রকৃতিতে নব নব রূপে, কত সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছ, যা চোখে দেখে বিস্ময় জাগে, কত নর-নারীকেও তুমি সুন্দর করেছ, শুধু দেহে নয়, অন্তরেও। জীবনে সেই সব প্রাণের স্পর্শ পাবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত করনি। মারণাস্ত্র হাতে বিপ্লবী জীবনের মধ্যেও সে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছি। এ জীবনের এই অধ্যায়ের পরেও এ রকম পাব কি? মানুষের ভিড়ে সেখানে কি শুধু ঠেলাঠেলি, মারামারির মধ্যে অহংকার ও আত্মস্বার্থে বেঁচে থাকবার প্রতিযোগিতায় দিন কাটবে? জীবন কি সঙ্গীতের সুর ও ছন্দের মত সুসঙ্গত করে তুলবে না? নূতন বন্ধুদের সহিত কয়দিনেরই বা পরিচয়! কিন্তু আমরা মুক্তি পথের পথিক, সহযাত্রী, স্বাধীনতার জন্য, এক ভাবের ভাবুক। আমাদের বন্ধুত্বের পরিমাপ করতে সময়ের মাপকাঠি চলেনা। নিবিড় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের জন্য সময় লাগে কতটুকু! সহোদর ভায়েব চেয়েও আমাদের ভ্রাতৃত্ব নিকটতর। মৃত্যুর সামনে আমরা সহচররূপে পাশাপাশি দাঁড়াই। ফটকে দেখি বাবা, শীর্ণ বৃদ্ধ শুভ্রকেশ। পূর্বের চেহারায় কী ভীষণ পরিবর্তন! ভাবতাম, এই সময় কতনা বিচলিত হ'ব! হয়ত বা পাগলের মত জড়িয়ে ধরব, কেঁদে ফেলব! কিন্তু কিছুই ত হ'ল না।

কোথায় সে সব আবেগ, কোথা অনুভূতি? ছায়া ছবির মত বহুকালের আশা, এই মুক্তির ক্ষণ ভেসে যেতে লাগল। অন্তরে যেন তেমন কিছু আলোড়ন জাগাল না। ট্যাকসীতে উঠে বাড়ী রওনা হ'লাম। রসা রোড, চৌরঙ্গী, পাশে ময়দানের সেই চির পরিচিত শ্যামল শ্রী, আকাশের নীলিমা, আলিঙ্গনে বুকে নেবার জন্য যেন আহ্বান করছে, ক্রমশ ধর্মতলা, মৌলালী, ডিকসন্ লেন, বাড়ী। সকলে আনন্দে, বিস্ময়ে, হেসে, কেঁদে আত্মহারা। কেউ আহ্লাদে জড়িয়ে ধরে, কেউ দেহের শীর্ণতা দেখে দুঃখ করে, অবাক হয়ে ভাবি এরা এমন করে কেন! যাদের ছোট দেখেছিলাম, আশ্চর্যভাবে বড় হয়েছে, চেনা যায় না, বাড়ীতে নূতন অতিথির সমাগম হয়েছে, আমায় তারা চেনে না। দিদি কাঁদে, বোন কাঁদে আনন্দের আবেগে, ভাবি দূরে পালাই, নির্জনে, নিরালায়। পদ্মপাতায় জলের মত নির্বিকার অন্তরে যেন স্পর্শ লাগে না। এত গোলমাল ভীড়, ভাল লাগে না।

কারাগারের অভ্যাস মত সন্ধ্যায় খাওয়া শেষ করে আমার তিন তলার নির্জন ঘরে এলাম। আলো নিভিয়ে আঁধার নিরালায় একটু আরাম পেলাম। উত্তর দিকের খোলা দরজার ফাঁকে আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, তার কালো পটে কতকগুলি তারা জ্বলজ্বল করছে, চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমার চিরকালের প্রিয় বন্ধু আকাশ, আমার নিঃসঙ্গে অসময়ের চির সঙ্গী, যেন অভিমানে চেয়ে আছে, এখন অনেক বন্ধু স্বজন

মিলবে, এবার তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এসেছে অবজ্ঞাত বন্ধুর বিদায় নেবার সময়। ঘরের নির্জন আঁধারে, যেন প্রিয়ার আলিঙ্গনে শুয়ে আছি. হঠাৎ উপদ্রবের মত এক আত্মীয় ঘরে ঢুকে বিজলীর উজ্জ্বল আলোব সুইচ টিপে জিজ্ঞাসা করলে, 'অন্ধকারে একলা এমন কবে আছিস কেন ?' আমি উত্তর না দিয়ে একটু হাসলাম। এরা ত জানে না, এই আঁধার, এই নির্জনতা, এই আকাশ, এরা আমার অসময়ের বন্ধু, বহুকালের নিঃসঙ্গের নিত্য সঙ্গী।
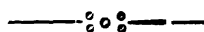
আমার এই বইখানি প্রকাশ করতে যারা আমায় বিশেষ সহায়তা করেছে, তাদের মধ্যে যে তিন জনের নাম উল্লেখ না করে পারি না, তারা হল, আমার কন্যাসমা শ্রীমতী সবিতা চট্টোপাধ্যায়, স্নেহাষ্পদ্ শ্রীমুকুর সর্বধিকারী, ও পুত্রস্থানীয় শ্রীবৈদ্য নাথ পাল। দু'এক স্থানে যে ভুল রয়ে গেছে, তার জন্য আমি দুঃখিত।

সতীশ চন্দ্র দে

—অভিমত—

বিপ্লবের অগ্রদূত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, ভাষাবিদ্ ডাক্তার সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথ সেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ নাথ বিশী, খ্যাতনামা দেশসেবক সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ও প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বাংলা মায়ের সুসন্তানগণ বইখানি পাঠ করেছেন ও তাঁদের যে ভাল লেগেছে, পত্র দিয়ে সে কথা জানিয়েছেন। শঙ্কিত চিত্তে বইখানি জনগণের সমুখে প্রকাশ করছি। পত্রগুলির নিজস্ব সাহিত্য মূল্য আছে।

বিনীত নিবেদক—
সতীশ চন্দ্র দে

—:0:—

ঘোষপাড়া, সঁাথি
৯ পৌষ, সন ১৩৬২ সাল

ভাই সতীশ,

তোমার 'নিঃসঙ্গ' শীর্ষক মনোজ্ঞ কারাকাহিনীটী পড়ে বড়ই আনন্দ পেলাম। সাড়ে এগারশ বছরের পরাধীনতা নিগড়ে বাঁধা ভারত তার যোগনিদ্রা থেকে এতদিনে জাগবে, তারই অনুপম আয়োজনের জন্য ঝাঁক বেঁধে তোমাদের মত অনেক গুলি মহাপ্রাণ ছেলেমেয়ে এসেছিল প্রাণ দিতে. নূতন এক

অগ্নি-দীপ্ত ভাস্বর যুগ রচনা করতে। তোমরা মহাশক্তির দামাল ছেলে, তোমরা ত সহজে শান্ত হয়ে শক্তি সাধনায় বসবে না, তাই তোমাদের হাতকড়া বেড়ি দিয়ে বেঁধে কারাগারে অন্তরীণে আটকে রেখে এই 'নিঃসঙ্গের' তপস্যা করিয়ে নিয়েছে যুগদেবতা।

মানুষের গভীরের দেবসত্তা জাগে না যতক্ষণ ক্ষুৎপিপাসা বাসনায় অশান্ত মানুষ শান্ত হয়ে নির্জ্জনে বসে নিজের গভীরের কূটস্থ মানুষটির সঙ্গে মুখোমুখী হয় অন্তরঙ্গ পরিচয়ে। সেই শ্মশানের শবসাধনা তোমাদের মত সহস্রটী প্রাণ দিয়ে করিয়ে নিয়েছিল সেই অগ্নিযুগের দেশলক্ষ্মী। তার সুফল এবার আগামী দশ বৎসরে ভারত ও জাতিপুঞ্জের বিশাল ধরণী এবার ভোগ করবে। এক একবার একটা খৃষ্ট বুদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ তপস্যায় আর দুশ্চর ধ্যানে বসেছে আর খুলে গেছে অদৃশ্য শক্তির জ্ঞান, আনন্দের স্বর্ণ দুয়ার। এক ঝলক দীপ্তি নেমে এসে রচে দিয়ে গেছে এক একটা উজ্জ্বল স্বর্ণ কিরীটিনী সহস্রচূড় সভ্য-তার দুর্ব্বার জয় যাত্রা। তোমরা এসেছিলে একজনে দুজনে নয়, কয়ের সহস্র মহাসাধক মিলে—

পরম নিগূঢ় মুক্তি বন্ধনের জীবন মহাকাশের এই দেবতাকে আমি দেখেছি। শান্ত অটল অচিন্ত্য অমৃত ও গরলের এই মহাশিবের ভ্রূভঙ্গে চলেছে রূপমুখর বর্ণাভিরাম রসমধুর চিন্তায়িত জীবন মহাকাব্য এবার তোমাদের তপস্যার উর্দ্ধের গভীরের এই জ্ঞান শক্তি আনন্দের হৈমদুয়ার খুলে গেছে প্রায় অবারিত

হয়ে, আলোর ঝলকে ঝলকে রাঙিয়ে তুলেছে ভারত থেকে দেশ দেশান্তরকে সমগ্র ধরিত্রীকে সেই অবতীর্ণ জ্যোতিগঙ্গা। এবার সমস্ত পৃথিবীর জাতিপুঞ্জ দাঁড়াবে এসে একই ধর্ম ও কৃষ্টি সংস্কৃতির বিপুল রাজছত্র তলে। ওগো নিঃসঙ্গের ব্রতী সাধক, তোমরা পূর্ণ জ্ঞানে জাগো, তোমাদের বসতে হবে বিশ্বমন্দিরে বিশ্বজননীর পূজারী হয়ে!

কল্যাণকামী—

কলিকাতা বারীনদা

—:0:—

Suniti Kumar Chatterji, M.A. (Calcutta)
D Litt (London), F.A S., M.L.C, (W. B.)
Bhashacharya Sahitya Vachaspati
Honorary Member, Societe, Paris and
American Oriental Society,
Chairman, West Bengal Legislative Council and
Professor Emeritus of Comparative Philology
in the University, Calcutta.
ASUTOSH BUILDING
THE UNIVERCITY OF CALCUTTA
Dated, 22nd November, 1955

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দে মহাশয়ের 'নিঃসঙ্গ' বইখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। জীবনের অপরাহ্ণ-কালে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সৈনিকের আত্মকাহিনী বিশেষ নিষ্কপটতা ও ভাবশুদ্ধির সহিত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বইখানি আমি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়াছি। কয়েকটি

কারণে ইহা আমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। প্রথমতঃ গ্রন্থকার এই সরল অনাড়ম্বর অতীতের আলোচনায় সত্যকার রসসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন—Unconscious Art অর্থাৎ নিস্পৃহ নিশ্চেষ্ট বা নিরাকাঙ্খ শিল্পসর্জনা ইহাতে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সহজভাবে নিজ জীবনের আশা ও আকাঙ্খা, আদর্শ ও কর্মচেষ্টা ও বাহিরের ঘটনা পরম্পরার আভ্যন্তর প্রতিক্রিয়া তিনি এমন সাবলীলভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে পাঠমাত্রেই তাহা মনের উপর ছায়া রাখিয়া যায়। গ্রন্থকারের কবি মনের পরিচয় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পদে পদে তাঁর মনে বিশ্ব প্রপঞ্চ, প্রকৃতি ও মানব উভয়ের সম্বন্ধে এক স্পৃহনীয় স্পর্শ-কাতরতা সৃষ্টি করিয়াছে—নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গভীর চিত্তপ্রসন্নতা আনিয়া দিয়াছে, এবং গ্রন্থকারের এই মানসিক গুণ বা শক্তি দেখিয়া ইহাকে সাধুবাদ দিতে হয়—পুরাতন কবির ভাষায় ইহাকে বলিতে হয়, "সেথায় সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন"। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া দেওয়ায় ইহার সাহিত্যিক মর্য্যাদা ও শালীনতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি এই গ্রন্থে আমার কৈশোর ও যুব অবস্থার ইতিহাস পাইতেছি। গ্রন্থকার বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বৎসরের ছোট, কিন্তু যে আবহাওয়ার মধ্যে আমি মানুষ হইয়াছি, তিনিও সে আবহাওয়ার, সেইযুগের ব্যক্তি, এবং

তাঁহার পুস্তকে বর্ণিত বা উল্লিখিত বহু কর্ম্মীর ও অন্য ব্যক্তির সহিত পরিচয় লাভ করিবার অথবা সংস্পর্শে আসিবার এবং কাহারও কাহারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ আমারও ঘটিয়াছিল ।

এই আত্মকাহিনীর পারিপার্শ্বিকে অনেক পাত্র বা চরিত্র আমার বিশেষ জানা লোক। কলিকাতায় আমার কলেজের জীবনের প্রতিধ্বনি এই বইএ পাইয়া এবং তাহা সত্য বলিয়া দেখিতে পাইয়া, এই পুস্তকের দ্বারা আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছি । আমার মনে হয়, বইখানি সাহিত্যরসের অতিরিক্ত, **Documentary Value** বা ঐতিহাসিক তথ্যতার জন্য মূল্য বিশেষরূপে আছে । 'তেহিনো দিবসা গতাঃ'— যে সময় বাঙ্গলা দেশের যুবক একাধারে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আদর্শ ও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবিকতার আদর্শ জীবনের সারবস্তু করিয়া বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়কেই গুরু বলিয়া মানিয়া, দেশের জন সাধারণ, দরিদ্র নারায়ণ হইতে সকলের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করাই পুরুষার্থ, এই বিশ্বাসে জীবন দানে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই গৌরবময় যুগের একটি চিত্র এই বইএ পাওয়া যাইবে । আমরা যাহারা দ্রষ্টা ছিলাম, যাঁহারা এই কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, দূর হইতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিতাম, সাগরবন্ধনে কাঠবিড়ালীর ন্যায় সাহায্য করিতে কখনও কখনও আকুলতা আমরা অনুভব করিতাম ।

আমাদের একজন যে নিজের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতি—

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

—:0:—

Ghat Sila.
10-11-55.

প্রীতিভাজনেষু,

আজ আপনার চিঠি পেলাম। বই আগেই পেয়েছিলাম।

বই অবশ্য প্রকাশ করবেন। এখন ত আইনের ভয় নেই। তা'ছাড়া অন্য কারণও আছে। বইখানিতে আপনার যে পরিচয় আছে তা গোপন থাকা উচিত নয়। সেকালের স্বার্থত্যাগী দেশহিতব্রতী বিপ্লবীদের কাহিনী আজ দেশের ছেলেদেব সম্মুখে ধরা আবশ্যক। বিদেশী বিপ্লবীদের চেয়ে আমাদের বিপ্লবীগণ যে কোনও দিকে ন্যূন নয়, বরঞ্চ অনেক দিকেই শ্রেষ্ঠ এটা খুব প্রণিধানযোগ্য। তার উপর বইটী সুলিখিত—এবং কবিত্বের দ্বারা, আত্মচিন্তার দ্বারা মণ্ডিত। আমি আগাগোড়া অল্প সময়ের মধ্যে পড়ে ফেলেছি এবং আপনার নূতন এক পরিচয় পেয়ে আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছি। [illegible] [illegible] করবেন। আশা করি কুশল।

ভবদীয়,

শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী